প্রথম সূর্য

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

PRATHAM SURYA

by

Dr. BISWANATH ROY

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
গৌতম রায়

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ
১৩৭০

পরমশ্রদ্ধেয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

PHONE : 47-3681

UNIVERSITY OF CALCUTTA

DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND CULTURE

Ref. No.

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাজশেখর বসুর যোগ্য উত্তরসূরীর সামনে ডাঃ বিশ্বনাথ রায়কে বসানো চলে কি না সে তর্কে না গিয়ে তাঁর অধুনা রচিত 'প্রথম সূর্য' উপন্যাসটিকে সমগ্র রামায়ণের একটি নিটোল, সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল রচনা হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ এতই বৃহৎ যে সমগ্র মহাকাব্যের অনুবাদ পড়ার উৎসাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। রাজশেখর বসুর রামায়ণের সারানুবাদ খুব দীর্ঘ না হলেও ঐ রকম স্বল্প পরিসরের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে তা অনূদিত হয় নি। সেই বিচারে ডাঃ রায়ের এই মহৎ প্রচেষ্টা প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে। আধুনিক সাহিত্যে ডাঃ রায় রচিত আদি মহাকাব্যের এই সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ একটি নূতন চিন্তার জন্ম দেয়। ভারতের আদি এই মহাকাব্য আজও ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে চিরনবীন রচনা হিসাবে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের দ্রুত বিবর্তনের এই মুহূর্তে হয়ত এই ধরণের একটি উপন্যাসের প্রয়োজন ছিল যা এক দিকে নবীন পাঠককুলের ইচ্ছা পূরণ করবে এবং অন্য দিকে প্রাচীন মহাকাব্যটির আধুনিক রূপদান বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

এই উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, লেখক প্রাচীন কাহিনীটির অলৌকিক দিকগুলোকে সুন্দরভাবে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের বানর অধিবাসীরা যে আসলে বানর নয়—মানুষ, সেকথা লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন। হনুমানের সাগর পেরিয়ে লঙ্কাদ্বীপে যাওয়ার ব্যাপারটিকেও অতি সহজ ও বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সমুদ্র যাত্রার জন্য হনুমান যে পোশাক পরিধান করেছেন তা 'অগ্নিতে দগ্ধ হয় না অথবা জলে সিক্ত হয় না, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ শর ব্যতিরেকে কোনো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে চর্ম আচ্ছাদন ভেদ করতে পারে না। এই ধরনের পোশাক পরিধান করলে অনায়াসে অতি উচ্চ বৃক্ষচূড়ে পৌঁছান যায় এবং অনেক উচ্চ হতে লম্ফ প্রদান করলে সহজে শরীরে আঘাত লাগে না।" মহাকাব্যে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলির বাস্তব বিশ্লেষণের ফলে বর্তমান উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়েছে। সীতার অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাটি লেখক বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছেন। 'প্রজ্বলিত শিখার প্রতি সীতা অবিচল ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন" দেখে রামের মনে হল "যে নারী এত অবিচলভাবে, অকম্পিত পদক্ষেপে অগ্নির দিকে ধাবিত হয়,

সে কখনই কলঙ্কিত হতে পারে না।" পুষ্পক রথও লেখকের কাছে কোন অলৌকিক যান নয়, তার মতে 'Solar' শক্তিই এই রথকে উড্ডীয়মান এবং সচল করে রাখত। "বিভীষণের আদেশে পুষ্পক রথের সারথি সূর্যকিরণের দাহিকাশক্তি আহরণ করে রথের গতিশক্তি সৃষ্টি করলেন"—এই ধরনের আরও বহু ঘটনার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসখানিতে। বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনাকে এইভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে 'প্রথম সূর্য' উপন্যাসটিতে এবং এই কারণেই তা উপভোগ্য হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলোনিয় সভ্যতাতেও এই ধরনের অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলির বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা আজ সকলেই স্বীকার করেন। পুরাকালের অনেক বিজ্ঞান তো আজ বিস্মৃত কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উপন্যাসের অন্তর্গত রণক্ষেত্রের বর্ণনা প্রাণবন্ত। সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ নিখুঁত। উপন্যাসের ভাষা সহজ অথচ অলংকার বহুল ও রুচিসম্মত। রামায়ণ যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ যে আজও কতটা মূল্যবান ও যুগোপযোগী এই উপন্যাসে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'প্রথম সূর্য' প্রাচীন মহাকাব্যের আধুনিক রূপান্তর হিসেবে উৎরে গেলেও উপন্যাসটি বড় বেশী ঘটনাবহুল। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির মানসিক ভাবের আদান-প্রদান ও চরিত্র-বিশ্লেষণ আরও বিশদভাবে বর্ণিত হলে উপন্যাসটি বাঙ্গালী পাঠককে আরও তৃপ্ত করতে সক্ষম হত। তবে, সব মিলিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে 'প্রথম সূর্য' এক অনন্য উপহার সন্দেহ নাই।

শ্রীঅরুণচন্দ্র রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সবিনয় নিবেদন

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,
কহিলা বাল্মীকি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা
সকল ঘটনা তাঁর, ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য -যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি ·
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই সাহসবাণী এই আশ্বাসবাণী আমার প্রথম সূর্য সৃষ্টির প্রথম অনুপ্রেরণা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যানভাগকে পুরাণের কাহিনী থেকে ইতিহাসের ঘটনারূপে কল্পনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই ভাবে কৃষ্ণচরিত্রকে ইতিহাসের চরিত্র বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কবিগুরু তার ভবিষ্যতকালের সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, নাট্যকারদের অভয়বাণী দিয়ে বলেছেন যা ঘটে, তার সবটাই সত্য নয়, কিন্তু আপন মর্মস্থলে যাকে সত্য বলে অনুভব করা যায় তারই যথাযথ উন্মোচন প্রকৃত ইতিহাসের ধর্ম। এই ভাবে অনেক কিংবদন্তীও চিরকালীন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

রামায়ণের আখ্যানভাগ এত বিরাট, এত মহৎ, এত গভীর যে আদি কবি বাল্মীকির পরবর্তীকালে বহু কবি, বহু সমালোচক বহু ভাবে রামায়ণের গান গ্রথিত করেছেন। শুধু ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে নয়, বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশেও কবিরা রামায়ণ গান রচনা করেছেন। অনেক কবি মূল কাব্যের সঙ্গে আপন কল্পনাশক্তি সঞ্চারিত করে রামায়ণ গান করেছেন। অনেকে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নর-নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে নানারূপে পূজা করেছেন। অনেকে রাবণ চরিত্রকে মহানুভব করেছেন, অনেকে অনেক অলৌকিক লোকাচারের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের যে অকালবোধন বিশ্বস্তভাবে এবং বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, আদিকবির রামায়ণে অকালবোধন একেবারে অনুপস্থিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র একেবারে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব শ্রীরামচন্দ্র। সেইজন্য অকালবোধন বাঙালীর বৃহত্তম জাতীয় উৎসব।

এইভাবে প্রমাণিত করা যায়, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের কবি রামায়ণ কথাকে স্থানীয় লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত করে, শ্রীরামচন্দ্রকে অবিসংবাদী সর্বভারতীয় লোকনায়করূপে অঙ্কিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র থেকে শ্রীরামচন্দ্র চরিত্র আরও মহৎ, শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ দুটি শক্তিকে ধ্বংস করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খণ্ড

রাজ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন, হয়ত গণতান্ত্রিক রাজ্যের সূচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশকে একত্রিত করে ভারত লঙ্কা ব্যাপী এক অখণ্ড সংহতিপূর্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতি ছিল মুখ্যতঃ ধ্বংসের, শ্রীরামচন্দ্রের রাজনীতি মুখ্যতঃ সৃষ্টির। সমস্ত জীবন ত্যাগ স্বীকার করে, তিনি এক ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করে গেছেন, যে ধর্মরাজ্যের গভীরতা এত ব্যাপক এত সুদৃঢ় যে আজও বিংশ শতাব্দীর মানুষ তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভারতে এবং বহির্ভারতে বহু কবিই নানাভাবে রামায়ণ গান করেছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে কারুর মতবিরোধ নেই। কোন কবিই এই চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হন নি এবং পৃথক্ কোন চিন্তাধারা সৃষ্টি করেন নি। শ্রীরামচন্দ্রই প্রথম নায়ক যিনি ভারত লঙ্কায় এক অখণ্ড সংহতিপূর্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ যে এক এই চিন্তাধারা সর্বপ্রথম শ্রীরামচন্দ্রের হয় এবং সেই চিন্তাধারা যে কত সুদূরপ্রসারী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই সেদিন পর্যন্ত বৃটিশ শক্তিও অনুভব করে গেছেন ভারতবর্ষ একটি দেশ ছাড়া আর কিছু নয় এবং যখন তাঁরা দেশবিভাগ করেন, তখনও জানেন, তাঁরা অন্যায় করছেন, এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত যুদ্ধ-ক্লান্ত বৃটিশ শক্তি ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তি করেছেন মাত্র। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ তার প্রমাণ প্রতিদিন এইসব দেশের মানুষ আইনের মাধ্যমে অথবা বে-আইনী ভাবে ভারতে যাতায়াত করছেন। এর সবটাই কি ব্যবসায়গত কারণে? মনের আকর্ষণ কি নেই? ভারতও নিরুপায় না হলে কাউকে বাধা দান করে না, এটা কি শুধু ভয়ে? রাষ্ট্রীয় সহনশীলতা কি কিছুই নয়?

প্রথম সূর্য উপন্যাস পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামে উৎসর্গীকৃত। ভারতের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে এই উপন্যাস উৎসর্গ করিনি, তাঁর চরিত্রের আরও একটি দিক আছে। যে দিকটা সচরাচর সাধারণ মানুষ মনে রাখেন না বা মনে রাখতে পারেন না।

রামায়ণ সৃষ্টি হয়েছে আকস্মিক এক শোক থেকে। 'মা নিষাদ—' শোকবাণী বাল্মীকি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল বলেই সমগ্র মানব সমাজ রামায়ণের ন্যায় কল্যাণকর কাব্যগ্রন্থ লাভ করতে পেরেছে। পৃথিবীতে যত কিছু মহৎ সৃষ্টি তার অনুপ্রেরণা হল শোক। যে মানুষ যত শোকের আঘাত পেয়েছেন, হয় সেই আঘাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছেন, নয় তো শোকের আঘাতকে আপন সত্তার মধ্যে নিহিত করে, ক্রমশঃ সাধারণ থেকে অসাধারণ স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এ সত্য চিরকালীন এবং সর্বসমাজেই স্বীকৃত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে লক্ষ্য করা যায়, একটির পর একটি শোক তাঁর জীবনে ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সামুদ্রিক উন্মত্ত ঢেউয়ের মত আঘাত হেনেছে। হিমালয় পর্বতের মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে সেই শোকের আঘাত সহ্য করেছেন। বহিরাগত সেই শোক আপন সত্তার মধ্যে নিহিত করে নিজেকে আরও মহত্তর সৃষ্টির সত্তায় বিলীন করে দিয়েছেন।

শোকই মানুষকে মহৎ করে। শোকই মানুষকে মহত্তর করে। এই শোকই রত্নাকরকে

বাল্মীকিতে রূপান্তরিত করেছিল, এই শোকই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এক অপার্থিব স্বর্গীয় জগতে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির স্পন্দনে আমি যেন ঈশ্বরের স্পন্দন অনুভব করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবিগুরু ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।
মানুষের জীবনে যত রকমের শোক সম্ভব তার প্রত্যেকটিই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনে বাস্তবায়িত। প্রথমে মাতৃশোক, তারপরে স্বামীশোক, তারপর পিতৃশোক এবং সর্বশেষে পুত্রশোক। প্রত্যেকটি শোক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উন্মত্ত ঢেউয়ের মত আঘাত হেনেছে। হিমালয় পর্বতের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে সেই শোকের আঘাত সহ্য করেছেন। বহিরাগত সেই শোক আপন সত্তার মধ্যে নিহিত করে নিজেকে আরও মহত্তর করে সৃষ্টির সত্তায় বিলীন করে দিয়েছেন। যে কথাগুলি কবিগুরুর নামে উৎসর্গীকৃত, ঠিক সেই কথাগুলিই আজ শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজ, আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রথম সূর্য উপন্যাস ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন জীবিত মানুষকে উৎসর্গ করা যায় না। বর্তমান কালে একমাত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশেই বলা যায়—

> "সম্পদে যে থাকে ভয়ে, বিপদে যে একান্ত নির্ভীক,
> কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক
> কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
> সবিনয়ে সগৌরবে ধরাধামে দুঃখ মহত্তম।"

প্রথম সূর্য রচনাকালে আদিকবি বাল্মীকি থেকে শুরু করে বহু রামায়ণ পড়তে হয়েছে এবং নানাভাবে সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রত্যেক গ্রন্থকারকে আমার প্রণাম। বহু ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু প্রণীত বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি। দু একটি অধ্যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে সৃষ্টি। দাক্ষিণাত্য বর্ণনার কিয়দংশ কবি কালিদাসের কাব্য থেকে সংগৃহীত। এমনিভাবে বিভিন্ন রামায়ণের অংশ নিয়ে এবং আমার কল্পনাশক্তি মিশিয়ে প্রথম সূর্য সৃষ্টি করেছি, যে উপন্যাসে বলতে চেয়েছি সমস্ত ভাবত এক অখণ্ড, সংহতিময়, শান্ত, সহনশীল ধর্মপ্রাণ দেশ।

আমি প্রথম সূর্যে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদের বানর রূপে কল্পনা না করে, অপেক্ষাকৃত অনার্যজাতির মানুষ রূপে কল্পনা করেছি। এই কল্পনার উৎস এবং প্রশ্রয় বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই সংগৃহীত। শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে, হনুমানকে নির্দেশ দেন, 'মনুষ্যরূপ ধারণ করে অযোধ্যায় গমন কর।' এর অর্থ প্রয়োজনবোধে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা মনুষ্যরূপ ধারণ করতে পারতেন এবং বানরমূর্তি একপ্রকারের ছদ্মমূর্তি। বাল্মীকি রামায়ণে অনেক বিষয়েই এত প্রচ্ছন্ন আছে যে তিনি কি উক্তি করেছিলেন কল্পনা করে নিতে হয়। ঊর্মিলা সম্পর্কে তিনি এত নীরব যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে কি ভাবে ঊর্মিলা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' হয়ে গেলেন, অথচ প্রচ্ছন্ন ভাবে দু এক স্থানে ঊর্মিলার ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া কবিগুরুর সাহস বাণী রূপান্তরকে সাহায্য করার সাহস দিয়েছে।

প্রথম সূর্য যখন নব কল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তখন কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে প্রবীণ পাঠক-পাঠিকা উৎসাহে এত প্রশংসাবাণী প্রেরণ করেন এবং মুখ্যতঃ তাঁদেরই উৎসাহে উপন্যাসরূপে প্রকাশের সাহস। যে সব অল্পবয়সী পাঠক-পাঠিকা যারা এখনও রামায়ণ পাঠ করেন নি, এবং যাঁদের বিশ্বাস রামায়ণ প্রবীণ বয়সের পাঠ্যগ্রন্থ, তাঁরা যদি প্রথম সূর্য পাঠ করার পর মূল রামায়ণ পাঠে উৎসাহ পান তাহলেই আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করব।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অতুল রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রথম সূর্য উপন্যাসের ভূমিকা লিখে আমাকে চিরঋণী করেছেন। তাঁর অমূল্য উপদেশ স্মরণে রাখব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রত্যেকটি চরিত্রকে আরও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

পরিশেষে এই ধরণের একটি উপন্যাস প্রকাশ করে পরম স্নেহভাজন শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার যে গুরুভার গ্রহণ করলেন, তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁকে ছোট করার অভিপ্রায় আমার নেই। তিনি দীর্ঘায়ু হোন এবং লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে এই ধরণের গুরুদায়িত্ব মাঝে মাঝে গ্রহণ করুন এই আশীর্বাদই করি। ইতি বিনীত—

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

এক

মহামুনি বিশ্বামিত্র সরযূ নদী পার হয়ে অযোধ্যা নগরীর প্রান্তে এসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিলেন। একসেক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, যে কার্যের জন্য অযোধ্যানগরীর উদ্দেশে চলেছেন, তা কি সার্থক হবে? ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে সূর্যোদয় কি সম্ভব হবে? বহু রাজন্যবর্গও তো পূর্বে চেষ্টা করেছিলেন এই দেশে এক মহান রাজশক্তি সৃষ্টি করতে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ন্যায়বীর মহারাজ। তিনি হয়ত পারতেন অনন্যসাধারণ রাজ্য সৃষ্টি করতে, কিন্তু তাঁর দানের গর্বে, দানের অহঙ্কারে তার পতন ঘটল। মহাপরাক্রমশালী মহারাজ দশরথ হয়ত পারতেন এক বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে, যে সাম্রাজ্য দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত একই সূত্রে গাঁথা থাকতো। কিন্তু দশরথও অপারগ। তাঁর চরিত্রবল সীমিত, অতি সাধারণ মানুষের ন্যায়। একাধিক মহিষী আদর্শ নৃপতির পক্ষে বিপরীতধর্মী। তাছাড়া দশরথ বয়সে প্রবীণ। এ বয়সে আর নূতনভাবে সাম্রাজ্যবিস্তার সম্ভব নয়।

বিশ্বামিত্র আপন মনেই হাসলেন। তিনি নিজেও এক আদর্শ নৃপতি হতে পারতেন, কিন্তু অতিরিক্ত ক্রোধ সর্বনাশের সৃষ্টি করল। ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বামিত্র রাজসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর সেই রাজসিকতা কোনদিন ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। মহাঋষি হয়েছেন সত্য, কিন্তু রাজত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র দেব দিবাকরকে প্রণাম করে অযোধ্যা নগরীর দিকে অগ্রসর হলেন। অযোধ্যা নগরী স্বয়ং মনু সৃষ্টি করেছিলেন বলে কথিত। এই অপূর্ব নগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ তিন যোজন বিস্তৃত এবং প্রশস্ত মহাপথ ও রাজমার্গে সুবিভক্ত।

মহামুনি বিশ্বামিত্র নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উত্তরগামী মহাপথ ধরে এগিয়ে চললেন রাজপুরীর অভিমুখে।

রাজপুরীর মন্ত্রণাকক্ষে মহারাজ দশরথ ঋষি বশিষ্ঠ, মন্ত্রিবর সুমন্ত্র এবং অন্যান্য পারিষদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচ্য বিষয় শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের বিবাহ। মহারাজ দশরথ ঋষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচার্যদেব,

আমার পুত্রদের জন্য সুলক্ষণা পাত্রী অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমি জীবিত থাকতে থাকতেই ওদের বিবাহ দিতে চাই।

বশিষ্ঠদেব বললেন—আমরা অচিরেই অন্বেষণ করব।

এমন সময় প্রহরী সভাকক্ষের দ্বারে উপনীত হয়ে বলল—রাজাধিরাজ, মহামুনি বিশ্বামিত্র দ্বারপ্রান্তে। তিনি রাজদর্শনের অভিলাষী।

দশরথ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—এই মুহূর্তে তাঁকে এ স্থানে সসম্মানে নিয়ে এস।

অল্পক্ষণ পরেই সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

—হে মহামুনি! অমৃত লাভ হলে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হলে, যোগ্যা ভার্যার গর্ভে নিঃসন্তানের পুত্র জন্মগ্রহণ করলে, প্রনষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার হলে যেমন মহা হর্ষ হয়, আপনার শুভাগমনে আমার সেইরূপ হর্ষ হয়েছে! আপনার অভিষ্ট কী? আমি হৃষ্টচিত্তে তা সাধন করব। আপনি আসন গ্রহণ করুন!

বিশ্বামিত্র নির্ধারিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন—আপনার কথায় আমি খুবই তুষ্ট। আপনাদের কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল? আশাকরি আমি আপনাদের আলোচনায় কোন বিঘ্ন ঘটাই নি!

—বিন্দুমাত্র না। ঋষি বশিষ্ঠ বললেন।—আমরা রাজপুত্রদের বিবাহ আলোচনা করছিলাম।

বিশ্বামিত্র উচ্চহাস্যে বশিষ্ঠের কথায় বিদ্রূপ প্রকাশ করলেন। বশিষ্ঠ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—হাস্যকর কোন বাক্য আমি প্রয়োগ করি নি!

—নিশ্চই করেছেন। রাজপুত্রদের কোন পরীক্ষা গ্রহণ না করে বিবাহ দিলে তারা নবনীতাল ব্যতীত আর কিছুই হবে না। প্রথমে এক, পরে একাধিক রাণীর আগমন হবে বিভিন্ন মহলে। ভোগবিলাসে নৃত্যে গীতে সময় অতিবাহিত হবে। একাধিক সন্তান সৃষ্টি হবে, তারপর একদিন দেহত্যাগ করবে। দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে অকথ্য কষ্ট, নিদারুণ দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। সৈন্যকুল দুর্বল হতে দুর্বলতর হবে। শত্রুপক্ষ সমস্ত দেশ অধিকার করে নেবে, বিশেষ করে চরম ভয় পৌলস্ত্য বংশজাত মহাবীর রাবণকে। তাঁকে যদি বাধা না দেওয়া যায় অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র আর্যাবর্ত রাবণ অধিকার করবেন।

বিশ্বামিত্র থামলেন। বিনীতকণ্ঠে দশরথ বললেন—আপনার অভিমত কী দয়া করে ব্যক্ত করুন।

—মহারাজ, আমি এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছি। এই যজ্ঞ দশ দিনের জন্য করব। এই দশদিন দশরাত্রি আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই?

—আপনি যজ্ঞ করবেন, শ্রীরাম কি করবেন? মন্ত্রী সুমন্ত্র বললেন।

—মারীচ এবং সুবাহু এই দুই দুরাত্মা আমার যজ্ঞস্থানে রক্তমাংস বিষ্ঠা ক্ষেপণ

ক'রে যজ্ঞ পণ্ড করে দিচ্ছে। শ্রীরাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমার যজ্ঞস্থান পবিত্র রাখবে।

—এ কাজ তো আপনি নিজেই সম্পন্ন করতে পারেন। ঋষি হলেও আপনি মহাবীর। যে কোন মুহূর্তে আপনি ওই দুই দুরাত্মাকে বিনষ্ট করতে পারেন। কথাগুলি সুমন্ত্র বললেন।

বিশ্বামিত্র মৃদুহাস্যে উত্তর দান করলেন—আপনার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। কিন্তু যজ্ঞকালে আমি নীরব থাকব এবং কোন আক্রমণের প্ররোচনা গ্রহণ করব না, তাহলেই যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যাবে।

—মহাবল, শ্রীরাম লক্ষ্মণ বালকমাত্র। আমি আমার সমস্ত সৈন্যবল সংগ্রহ করে যুদ্ধযাত্রা করছি। আপনার মারীচ এবং সুবাহুকে নিধন করে আসছি। দশরথ সানুনয়ে কথাগুলো বললেন।

—রাজাধিরাজ দশরথ। বিশ্বামিত্র গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—আমি জ্ঞাত আছি, আপনার সীমাহীন ঐশ্বর্য আছে, ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ ভাবে আপনি যদি আপনার পুত্রদের পালন করেন, তাহলে অচিরেই ভারতবর্ষ থেকে আর্য সভ্যতা বিলীন হয়ে যাবে।

—ঋষিবর, আপনার বাক্য ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। মহারাজ দশরথ করযোড়ে বললেন।

—মহারাজ, আমার যজ্ঞ পণ্ড করছে সুবাহু এবং মারীচ, এরা সামান্য নয়। পৌলস্ত্যবংশজাত মহাবিক্রমশালী শ্রীলঙ্কার নৃপতি রাবণের অনুচর এরা। রাবণ ভারতবর্ষে আপন অধিকার বিস্তার করতে চান। রাবণকে নিধন করতে না পারলে সমগ্র ভারতের সমূহ বিপদ।

—আপনি কী বলছেন ঋষিবর? রাবণের অনুচরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে দুগ্ধপোষ্য বালক শ্রীরামচন্দ্র?

বশিষ্ঠমুনির এই উক্তিতে অগ্নিবৎ জ্বলে উঠলেন বিশ্বামিত্র। তিনি বক্রোক্তির ভঙ্গিতে বশিষ্ঠকে বলিলেন—আপনি মহা ঋষি। আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী, কিন্তু মহারাজের চাটুকারিত্ব করেই আপনার সর্বনাশ আপনি ডেকে আনছেন। শুধু আপনার নয়, সমগ্র দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। মহারাজ—বীরত্বে, চরিত্রবলে বলীয়ান না করে পুত্রকে রাজত্ব অর্পণ করা কোনমতেই আদর্শ নৃপতির কর্তব্য নয়।

—তবু ঋষিবর, আমি শ্রীরামচন্দ্রকে কিছুতেই আপনার সঙ্গে প্রেরণ করতে পারব না। এই অনুরোধ ব্যতিরেকে আপনি যে আজ্ঞা করবেন, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পালন করব।

—মহারাজ! মৃদু হাস্যে বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন, প্রথমেই পতিজ্ঞা করেছেন, আমি যা চাইব, তাই দেবেন। এক্ষণে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞার অপলাপ করছেন।

তারপর বশিষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—কি মহর্ষি বশিষ্ঠ? আপনি কী বলেন? প্রতিজ্ঞা করে সে প্রতিজ্ঞা ভংগ করলে কি হয় এ কথা একবার মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিন।

বশিষ্ঠ নিম্নকণ্ঠে বললেন—মহারাজ, এ কথা সত্য। প্রতিজ্ঞা যখন করেছেন, তখন তা পালন করতেই হবে।

—বেশ। ভগ্নকণ্ঠে মহারাজ দশরথ বললেন—আপনারা সকলেই যখন একই কথা বলছেন, তখন আপনাদের আজ্ঞাই পালন করছি।

মন্ত্রী সুমন্ত্রর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহারাজ দশরথ আদেশ দিলেন—যাও সুমন্ত্র, শ্রীরামকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে নিয়ে এস।

সুমন্ত্র মহারাজের আদেশ পালনের জন্য কক্ষ ত্যাগ করে গেলেন।

বশিষ্ঠ একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে মহারাজ দশরথকে বললেন – মহারাজ, হঠাৎ হঠাৎ সকলকে সর্বস্ব দান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেন। এই ধরনের প্রতিজ্ঞার ফলে আপনার জীবন বিপর্যয় উপস্থিত হয়।

বিশ্বামিত্র এ কথায় সায় দিয়ে বললেন—মহর্ষির এ কথা বেদবাক্যসম। আপনি আরো অনেককে অনেক কিছু দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। দেখবেন, ভবিষ্যতে এর জন্যে আপনাকে আরও অধিক মূল্য দিতে হবে, এমন কি আপনার প্রাণ পর্যন্ত দান করতে হবে।

মহারাজ দশরথ নিরুপায় কণ্ঠে বললেন—সত্যিই আমার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা, পূর্বাপর না ভেবেই প্রতিজ্ঞা করে বসি।

এমন সময় শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণসহ সুমন্ত্র কক্ষে প্রবেশ করলেন। দুই ভ্রাতা সকলকে প্রণাম করে একপাশে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল

বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের চিবুক ধরে আদর করে আশীর্বাদ করলেন—এই তো ভারতের প্রথম সূর্য। প্রজামনোরঞ্জকনৃপতি শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে প্রণাম করলেন। লক্ষ্মণও প্রণাম করলেন। বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে হস্ত অর্পণ করে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি মহাবিক্রমশালী দুরাত্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে

শ্রীরামচন্দ্র প্রণাম করে উত্তর দিলেন—ঋষিবর, ক্ষত্রিয়কুলে কোন সংকটকেই সংকট বলে চিন্তা করতে নেই। কোন শত্রুপক্ষকেই মহাবল ভাবতে নেই। যে কোন বীরশ্রেষ্ঠের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সে যুদ্ধে হয় আমি নিহত হব না হয় অপরপক্ষ পরাজিত হবে, অতএব যে প্রশ্ন আপনি করছেন, তা প্রত্যাহার করে আদেশ করুন, কী জন্যে আমার সাহার্যপ্রার্থী?

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে বিশ্বামিত্র—সাধু সাধু—বাক্য উচ্চারণ করলেন। বশিষ্ঠদেব পুলকিত, দশরথ গর্বিত—

—সুবাহু এবং মারীচ আমার যজ্ঞ পণ্ড করছে। তাদের বধ করতে হবে।

---বধ করব কি না প্রতিজ্ঞা করতে পারছি না, তবে আমি জীবিত অবস্থায় আপনার যজ্ঞে কোন বাধা হবে না।

—সাধু •সাধু—বিশ্বামিত্র উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন—আমি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষের সিংহাসনে এতদিন পরে একজন মহারাজ আবির্ভূত হতে চলেছেন—

দশরথ করযোড়ে প্রার্থনা করলেন—আপনার ভবিষ্যৎবাণী যেন সার্থক হয়।

—এবার তাহলে আজ্ঞা করুন আমি শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

—আমার বক্তব্য কিছুই নাই। আপনি যা শ্রেয় মনে করবেন, তাই করুন। —দশরথ বললেন।

মৃদুহাস্যে বিশ্বামিত্র বললেন—আপনি আবার প্রতিজ্ঞা করলেন। যদি আমার ইচ্ছেয় রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয় আপনি কি স্বীকার করবেন?

--নিশ্চয়ই করব। দশরথ প্রত্যয়কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

এবার উচ্চকণ্ঠে বিশ্বামিত্র হাস্য করে বললেন—মহারাজ, আপনি পুনর্বার প্রতিজ্ঞা করলেন।

মহারাজ দশরথ লজ্জিত হয়ে নীরবে দণ্ডায়মান। বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের দিকে সস্নেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন--শ্রীরামচন্দ্র, চল।

—আমিও যাব। লক্ষ্মণ সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

—তুমি? বিস্মিত ভাবে বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি লক্ষ্মণ। শ্রীরামচন্দ্র যদি কায়া হন, আমি তাঁর ছায়া। ছায়া ব্যতীত কায়ার যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না, আমি ছাড়া তেমনি শ্রীরামচন্দ্র অসম্পূর্ণ। আমি ওঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব।

—সাধু, সাধু—বিশ্বামিত্র বললেন—এমন ভ্রাতৃপ্রেমও ভারতের ইতিহাসে বিরল। —বেশ, তুমিও চল।

তিনজনে যাত্রা করলেন।

দুই

তিনজনে যখন সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত তখন সূর্যদেব অস্তাচলে।

বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—আজ আমরা এখানেই, এই বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করব। আগামীকাল প্রভাতে আবার পদযাত্রা আরম্ভ হবে।

—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য। শ্রীরাম বিনীত ভাবে বললেন।

লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিয়ে অপরাহ্নের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি বললেন—জ্যেষ্ঠ, রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালীন কোনদিন এরূপ সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করি নি। আমাদের দেশ এত অপরূপ!

শ্রীরামচন্দ্র নীরবে মৃদুহাস্য করলেন। কনিষ্ঠের মস্তকে হস্তক্ষেপণ করে বললেন --প্রিয় লক্ষ্মণ! আমাদের দেশ স্বর্গাদপি গরিয়সী।

—হ্যাঁ বৎসদ্বয়!—বিশ্বামিত্র বললেন—স্বর্গরাজ্য কেবল দেবতাগণের প্রমোদভূমি। ভারতবর্ষে আনন্দও আছে, দুঃখও আছে। তোমরা যদি স্বর্গরাজ্যের কথা কেবল ভাবো তাহলে শুধু প্রমোদের কথাই চিন্তা করবে, কিন্তু যদি জন্মভূমির কথা চিন্তা কর, তাহলে দীন, দরিদ্র, মূক অসহায় থেকে শুরু করে পরম ঐশ্বর্যবান বিলাসী মানুষের কথা চিন্তা করতে পারবে। নিরীহ মুনি ঋষি দ্বিজ বৈশ্য শূদ্র সকলকেই নিরাপত্তা দান-করতে পারবে। সকলে তোমার জয়গানে মুখর হয়ে উঠবে। এখন তোমরাই চিন্তা কর, তোমরা স্বর্গরাজ্যের অভিলাষী না আপন জন্মভূমির উন্নতি কামনা কর?

শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন—ঋষিবর, স্বর্গ কী প্রকার জানি না। কত প্রমোদ উপকরণ আছে, তাও জানি না, আমি জানতেও চাই না। পরের ঐশ্বর্যে অকারণ হস্তক্ষেপ করা আমার চরিত্র নয়, কিন্তু আমার দেশের প্রজাগণ অকারণ দুঃখ পাবেন, কষ্ট পাবেন, দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বাস করবেন, তাও আমি সহ্য করব না। আমার রাজ্যে প্রত্যেকে যেন মানুষের মত বাঁচতে পারেন, এই হবে আমার একমাত্র কর্তব্য, একমাত্র আদর্শ।

—সাধু, সাধু—বিশ্বামিত্র আশীর্বাদের মুদ্রায় কথাগুলি বললেন—শ্রীরামচন্দ্র, এর পূর্বে অখণ্ড ভারতে এক নৃপতির কথা জ্ঞাত নই। আমি নিজেও আদর্শ নৃপতি-রূপে পরিচিত হতে পারি নি। কিন্তু আমার স্বপ্ন, আমার আদর্শ, তুমি হবে সেই প্রথম সূর্য, যিনি আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতকে একই সূত্রে গেঁথে এক অখণ্ড রাজ্য সৃষ্টি করে এমন ভাবে রাজ্য পালন করবেন যে, যুগ যুগ ধরে সেই অখণ্ডতা স্থায়ী থাকবে।

তিনজনের কথাবার্তার মধ্যে সূর্য অস্তাচলে গেলেন। চারিদিকে আঁধারে বিলীন। সম্মুখে সরযূর কলকলধ্বনি—সমস্ত পরিবেশই শ্রীরাম লক্ষ্মণের আপরিচিত, তবু কী আশ্চর্য সুন্দর লাগছে—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদু স্বরে বললেন—ভাই লক্ষ্মণ, অন্ধকার যে এত সুন্দর, এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল না—

বিশ্বামিত্র বললেন—বৎসগণ, এখন তোমরা রাত্রের ফলাহার সমাপ্ত করে ওই বৃক্ষতলে শয়ন কর। আমি তোমাদের রক্ষা করব।

লক্ষ্মণ মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন—আমি জীবিত রয়েছি, এক্ষণে আমি সুখ-নিদ্রায় মগ্ন থাকব, আর পূজনীয় ঋষি সারারাত্রি জাগ্রত অবস্থায় রক্ষা করবেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। বরং আপনারা উভয়ে নিদ্রা যান, আমি আপনাদের রক্ষা করব।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদু মধুর হাস্যে উত্তর দিলেন—ভাই, কোন চিন্তা নাই। ঋষি-বরকে আহ্নিক সমাপ্ত করতে দাও, তারপর আমরা প্রসাদ গ্রহণ করে তিনজনেই শয়ন করব। অদূরে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করব। সেই অগ্নির ভয়ে কোন হিংস্র জন্তু নিকটস্থ হতে পারবে না—এ স্থানে কোন দুরাত্মার আগমনের আশংকা নেই, অতএব নিশ্চিন্তে আমরা রাত্রিযাপন করতে পারব।

ঋষি বিশ্বামিত্র শান্ত হাসিতে মন্তব্য করলেন—মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র যে আজ্ঞা দেবেন, তাই আমাদের শিরোধার্য।

শ্রীরামচন্দ্র সলাজ ভঙ্গিতে বললেন—এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না! আমার পূজনীয় পিতা এখনও জীবিত। তিনিই রাজাধিরাজ। আমি সামান্য যুবরাজ মাত্র।

—আমার নিকট তুমি রাজাধিরাজ, প্রাণের রাজা, প্রাণের পুরুষ, প্রথম সূর্য। আর বাক্যালাপ নয়, তোমরা শয়নের স্থান স্থির কর। আমি ততক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করি।

বিশ্বামিত্র পূজায় বসলেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করে অগ্নিসংযোগে এক অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করলেন। বিশ্বামিত্র পূজান্তে দুই রাজপুত্রকে ফলাহার প্রসাদ বিতরণ করলেন। উভয়ে পরমানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনজনে বৃক্ষতলে শয়ন করলেন।

প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনজনের নিদ্রা ভঙ্গ হল। হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি প্রক্ষালন করার পর প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—ঋষিবর, এবার আদেশ করুন আমাদের কী করতে হবে?

বিশ্বামিত্র বললেন—আর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা নৌকাযোগে নদী পার হব। এস।

বিশ্বামিত্র অগ্রসর হলেন, শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ করলেন। যোজন-খানেক পথ অতিক্রম করে তাঁরা পারাপারের ঘাটে উপস্থিত হলেন। বিশ্বামিত্র এক তরণীধারকের সঙ্গ কথাবার্তা বলে তাঁর তরণীতে উঠলেন এবং দুই ভাইকে উঠিয়ে নিলেন।

নৌকা এগিয়ে চলল।

অল্পক্ষণ পরেই নৌকা জাহ্নবী-সরযূর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হল। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এ প্রকার জলোচ্ছ্বাস কোনদিন প্রত্যক্ষ করেন নি, তাই বিস্মিত হয়ে শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করলেন—এই জলোচ্ছ্বাস কেন? এ কি কোন প্রলয়ের পূর্ব চিহ্ন?

বিশ্বামিত্র শ্রীরামের শিরে হস্তক্ষেপণ করে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—না বৎস, কোন প্রলয় নয়, বরং সৃষ্টির চিহ্ন প্রকাশিত। এ স্থানে গঙ্গা এবং সরযূ নদী মিলিত হয়েছে। উভয়ের স্রোতের সংঘর্ষে এই জলোচ্ছ্বাস। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদীকে মাতার ন্যায় কল্পনা করে, তাকে পূজা করবে, প্রণাম করবে। কোনদিন নদীর কোন ক্ষতি করবে না।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নদীর জলস্পর্শ করে নদীমাতাকে প্রণাম করলেন। নৌকা ধীরে ধীরে অপর পারের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। প্রহরখানেক পরে তাঁরা পরপারে এসে উপস্থিত হলেন।

তীরে অবতরণ করে তিনজনে পুনর্বার পদযাত্রা করলেন। অল্পক্ষণ পরে, তাঁরা পথ পরিক্রমা করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন—এই অরণ্যে তোমরা ঠিক পথ প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। আমি অগ্রে যাব, তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে।

—যথা আজ্ঞা ঋষিবর।—শ্রীরামের বিনীত উত্তর।

বিশ্বামিত্র গভীর অরণ্যপথে অগ্রে গমন করছেন, তাকে অনুসরণ করছেন দুই ভ্রাতা। অরণ্য এত গভীর যে দিনমানেই সূর্যের রশ্মি প্রবেশ করতে সংকুচিত। বিশ্বামিত্রের এ পথ অতীব পরিচিত, তাই বিনা দ্বিধায় লতাপাতা সরিয়ে দুই ভ্রাতাকে নিয়ে পথ করে অগ্রসর হচ্ছেন।

অকস্মাৎ কোথা হতে প্রচণ্ড ঝটিকার আগমন, তার সঙ্গে প্রচণ্ড প্রস্তর বৃষ্টি।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কিয়ৎক্ষণের জন্য বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্র রাজ-পুত্রদ্বয়কে এক বিরাট বৃক্ষতলে নিয়ে আত্মগোপন করে বললেন—আমাদের সম্মুখে প্রলয়ঙ্করী, ভয়ঙ্করী দুর্মতি তাড়কা সুন্দরী।

—কিন্তু তাঁর এ আচরণ কেন? শ্রীরামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তাড়কা প্রতিহিংসাপরায়ণা। সে সমাজকে বিধ্বস্ত করার মানসে যা কিছু সুন্দর অবলোকন করে তারই ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ওকে বধ না করলে সমাজের কল্যাণ নেই, সাধারণ মানুষের শান্তি নেই। তুমি অচিরে তাড়কাকে বধ কর।

—আপনি কী বলছেন ঋষিবর ? আমি নারীহত্যা করব ? শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন।

বিশ্বামিত্র ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দান করলেন—বৎস, প্রজারক্ষার নিমিত্ত নৃশংস বা অনৃশংস, পাপজনক বা দোষযুক্ত সকল কর্মই করতে হবে। যাঁদের উপর রাজ্য চালনার দায়িত্ব, তাঁদের এই সনাতন ধর্ম।

শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন—মুনিবর, যাত্রার প্রাক্কালে পিতৃদেব আদেশ দিয়েছিলেন, আপনার সমস্ত আজ্ঞা পালন করব। আমি জ্ঞাত নই তাড়কা দেশের ও দশের কতখানি ক্ষতিসাধন করেছে, কিন্তু আপনি যখন আদেশ দিলেন, আমি তাকে বধ করব।

শ্রীরামচন্দ্র আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই বিশ্বামিত্রের সংগে যাত্রা করেছিলেন। তিনি তাঁর ধনুতে একটি অতীব তীক্ষ্ণ শর যোজনা করে ক্ষেপণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সম্মুখের বহু বৃক্ষ কর্তিত হয়ে ভূতলশায়ী হল। চক্ষের নিমেষে বনের অনেকখানি দৃষ্টিগোচর হল।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্য করলেন অদূরে ভীমকায়া রমণী তাড়কা। তাড়কা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রকে অকস্মাৎ সম্মুখে দর্শন করে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে গেল, তারপর প্রলয়ংকরী চিৎকারে প্রস্তর ক্ষেপণ করতে লাগল। তার সংগে প্রচণ্ডভাবে ধূলোবালি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তিনজনে বৃক্ষান্তরালে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। তাড়কা ওদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্বামিত্র মৃদুকণ্ঠে শ্রীরামকে বললেন—এই অবসর। ওই ভয়ংকরী মায়াবিনী এই মুহূর্তেই আবার আচ্ছাদন সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রীরামচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তখনও উত্তর দিলেন—এখনও আমার নারীহত্যা করতে মন অনুমতি দিচ্ছে না।

—আমার আদেশ, তুমি তাড়কা বধ কর। অথবা আমি ধারণা করব, তোমার যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই, তুমি ভীরু কাপুরুষ।

অগ্নিবৎ জ্বলে উঠলেন শ্রীরামচন্দ্র। ধনুতে শর যোজনা করে তাড়কার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে আকাশবিদীর্ণকারী চিৎকার তাড়কার। পরক্ষণেই প্রস্তরক্ষেপণ করতে লাগল শ্রীরামের দিকে। শ্রীরামচন্দ্র পুনর্বার শরক্ষেপণ করলেন, পুনরায় বক্ষ ভেদ করে শর তীক্ষ্মবেগে ধাবিত হল।

তাড়কা তখন ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হল। বিশ্বামিত্র চিৎকার করে বললেন—সাবধান শ্রীরাম। ও যদি তোমাকে একবার আকর্ষণ করে, তাহলে তোমাকে পিষ্ট করে নিধন করবে। তার পূর্বেই ওকে নিধন কর।

লহমার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র তাড়কার বক্ষস্থল লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ করলেন। তাড়কার বক্ষ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তার প্রাণহীন দেহ সেই স্থানেই ভূলুণ্ঠিত হল।

সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করলেন। সেই বনানীর ভিতর অতি অল্পকালের মধ্যেই গভীর অন্ধকার নেমে এল। বিশ্বামিত্র বললেন—আজ আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। আজ এ স্থানেই রাত্রি যাপন করা যাক।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

তিনজনে ফলাহার করে সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র সহাস্যে মধুরস্বরে শ্রীরামকে বললেন—শ্রীরাম, তোমার যুদ্ধরীতি এবং অস্ত্রক্ষেপণ-প্রথা দেখে আমি অতীব প্রীত। আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্র দান করব, এই অস্ত্রগুলি অতি মারাত্মক এবং অতি শক্তিশালী শত্রুকেও অনায়াসে বধ করতে পারবে। আমি এ অস্ত্র ব্যবহার করতে সাহস করি নি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সাহস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত, তুমি যথাকালে যথাযথভাবে দিব্যাস্ত্র ব্যবহার করবে, কারণ তুমি অকারণে উত্তেজিত হও না। আমার চরিত্রের দোষ আমি অল্পেই রুষ্ট হয়ে পড়ি, তাই আদর্শ নৃপতি হতে পারি নি। আদর্শ ঋষিও কি হতে পেরেছি?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন না শ্রীরামচন্দ্র। নীরবে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র নির্দেশ দিলেন—এসো, আমরা অগ্রসর হই।

শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—ঋষিবর, ওই পর্বতের অদূরে যে মেঘতুল্য বন দেখা যাচ্ছে, ওখানে কার আশ্রম? যে স্থানে দুরাত্মাগণ আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করছে, সে স্থান আর কত দূরে?

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—ওই যে আশ্রম অবলোকন করছ, ওই আশ্রমের নাম সিদ্ধাশ্রম। এই স্থানে বামনরূপী বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেজন্য এ স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম! এককালে বিরোচন পুত্র বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করে রাজত্ব করেন। তখন দেবগণ এই তপোবনে এসে বিষ্ণুকে বললেন—দানবরাজ বলির যজ্ঞে যাচকগণ যা প্রার্থনা করছে, তাই পাচ্ছে। তুমি দেবগণের হিতার্থে সেস্থানে যাও। বিষ্ণু কাশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং বলির কাছে গিয়ে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাইলেন। বলি সম্মত হলে পাদত্রয়দ্বারা স্বর্গ মর্ত অধিকার করে, মহারাজ বলির মস্তক চূর্ণ করে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

বিশ্বামিত্র গল্প করতে করতে মনোরম পথ ধরে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

আশ্রমের দ্বারে উপনীত হয়ে বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমি এই সিদ্ধাশ্রমে বাস করি। দুরাত্মাগণ এ স্থানেই আমার যজ্ঞ পণ্ড করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং নিরন্তর উপদ্রব করে।

আশ্রমের অন্যান্য মুনিগণও উপস্থিত হলেন। সকলেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম আদরে আপ্যায়ন করলেন। সকলে একত্র হয়ে দুই ভ্রাতার নৈশ ভোজের এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র পদ্মাসনে উপবিষ্ট।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মুনিবরকে প্রণাম করলেন।

বিশ্বামিত্র নিরুত্তর।

শ্রীরাম বললেন—মহামুনি, যে মুহূর্তে মারীচ সুবাহুকে দমন করতে হবে. সেই মুহূর্তে আমাদের আদেশ দেবেন, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করব।

বিশ্বামিত্র তবু নিরুত্তর।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত।

অন্য মুনিগণ বললেন—যে মুহূর্তে তোমাদের আগমন হয়েছে, সেই মুহূর্তেই ঋষিবর যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। সেজন্য ঋষিবর ছ'দিন ছ'রাত্রি মৌনী থাকবেন. অতএব এই ছ'দিন আশ্রম রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে।

বিশ্বামিত্র যজ্ঞধ্যানে মগ্ন। সমস্ত আশ্রমকুঞ্জ নিস্তব্ধ নিথর। অতন্দ্র প্রহরী ভ্রাতৃদ্বয়।

ষষ্ঠ দিবস প্রভাতে যজ্ঞবেদী প্রজ্বলিত হল, আর সেই মুহূর্তে আকাশ ভেদ করে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। শ্রীরামচন্দ্র অবলোকন করলেন—বহু দুরাচার আশ্রম আক্রমণ করে যজ্ঞবেদীর ওপর রক্ত মাংস ক্ষেপণ করার জন্য ছুটে আসছে।

—ওই মারীচ, সুবাহু—আশ্রমবাসীগণ দুরাত্মাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র। শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন আমার জীবনের ব্রত। তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর, নচেৎ তোমাদের মৃত্যু আসন্ন।

—হা হা—অট্টহাস্যে মারীচ উত্তর দিল—রাবণ সহচর ধরাধামে কাউকে দেখে ভীত নয়। তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হও। আমরা যজ্ঞ পণ্ড করার জন্যই এসেছি, আমরা আমাদের কর্তব্য করব।

শ্রীরামচন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। এই সময়টুকুর প্রয়োজন ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র ধনুকে যোজনা করার জন্য যে সময় প্রয়োজন ছিল, বাদানুবাদে, সে সময় তিনি গ্রহণ করেছেন।

তীক্ষ্ণ আগ্নেয়াস্ত্র ধনুকে যোজনা করে মুহূর্ত মধ্যে একাধিক শরক্ষেপণ করলেন।

চক্ষের নিমেষে মারীচ ও সুবাহু ব্যতিরেকে অন্য দুরাচারেরা নিহত হল। মারচী ও সুবাহু ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত ভীত হয়ে পড়ল। মারীচ বলল—তোমরা আমাদের অনুচরবৃন্দকে হত্যা করেছ। লংকেশ্বর রাবণ যখন এই সংবাদ পাবেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ধ্বংস করে দেবেন।

শ্রীরামচন্দ্র পুনর্বার শরক্ষেপণ করে বললেন--আমি রঘুবংশজাত শ্রীরামচন্দ্র, পার্শ্বে অনুজ লক্ষ্মণ। তোমাদের রাবণের যদি ক্ষমতা থাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ, করুক কিন্তু আমি শরযোজনা করে আর তা প্রত্যাহার করি না। লক্ষ্যভেদেই আমার শরক্ষেপণের সমাপ্তি।

শ্রীরামচন্দ্রের শর সুবাহুবক্ষে বিদ্ধ হল। সুবাহু সেই স্থানেই সেই মুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। মারীচ শরাঘাতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ল। অন্য দুরাত্মাগণ পলায়নের চেষ্টা করল, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের শর-বৃষ্টিতে তাদের কেউ জীবিত অবস্থায় পলায়ন করতে পারল না। সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

আশ্রমাঞ্চল শান্ত রূপ ধারণ করল। বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞকার্য সমাধা করে শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন—মহাবাহু, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি গুরু-বাক্য এবং গুরুসম্মান রক্ষা করেছ। এই সিদ্ধাশ্রমের নাম তুমি সার্থক করেছ। আশীর্বাদ করি, তুমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে পরিগণিত হও। প্রজামনোরঞ্জক নৃপরূপে ইতিহাসে তুমি প্রথম সূর্যের ন্যায় চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

দুই ভ্রাতা সশ্রদ্ধ ভাবে মুনিবরকে প্রণাম করলেন। মুনি বিশ্বামিত্র সহকারীদের আদেশ দিলেন—রাজকুমারদ্বয়কে বিশ্রামের জন্য সর্ব সুবিধা দান কর। কল্য সকালে আবার ভবিষ্যৎ কার্য সমাধা করা যাবে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অনুচরবৃন্দ কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

তিন

পরদিন প্রভাতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনে বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন—মুনিশ্রেষ্ঠ, দুই কিংকর উপস্থিত। আজ্ঞা করুন আমাদের আর কী করতে হবে?

সিদ্ধাশ্রমের অন্যান্য মুনিগণ বললেন—মিথিলার রাজা জনক এক যজ্ঞ করছেন। আমরা সেই যজ্ঞ দর্শনে যাব, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল।

—শুধু যজ্ঞ দর্শন করব? শ্রীরামচন্দ্র কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন।

বিশ্বামিত্র গভীরভাবে কি চিন্তা করছিলেন, শ্রীরামের উত্তর শ্রবণে স্নিগ্ধস্বরে বললেন—সাধু, সাধু, এ রকম উত্তরই আমি আশা করছিলাম। শ্রীরামচন্দ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে গমন করবে, তোমাকে দিয়ে আমার অনেক অভীষ্ট কর্ম সম্পন্ন করাতে হবে। তোমরা আমাদের সঙ্গে চল।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য—শ্রীরাম মুনিবরকে প্রণাম করে বললেন।

বিশ্বামিত্র বনদেবতাগণকে অভিবাদন করে, আশ্রম প্রদক্ষিণ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শকটে উঠলেন। অন্যান্য মুনিগণ অন্য অন্য শকটে আরোহণ করে উত্তরপথে যাত্রা করলেন।

শোন নদের তটে গিরিব্রজ আশ্রমে রাত্রিযাপন করে বিশ্বামিত্র তাঁর সহকারীবৃন্দ এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন প্রভাতে নদের তটদেশ অতিক্রম করে মধ্যাহ্ন-কালে জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হলেন।

বিশ্বামিত্র সে স্থানে যথাবিধি তর্পণ ও হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন, তারপর অগ্নিদেবকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য সহচরবর্গকে প্রসাদ দান করলেন। সকলে ঋষি বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করে উপবিষ্ট হয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হলেন, তারপর পুনরায় মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মিথিলার যাত্রাপথে বিশালা নগরী। নগরীর রাজা সুমতি যখন বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করলেন—ঋষিবর, আপনার সঙ্গে যে দুজন খড়্গ-তূণ-কার্মুক-ধারী পদ্মপলাশ-লোচন নবযুবক বীরপুরুষকে লক্ষ্য করছি, ওদের পরিচয় কী?

বিশ্বামিত্র মৃদু হাস্যে বললেন—ওঁরা রঘুবংশজাত রাজা দশরথতনয় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

রাজা সুমতি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—এঁরা রূপে অশ্বিনীকুমারতুল্য, আকার-প্রকার পরস্পরের সদৃশ, যেন দেবলোক থেকে দুই দেবতা ধরায় অবতরণ করেছেন। এঁরা কি জন্য আপনাদের সঙ্গে পদব্রজে এই দুর্গম পথে এসেছেন?

বিশ্বামিত্র ধীর স্থির কণ্ঠে উত্তর দান করলেন—ভারতবর্ষের সর্বত্র আমি পরিভ্রমণ করেছি। আমার প্রত্যয় হয়েছে, এই বিরাট মহাদেশে এক অমিতবিক্রমশালী আদর্শ নৃপতির প্রয়োজন, যিনি এক রমণীকে মহারানী রূপে গ্রহণ করবেন, অন্য নারীগণকে জননী রূপে পূজা করবেন, রক্ষা করবেন এবং শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করবেন। আমি সর্ব ভারত পরিভ্রমণ করে, আজীবন তপস্যা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রই হলেন সেই প্রথম সূর্য, যিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে এক রাজ্যে এক সূত্রে গ্রথিত করে রাজত্ব করতে পারবেন। আমি ওঁকে পরীক্ষা করছি। দেশের দীনদরিদ্র প্রজা কিরূপভাবে পদব্রজে গমন করে, তাই ওঁকে পরিদর্শন করাচ্ছি—কি তারা ভক্ষণ করে, কি ভাবে জীবনযাত্রা পালন করে, তাও আমি শিক্ষাদান করেছি। এক্ষণে কয়েকটি পরীক্ষার প্রয়োজন আছে, তাই আমি সঙ্গে নিয়ে মিথিলা নগরীতে যাচ্ছি।

রাজা সুমতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পরম যত্নে আপন প্রাসাদে রাত্রিবাসের জন্য অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু শ্রীরাম বললেন—না, ঋষিগণ যে স্থানে যে ভাবে রাত্রিযাপন করবেন, আমরাও সেই ভাবে করব। আমাদের জন্য অনর্থক পৃথক ব্যবস্থা করে আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।

রাজা সুমতি বিস্মিত নেত্রে রাজকুমারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। রাজা সুমতি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন—ধন্য আপনার শিক্ষা ঋষিবর।

বাক্যালাপ দীর্ঘ না করে রাজা সুমতি ঋষিগণ এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নৈশ আহারের ব্যবস্থা করলেন। সকলে আহারাদি সম্পন্ন করে রাত্রিযাপনের জন্য শয়ন করলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনান্তে পূজো আহ্নিক করলেন ঋষিগণ। পূজান্তে ফলাহার করে মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মিথিলার উপকণ্ঠে এক মনোরম উপবন। উপবনে কোন লোকচিহ্ন নেই। কিন্তু অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত সেই উপবন। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই অপরূপ মনোহারী তপোবন কার?

বিশ্বামিত্র মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন—ও স্থানে এক চরিত্রহীনা বাস করে।

—চরিত্রহীনা?

—হ্যাঁ। নাম অহল্যা! অহল্যার স্বামী ঋষি গৌতম। একদিন ঋষি গৌতম স্নানান্তে সমিধ আহরণে নদীতটে যান, সেই অবসরে ইন্দ্রদেব গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার সম্মুখে উপস্থিত হন। অহল্যা বিস্মিতা। ইন্দ্রদেব প্রস্তাব করেন অহল্যাকে

শৃঙ্গার ক্রীড়ায় মত্ত হতে। অহল্যা দ্বিমত না করে ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। সঙ্গমান্তে ইন্দ্রের প্রস্থান, পরক্ষণেই ঋষি গৌতমের আগমন। অহল্যার সর্বগাত্রে শৃঙ্গার চিহ্ন। গৌতম সেই মুহূর্তে অহল্যাকে পরিত্যাগ করে বনান্তরে চলে যান। বর্তমানে কেবল অহল্যা ওই উপবনে বাস করে।

শ্রীরাম উত্তর দিলেন—ঋষিবর, আমি ওই তপোবনে রাত্রিযাপন করব। আপনারা আমার জন্য এস্থানে অপেক্ষা করবেন।

মৃদু হাস্যে বিশ্বামিত্র উত্তরদান করলেন—অহল্যা কিন্তু আশ্চর্য মোহময়ী রূপসী। তার রূপে স্বয়ং ইন্দ্রও মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

—সেই তো আমার পরীক্ষা মহামুনি।

—তথাস্তু!

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ করে, উপবনে প্রবেশ করলেন। বন উপবন অতিক্রম করে অবশেষে দুই ভ্রাতা কুটিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন।

—অভ্যন্তরে কে আছেন? আমরা দ্বারে অতিথি—শ্রীরামচন্দ্র বললেন।

কোন শব্দ নাই, কোন সাড়া নাই।

শ্রীরামচন্দ্র বন্ধ দ্বারে মৃদু আঘাত করলেন। দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। স্বল্পালোকে তাঁরা অবলোকন করলেন কক্ষের কোণে এক অপরূপা নারী নিঃশব্দে নত মস্তকে উপবিষ্টা।

শ্রীরামচন্দ্র নারীর নিকটবর্তী হলেন। নারীকে বিস্মিত করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে বললেন—আপনি আমার জননী। পুত্রের কাছে জননীর কোনকিছুই অব্যক্ত রাখতে নাই। আপনি নিঃসংকোচে আমাকে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। কথিত আছে পাপকার্য প্রকাশ করলে সে পাপ ক্ষয়ে যায়।

নারী অহল্যা বিস্মিত নেত্রে শ্রীরামকে দর্শন করলেন। ক্রমশঃ তাঁর দৃষ্টির ঘোর কেটে গিয়ে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে। জিহ্বা ধীরে ধীরে নড়ছে। তাঁর দু চোখ বেয়ে ক্রমশঃ জলধারা নির্গত হতে লাগল।

—মা আমরা তৃষ্ণার্ত, অভুক্ত। আমাদের আহারের আয়োজন করুন।

ধীর জড়কণ্ঠে অহল্যা উত্তর দিলেন—আমার মত পাপিষ্ঠার স্পর্শদুষ্ট খাদ্য তোমরা ভক্ষণ করবে?

—তুমি কি এমন পাপ করেছ মা?

—তবে পূর্বে আমার পাপকাহিনী শ্রবণ কর। তারপরও যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমার আতিথ্য গ্রহণ করবে।

—ভাই লক্ষ্মণ! তুমি বহির্দ্বারে অপেক্ষা কর।

লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। অহল্যা ধীরকণ্ঠে ব্যক্ত করলেন—আমার স্বামী চরিত্রবান ঋষি গৌতম। আমরা অত্যন্ত সুখী দম্পতি

ছিলাম। একদিন যখন আমার স্বামী স্নানে গমন করেন, তখন ইন্দ্রদেব আমার স্বামীর ছদ্মবেশে আশ্রমে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়েই তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গমের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আমি সম্মতি দান করি।

—কিন্তু মা। এতে আপনার অপরাধ কোথায়? আপনি তো স্বামীজ্ঞানেই তাঁকে দেহদান করেছিলেন।

—না। আমার অপরাধ, আমার পাপ, আমি ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলাম। তিনি আমার স্বামী নন জ্ঞাত হয়েও আমি দেহদান করেছিলাম।

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষণিকের জন্য নিস্তব্ধ রইলেন। অহল্যা অঝোর নয়নে ক্রন্দনরতা অবস্থায় আপন কাহিনী ব্যক্ত করতে লাগলেন। অহল্যা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন—ঋষি গৌতম আমার পাপকাহিনী জ্ঞাত হয়ে সেই মুহূর্তে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুশোচনায় প্রস্তরবৎ হয়ে যাই। সেই দিন থেকে আমি কুটির থেকে কোথাও বাইরে যাই না। আহারে রুচি নেই, চক্ষে নিদ্রা নেই। আপন দেহের ওপর এত অত্যাচার করি, তবু আমার প্রাণ নির্গত হয় না। আমি এত পাপিনী—

—মা জননী আমার—সশ্রদ্ধ অশ্রুলিপ্ত কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—পাপও মানুষে সাধন করে আবার পুণ্যও মানুষে সাধন করে। তুমিও মুহূর্তের ভুলে, ক্ষণিকের মোহে যে পাপ করেছ, আপনাকে যন্ত্রণা দান করে তার সমাপ্তি ঘটেছে। আমি শ্রীরামচন্দ্র, আমি নায়কশ্রেষ্ঠ রাজকুমার, কিছুকাল পরেই আমি পরম বিক্রমশালী নৃপতিরূপে অভিষিক্ত হব। আমি ঘোষণা করছি, তোমার পূর্ব পাপ সব বিলুপ্ত হয়ে পুনর্বার তুমি পুণ্যবতী হয়ে উঠেছ। তুমি আমাদের আহারের আয়োজন কর। রাত্রি গভীর। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

মুহূর্তের মধ্যে অহল্যার জড়তা কোন সুদূরলোকে বিলীন হয়ে গেল। তিনি পুনরায় স্বাভাবিক মানবীর ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন, হাস্যমুখে কুটিরাভ্যন্তর হতে খাদ্য সম্ভার সংগ্রহ করে দুই থালিতে নৈবেদ্যর আকারে সাজিয়ে দুই ভ্রাতাকে আহারের জন্য আহ্বান করলেন।

আসনে উপবেশন করে শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—পানীয় জলপাত্র কোথায়?

অহল্যা সকাতরে উত্তর দিলেন—দয়া করে পাপিষ্ঠার স্পর্শদুষ্ট জল পান কর না। আহারান্তে ওই কলস থেকে জল নিয়ে পান করবে।

শ্রীরাম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি তোমাকে যে মুহূর্তে মাতৃসম্ভাষণে আহ্বান করেছি, সেই মুহূর্তে তোমার সর্ব পাপ স্খলিত হয়ে গেছে। এখন যদি তৃষ্ণার্তকে জলদান না কর, তাহলে পুনর্বার ঘোরতর পাপ কার্য করবে।

পুলকিত হৃদয়ে, অঝোর ক্রন্দনে আপ্লুত, অহল্যা শ্বেতপ্রস্তর পানাধারে কলস থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে, দুই ভ্রাতার সম্মুখে স্থাপন করলেন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরম তৃপ্তিতে আহার আরম্ভ করলেন। অহল্যা তাঁদের আহারের পরিচর্যা করতে লাগলেন। আহারের পর অহল্যা শ্রীরামের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হলেন এবং তাঁর মনে হল, তিনি যেন পুনরায় নবজীবন লাভ করেছেন।

আহারান্তে দুই ভ্রাতার শয্যা প্রস্তুত করলেন অহল্যা। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরম আরামে নিদ্রা গেলেন।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র সহ ঋষিকুল কুটির প্রান্তে উপস্থিত। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কুটিরাভ্যন্তর হতে নির্গত হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন। বিশ্বামিত্র আশীর্বাদ করে বললেন—ধন্য তোমার চরিত্রবল শ্রীরাম। তুমি দেবতা অপেক্ষাও চরিত্রে শক্তিশালী। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঋষি গৌতম। তুমি যে নির্দেশ দেবে, উনি গ্রহণ করবেন।

শ্রীরাম ঋষি গৌতমকে প্রণাম করে বললেন—আমার জননীপ্রতিমা অহল্যাকে আপনি পুনরায় গ্রহণ করুন।

—তাই কর গৌতম। শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা অবহেলা কর না।

ঋষি গৌতম ধীর পদক্ষেপে কুটিরদ্বারে উপস্থিত হলেন, অহল্যাদেবী স্বামীর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। ঋষি গৌতম অহল্যাকে ভূমিতল থেকে উত্থিত করে দুই হস্তে আলিঙ্গন করে, কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

—জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়, জয় ঋষি গৌতমের জয়—সমস্ত মুনিগণ একত্রে জয়ধ্বনি করে উঠলেন।

ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে হস্তক্ষেপণ করে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন—তোমার চরিত্রবল দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি শ্রীরাম। এখন তুমি মনের দৃঢ়তায় পরিণত। এবার বোধহয় তোমার বিবাহের আয়োজন করা দরকার।

তারপর কিঞ্চিৎ চিন্তা করে ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন—চল আমরা মিথিলারাজ জনকের গৃহে গমন করি।

সকলে গৌতমাশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করলেন।

জনক, রাজপ্রাসাদে তাঁরা উপস্থিত হলেন আরও প্রহর খানেক পরে। শতানন্দ বিশ্বামিত্রের পরিচয় দান করতে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন —আপনার আগমনে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত। বর্তমানে সূর্য অস্তাচলগামী; রাত্রির আগমনবার্তা সূচিত হচ্ছে। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। কাল প্রভাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনার আদেশ শ্রবণ করব। মিথিলাপতি জনক এবং তাঁর উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করে বিদায় নিলেন। বিশ্বামিত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের জন্য নির্ধারিত আবাসে প্রবেশ করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে যথাযথ আপ্যায়ন সমাপ্ত করে, রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করলেন—ভগবান, আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করতে হবে ?

বিশ্বামিত্র ধীর গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন—আপনার কাছে যে হরধনু আছে, তা দশরথ-পুত্রদ্বয়কে দেখার সুযোগ দিন।

—এই কিশোর বালকদ্বয় ওই বিশাল ধনু অবলোকন করে কী করবে ?

—আমার অভীষ্ট সাধন হবে।

—রাজর্ষি ভগবান। এই হরধনু দর্শনের পূর্বে আমার একটি বিনীত নিবেদন এবং আকাঙ্ক্ষা আছে। পূর্বে আপনাদের শ্রবণ করতে হবে। পরে যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন হরধনু দর্শন করবেন।

—আমি সে বার্তা সম্যক অবগত আছি। বিশ্বামিত্র উত্তর দান করলেন—এক্ষণে আপনি সে কাহিনী শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে জ্ঞাত করতে পারেন। আমি সেই উদ্দেশেই আপনার গৃহে উপস্থিত হয়েছি।

জনক রাজা শ্রীরামকে লক্ষ্য করে বললেন—শ্রীরামচন্দ্র, আমার মিথিলা রাজ্য কৃষিপ্রধান দেশ। এ রাজ্যে সকলেই হলকর্ষণ করে থাকেন। আমি রাজা, তবু আমি নিজে হলকর্ষণ করে থাকি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে আমি হলকর্ষণ করছি এমন সময় এক শিশুকন্যার আর্তক্রন্দন কানে এল। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, হলের মুখে এক শিশুকন্যা। সে আকাশের প্রতি তাকিয়ে ক্রন্দন করছে। শিশুকে আমি কোলে তুলে নিলাম এবং তারপর প্রাসাদে আনলাম। আমি এবং আমার পত্নি, এই কন্যাকে আপন কন্যারূপে পালন করতে লাগলাম। আমি জানি না এই কন্যার পিতামাতা কে ? কী তার পরিচয় ? তবু সে আমার কন্যা। আমি তার নামকরণ করেছি সীতা। হলকর্ষণরেখার অপর অর্থ সীতা। হলকর্ষণ রেখা হতে আমি কন্যাকে পাই, তাই 'সীতা' নামকরণ করেছি। সীতা আমার রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বয়। এত অপরূপা এত সৌন্দর্যময়ী নারী ভূ-ভারতে আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সীতার আগমনের সঙ্গে আমার রাজ্যের সমৃদ্ধি হয়। আমার যশ মান খ্যাতি প্রসারিত হয়। তারপর আমার আপন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তার নাম ঊর্মিলা। আমি নিঃসংকোচে ঘোষণা করছি আমার সন্তা ঊর্মিলার থেকে সীতাকে আমি অধিক স্নেহ করি।

সীতার আগমনে আমার যশ খ্যাতি লক্ষ্মীলাভ হয়, একথা পূর্বেই জ্ঞাত করেছি আমার মনে ইচ্ছা সীতা আমার নিকট চিরকাল লক্ষ্মীস্বরূপিনী হয়ে থাকুক, তাই এ হরধনুতে যিনি জ্যা রোপণ করতে পারবেন, তিনিই সীতাকে বধূরূপে গ্রহণ কর পারবেন। বহু বলশালী নৃপতি এসেছিলেন হরধনুতে জ্যা রোপণ করতে কিন্ত ব্যর্থ হন, তখন আমার রাজ্য আক্রমণ করে সীতাকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। আমা রাজ্য এক বৎসরকাল অবরুদ্ধ ছিল। পরিশেষে কোনমতে তাদের বিতাড়িত করেছি

জনকরাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—শ্রীরামকে আমি হরধনু দেখাবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ওকে ধনুতে জ্যা রোপণ করতে হবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতিজ্ঞা করছি। আপনারা যা ব্যক্ত করবেন, মানুষের কল্যাণের জন্য আমি তা নিশ্চয়ই করব—শ্রীরামচন্দ্রের ধীর স্থির দৃঢ় উক্তি।

জনকরাজ তাঁর সচিবদের নির্দেশ দিলেন—সেই গন্ধমাল্যানুলোপিত দিব্য ধনু এ স্থানে নিয়ে এস।

সচিবগণ অনুচরবৃন্দ এবং সৈনিকগণের সাহায্যে এক বিশাল লৌহনির্মিত মঞ্জুষা রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত স্থানে আনলেন।

জনকরাজ বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করলেন—এই মঞ্জুষার মধ্যে সেই হরধনু রক্ষিত। এখন আপনাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।

—যাও বৎস আমার আদেশ পালন কর।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও জনকরাজাকে প্রণাম করে মঞ্জুষার নিকট অগ্রসর হলেন, অনায়াসে সেই বিরাট লৌহ মঞ্জুষা খুললেন, তারপর মঞ্জুষা থেকে হরধনু বাম হস্তে উত্থিত করে দক্ষিণ হস্তে অনায়াসে জ্যা রোপণ করলেন, উপস্থিত সকলে হতচকিত। বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটেনি এমন সময় শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে টঙ্কার দিলেন। টঙ্কারের আকর্ষণ এত ভয়ঙ্কর যে মুহূর্তে মধ্যে ধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন হয়ে দু'পাশে ছিটকে পড়ল।

হরধনু ভঙ্গে বিকট শব্দ। সেই শব্দে সভাস্থ সকলেই হতচেতন হয়ে পড়লেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখে মৃদু হাসি। জনকরাজ বিশ্বামিত্র বিস্ময়ে স্তব্ধ। ক্রমে ক্রমে সভাস্থ সকলের জ্ঞান পুনরায় জাগ্রত হল।

জনকরাজ সিংহাসন থেকে অবতরণ করে জয়মাল্য শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বললেন—ধন্য বীর তুমি। তোমার শৌর্যবীর্যের তুলনা নেই। শ্রীরামকে পতিরূপে পেয়ে আমার কন্যা সীতা জনক-বংশের কীর্তিস্থাপন করবে! রঘুবংশের সঙ্গে জনক-বংশ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। মহামুনি বিশ্বামিত্র, আপনি অনুমতি দিন, আমার দূতেরা অবিলম্বে রথারোহণে অযোধ্যায় গমন করে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করে রাজা দশরথকে এস্থানে আনয়ন করুক।

—তথাস্তু। ঋষি বিশ্বামিত্র অনুমতি দান করলেন।

চার

জনকরাজের দূতগণ তিন দিন তিন রাত্রি পথ অতিক্রম করে অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন।

রাজা দশরথ দূতবৃন্দের আগমনে আনন্দিত হয়ে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—আমার রাম-লক্ষ্মণ কেমন আছে?

দূতেরা সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। শ্রীরামের বিবাহের প্রস্তাব শুনে দশরথ বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অভিমত ভিক্ষা করলেন। সকলেই একবাক্যে সানন্দে সম্মতি দান করলেন। রাজা দশরথও সম্মতি প্রদান করে যাত্রার আয়োজনের নির্দেশ দিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজা দশরথের আদেশে ধনাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে সুরক্ষিত হয়ে মিথিলায় যাত্রা করলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি বিপ্রগণ বিভিন্ন যানে যাত্রা করলেন। রাজা দশরথ তাঁর নিজস্ব রথে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। তাঁদের পশ্চাতে চতুরঙ্গিনী সেনাদল অগ্রসর হল।

চতুর্থ দিনে রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হলেন। রাজা জনক সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি করযোড়ে বললেন—আমার কী সৌভাগ্য, স্বয়ং রাজা দশরথ, ভগবান বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণ আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, ভাগ্যগুণে আমার কন্যাদের সকল বিঘ্ন দূর হল এবং মহাবল রঘুবংশীয়গণের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে আমার কুল সম্মানিত হল। মহারাজ, আজ আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রভাতে আপনি ঋষিগণের সঙ্গে যজ্ঞ সমাপ্ত করে বিবাহ কার্য নিষ্পন্ন করবেন।

রাজা দশরথ বিনীতভাবে উত্তর দান করলেন—ধর্মজ্ঞ, আমি শুনেছি যে দাতার বশেই দান গ্রহণ করতে হয়, অতএব আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

বিশ্বামিত্র মৃদু হাস্যে বললেন—মহারাজ, আপনি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করে বসলেন।

—কেন? কেন? রাজা দশরথ বিব্রত বোধ করে বললেন—আমি কি কোন অন্যায় প্রতিজ্ঞা করে বসলাম?

—না, হাস্যভরে বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—অত্যন্ত কল্যাণকর প্রতিজ্ঞা করেছেন।

রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন--মহামুনি, আপনি অনুমতি দান করুন, আমরা পরস্পর বংশপরিচয় দান করি।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—বিশ্বামিত্র অনুমতি দান করলেন।

বশিষ্ঠদেব রঘুবংশের পরিচয় দান করলেন। —সগরের থেকে আরম্ভ করছি।

াগর, অসমঞ্জ, অংশুমান, দিলীপ, ভগীরথ, ককুৎস্থ, রঘু অথবা কল্মাষপাদ। আরও ;'পুরুষ পরে, অম্বরীষ, নহুষ, যযাতি, নাভাগ, অজ ও দশরথ। দশরথের দুই পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণের জন্যে আপনার দুই কন্যাকে প্রার্থনা করছি। আপনি এই যাগ্য পুত্রদ্বয়কে কন্যাদানের আয়োজন করুন।

জনক করযোড়ে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন—এক্ষণে আমার কুলপরিচয় জ্ঞাত হন। র্মাত্মা রাজা নিমির পুত্র মিথি, তাঁর পুত্র জনক। তিনি প্রথম জনক নামে খ্যাত। চাঁব তিন পুরুষ পরে জন্মগ্রহণ করেন দেবরাও। আরও চতুর্দশ পুরুষ পরে হ্রস্বরোমা। :স্বরোমার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ আমি, কনিষ্ঠ কুশধ্বজ। আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে রাজ্যে াভিষিক্ত করে, কুশধ্বজকে রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বনগমন করেন। কিছুকাল পরে াংকাশ্যার রাজা সুধন্বা সংবাদ দিলেন—তাঁর হরধনু এবং সীতাকে চাই। আমরা াস্বীকার করলাম, ফলে যুদ্ধ হল। কুশধ্বজ সেই যুদ্ধে সুধন্বাকে পরাস্ত করে, নিহত রে এবং তাঁর রাজ্য অধিগ্রহণ করে আমি কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যা রাজ্যের রাজা :সেবে অভিষিক্ত করি। বর্তমানে দুই ভ্রাতা অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে রাজত্ব করছি। ামি পরম প্রীতিসহ রামকে আমার জ্যেষ্ঠা সুরকন্যার ন্যায় রূপবতী বীর্যশুল্কে ীতা এবং লক্ষ্মণকে কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলা দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। থন রাম-লক্ষ্মণ বিবাহের পূর্বকৃত্য গোদান ও পিতৃকার্য সম্পাদন করুন। াজ থেকে তৃতীয় দিবসে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহ হবে।

সভাস্থ সকলে নীরব।

ঋষি বিশ্বামিত্র নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—আমার একটি নিবেদন আছে। জা দশরথ তো পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর নিকট যা ভিক্ষা করা হবে, তনি তাই পূরণ করবেন।

রাজা দশরথের হৃদকম্প শুরু হল। বিশ্বামিত্র পুনরায় কি অনর্থ ঘটান ক জানে? তবু মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন করে মৃদুকন্ঠে বললেন—মহামুনি শ্বামিত্র, আপনার ইচ্ছা অনায়াসে আপনি প্রকাশ করতে পারেন।

বিশ্বামিত্র মৃদুহাস্যে বললেন—ইক্ষ্বাকু এবং বিদেহ এই দুই-এর তুল্য কুল ই। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা-ঊর্মিলার সম্বন্ধও অতি যোগ্য এবং মধুর। থন আমার একটি বক্তব্য শুনুন। রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই অনুপমা ন্দরী কন্যা আছেন। আমার প্রস্তাব ভরত ও শত্রুঘ্নর সঙ্গে সেই দুই কন্যার বাহ দান করুন। একই লগ্নে চার ভ্রাতার বিবাহ হোক চার ভগ্নীর সঙ্গে।

দশরথ এবং জনক পুলকিত চিত্তে সম্মতি দান করলেন। রাজা দশরথের কম্প স্তিমিত হল। তিনি মনে মনে ধারণা করেছিলেন, বিশ্বামিত্র হয়ত তাঁর াজ্য ভিক্ষা করে বসবেন। রাজা দশরথের বয়স হয়েছে, অল্প চিন্তায় হৃদপিণ্ডের ত অতি দ্রুত হয়ে যায় এবং ধারণা হয় এই বুঝি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।

বিশ্বামিত্রের কল্যাণময় প্রস্তাবনায় রাজা দশরথের চিত্ত পুনর্বার স্থির হল।

দশরথ, বশিষ্ঠাদি ঋষি ও অমাত্যগণ তাঁদের নির্দিষ্ট আবাসগৃহে গমন করলেন, দশরথ আবাসে প্রত্যাবর্তন করে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলেন এবং পরদিন চার পুত্রের উদ্দেশে চার লক্ষ স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত সবৎসা ধেনু ও কাংস্য দোহনপাত্র দান করলেন। এই দিন দ্বিপ্রহরে ভরতের মাতুল কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হয়ে দশরথকে বললেন—মহারাজ, আমার পিতা ভরতকে দেখতে চান। আপনি জানেন, ভরত তাঁর নয়নের মণি। তাঁর নির্দেশে আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সে স্থানে আপনাদের দেখতে না পেয়ে, আমি এ স্থানে এসেছি।

—সুস্বাগতম যুধাজিৎ! দশরথ যুধাজিতের আপ্যায়ন করলেন—তুমি বিশ্রাম কর। আমি ভরত এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের বিবাহের আয়োজন স্থির করেছি। পুত্রদের বিবাহান্তে আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করব।

যুধাজিৎ আর কোন উত্তর দান করলেন না।

বিবাহের দিন আগত হলে দশরথ ঋষিগণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাগণকে নিয়ে কৌতুকমণ্ডলম সমাপ্ত করে সর্ব আভরণে ভূষিত হয়ে বশিষ্ঠের পশ্চাতে উপস্থিত হলেন। বশিষ্ঠ জনকের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—মহারাজ, সপুত্র রাজা দশরথ সম্প্রদাতার আদেশের অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে দাতা এবং গ্রহীতার ইচ্ছা একত্র হলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

রাজা জনক উত্তর দান করলেন—আপনারা স্বগৃহে প্রবেশ করবেন, এত সংকোচ প্রকাশ করছেন কেন? এই রাজ্য তো আপনাদেরই। আমার কন্যাগণ মঙ্গলাচরণের পর বেদীমূলে সমবেত হয়েছে, আমিও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আর বিলম্বের প্রয়োজন কী?

দশরথ, যুধাজিৎ এবং অন্যান্য পারিষদবর্গ যজ্ঞসভায় প্রবেশ করলেন। বশিষ্ঠ, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র যথাবিধি বেদী রচনা করে গন্ধপুষ্প, যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, ধূপাধার, শঙ্খাধার, লাজপত্র প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করলেন। তারপর বশিষ্ঠ বেদী উপর দর্ভ (দূর্বা, কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার তৃণ) বিস্তার করে যথাবিধি অগ্নিস্থাপন করে হোম আরম্ভ করলেন।

সর্ব আভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করে অগ্নিসমক্ষে শ্রীরামের অভিমুখে রেখে জনকরাজ কৌশল্যানন্দনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এই আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মচারিণী, তুমি একে পত্নীরূপে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর। তোমার পাণিদ্বারা সীতার পাণিগ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হোক। এই মহিমময়ী কন্যা পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবে।

এই আশীর্বাদবাক্য উচ্চারণ করে জনকরাজ শ্রীরাম-সীতার মস্তকে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করলেন। উপস্থিত সকলেই 'সাধু সাধু' বাক্য উচ্চারণ করলেন। রাম-সীতা

বিবাহ সমাপ্ত হবার পর লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার, ভরতের সঙ্গে মাণ্ডবী এবং শত্রুঘ্নের সঙ্গে শ্রুতকীর্তির বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে জনকরাজ আসন পরিত্যাগ করলেন।

বিবাহান্তে সভায় পুষ্পবৃষ্টি, দুন্দুভিধ্বনি ও গীতবাদ্য আরম্ভ হল। নর্তকীগণ নৃত্য আরম্ভ করলেন।

উৎসবান্তে দশরথ চার পুত্র-পুত্রবধূ সহ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীরামকে আশীর্বাদ করে বিশ্বামিত্র বললেন—বৎস, তোমার যাবতীয় পরীক্ষা আমি গ্রহণ করেছি। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি রূপে পরিগণিত হবে। তোমাপেক্ষা প্রজানুরঞ্জক নৃপতি ভারতে আর জন্মগ্রহণ করবে কি না সন্দেহ। আমার কর্তব্য সমাপ্ত। বর্তমানে আমি বিদায় গ্রহণ করছি।

বিশ্বামিত্র সকলকে অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাজা দশরথ জনকরাজকে বললেন—এক্ষণে আমাদেব বিদায়ের আয়োজন করুন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

জনকরাজ কন্যাগণকে বহু ধনরত্ন, গো, কম্বল, ক্ষৌম বসন, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক, সখী ও দাসদাসী সঙ্গে দিয়ে বিদায়ের আয়োজন করলেন। রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে নিযে যাত্রা শুরু করলেন। জনক রাজপরিবার আকুল ক্রন্দনে কন্যাগণকে বিদায় দিলেন।

যাত্রাপথে মিথিলা রাজ্য অতিক্রম করে বনরাজ্যে প্রবেশ করে রাজা দশরথ লক্ষ্য করলেন আকাশে পক্ষিগণ ব্যাকুল হয়ে কলরব করছে, মৃগগণ দক্ষিণ দিকে পলায়ন করছে।

দশরথ বশিষ্ঠকে প্রশ্ন করলেন—এভাবে পক্ষিগণ এবং মৃগগণ ব্যাকুল কেন? এ কিসের কারণ?

বশিষ্ঠ চারদিক অবলোকন করে বললেন—পক্ষিদের আর্তরব অমঙ্গলের লক্ষণ, কিন্তু মৃগের দক্ষিণ গতি শান্তির সূচনা।

দশরথ নিরুত্তর। সকলের রথ অগ্রগামী। ক্ষণিক পরে সহসা প্রবল বেগে বায়ু বইতে লাগল, সূর্য অন্ধকারে আবৃত হল, সৈন্যগণ ধূলিরাশির মধ্যে হতচেতন হয়ে পড়ল তখন দশরথাদি দর্শন করলেন—ভীমদর্শন ক্ষত্রিয়কুলনাশক ভৃগুপুত্র পরশুরাম সম্মুখে পথরোধ করে উপস্থিত।

বশিষ্ঠাদি ঋষি কল্পনা করলেন পরশুরাম কি পুনরায় ক্ষত্রিয় বধ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন! তাঁরা পরশুরামের যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে পূজা করলেন। পরশুরাম পূজা গ্রহণের পর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার শ্রীরামকে প্রয়োজন।

শ্রীরাম রথ হতে অবতরণ করে পরশুরামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম গ্রহণ করে বললেন—শ্রীরাম, আমি তোমার বীরত্ব এবং ধনুর্ভঙ্গের কথা শুনেছি। আমি আর এক ধনু এনেছি, তুমি এতে

শরযোজনা করে নিজের বল প্রদর্শন কর। যদি সমর্থ হও, তবে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

দশরথ রথাবরোহণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—আপনি ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন। আর যুদ্ধ কেন? রাম হত হলে আমরা কেউ বাঁচব না।

পরশুরাম দশরথের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি শ্রীরামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—রাম, বিশ্বকর্মা দুই ধনু সৃষ্টি করেছিলেন। তুমি যা ভেঙ্গেছ, তা দেবতারা ত্রিপুরাসুর বধের নিমিত্ত মহাদেবকে দিয়েছিলেন। আমার এই ধনু বিষ্ণুর ছিল। একদা বিষ্ণুর সঙ্গে মহাদেবের বিরোধ হওয়ায় বিষ্ণু মহা হুঙ্কার করেন। সেই হুঙ্কারে শৈবধনু শিথিল হয়ে যায়। বহুদিন অব্যবহারের ফলে ওই ধনু আরও দুর্বল হয়ে যায়। তুমি দুর্বল ধনু ভঙ্গ করে আপন বীর্য প্রকাশ করেছ, এখন এই ধনু গ্রহণ করে প্রকৃত বীর্য প্রকাশ কর।

শ্রীরাম বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—ভার্গব, আপনার কীর্তি আমি শুনেছি, কিন্তু আপনি আমার শক্তিকে অবজ্ঞা করেছেন, তা আমি সহ্য করব না। দিন আপনার ধনু।

শ্রীরাম ভার্গবের হাত হতে বিষ্ণুধনু গ্রহণ করে তাতে অনায়াসে জ্যা রোপণ করলেন এবং শরসংযোগ করে বললেন—মহামুনি পরশুরাম, আপনি ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া আপনি পূজনীয় বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় সেইজন্য আপনাকে বধ করব না। কিন্তু আমি ধনুকে শর সংযোজন করেছি। এ শর বিফলে যাবে না। আপনি আজ্ঞা করুন এ শর আমি কোথায় নিক্ষেপ করব?

পরশুরাম ভীত, নির্বাক।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—প্রথম আপনার গতিশক্তি, দ্বিতীয় আপনার তপোবলে অর্জিত লোকসমূহ, এই দুটির একটি নষ্ট করব। আপনি যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব।

পরশুরাম কিছুক্ষণ জড়ীকৃত ও নিবীর্য হয়ে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর ধীর কন্ঠে বললেন—তুমি আমার গতি নাশ করো না। আমি এক্ষণে মহেন্দ্র পর্বতে যাব। তুমি শরনিক্ষেপ করে আমার তপোবলে অর্জিত লোকসমূহ সংহার কর। তুমি যখনই ধনু উত্তোলন করেছ, তখনই অনুধাবন করেছি তুমি বীরশ্রেষ্ঠ। তোমার কাছে পরাভূত হয়ে আমার কোন লজ্জা নাই।

শ্রীরামচন্দ্র শরক্ষেপণ করলেন ও পরশুরামকে প্রণাম করলেন। পরশুরাম শ্রীরামকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

পরশুরাম বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ সকলে বিমূঢ়ভাবে স্থির হয়ে রইলেন। অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তর থেকে সীতাদেবী শ্রীরামের বীরত্ব অবলোকন করে পুলকিতা। শ্রীরাম ধীর পদক্ষেপে পুনরায় রথে আরোহণ করলেন। দশরথ যাত্রার জন্য আদেশ দিলেন। সকলে অযোধ্যার পথে অগ্রসর হলেন।

পাঁচ

ভারত ভূ-খণ্ডের দক্ষিণপ্রান্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত স্বর্ণলঙ্কা দ্বীপ। পৌলস্ত্য বংশজাত মহাবীর রাবণ লংকার অধিশ্বর। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তেজস্বী এবং অত্যন্ত আত্মাভিমানী! তাঁর বিশ্বাস পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ বীর আর বিদ্যমান নেই। তিনি একাই দশজ্ঞানের অধিকারী। রাজনীতি, শাস্ত্রনীতি থেকে শুরু করে প্রজাপালননীতি সমস্তই একক দায়িত্বে পালন করেন। তাঁর সহোদর কুম্ভকর্ণ বীর বটে, কিন্তু রাবণের বীরত্বের উপর এতই বিশ্বাস, যে তিনি রাজকার্যের কোনকিছুই পরিদর্শন করেন না। বিলাসব্যসন এবং সুখনিদ্রায় দিনযাপন করেন। রাবণ তীক্ষ্ন রাজনীতিক্ষেত্রে অতিশয় বুদ্ধিমান। কুম্ভকর্ণ রাজ্যের অংশ দাবি করতে পারেন এই ভয়ে তিনি সর্বদা কুম্ভকর্ণকে পানাসক্ত করে রাখেন এবং তাঁর নিদ্রার যেন ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। কুম্ভকর্ণ আপন প্রাসাদে খাদ্য, পানীয়, নৃত্য এবং নিদ্রায় বৎসর অতিবাহিত করেন।

শ্রীলঙ্কার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। রাবণ স্থির করলেন শ্রীলঙ্কার উত্তরে যে ভারত ভূ-খণ্ড আছে, সেই রাজ্য আক্রমণ করে নিজ রাজ্যভুক্ত করে প্রজাদের সেখানে বসবাসের আয়োজন করলে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বিনা কারণে পরদেশ আক্রমণ করা রাজনীতিবিরুদ্ধ, তই মারীচ ও সুবাহুকে আদেশ দিয়েছিলেন ভারত ভূ-খণ্ডে গমন করে ঋষিদের উত্যক্ত কর। ভারতে সে রকম বীর নেই। ঋষিগণ দুর্বল রাজার শরণাপন্ন হবেন এবং রাজারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অনায়াসে তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্য জয় করে নেওযা যাবে।

শ্রীলংকার স্বর্ণমণ্ডিত রাজপ্রাসাদে রাবণ বিভীষণ, খর, দূষণ প্রভৃতি সভাসদদের নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। রাবণ সহসা কারও উপদেশ গ্রহণ করতেন না, তিনি নিজে যা ন্যায্য মনে করতেন তাই করতেন, সেই কার্য সমাধা করার জন্য সভাসদদের আদেশ দিতেন শুধু।

রাবণ বিভীষণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—জানো বিভীষণ, ভারতবর্ষ কী বিরাট আর বৈচিত্রময় সুন্দর দেশ। কোথাও পর্বতমালার পর পর্বতমালা—কোথাও শস্যশ্যামলা—কোথায় আবার অনুর্বর মরুভূমি। আমি পুষ্পক রথে পরিভ্রমণ করে ভারতের সর্বত্র অবলোকন করেছি। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের ওই দেশ গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে শ্রীলঙ্কায় এত প্রজার বাস করা সম্ভব হবে না।

—কিন্তু। বিভীষণ দ্বিধাভরে উত্তর দিলেন—বিনা কারণে পররাজ্য আক্রমণ করা কি পাপ কার্য হবে না?

মৃদু হাস্যে রাবণ প্রত্যুত্তর করলেন—রাজনীতি ক্ষেত্রে পাপ বলে কোন কথা নেই। আমার প্রজাগণের সুখাবাসের জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন, আমি সেই বাস-স্থানের ব্যবস্থা করছি। বিভীষণ, একটি কথা স্মরণ রেখ, আপন প্রজামণ্ডলীর সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আর নিরাপত্তা রক্ষা করাই আদর্শ নৃপতির ধর্ম। আমি সেই ধর্ম পালন করতেই উদ্যত হয়েছি, আর কোনটি পাপ, কোনটি পুণ্য এ জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে। তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ আমি দশ শাস্ত্রে পণ্ডিত। তাই অকারণে আমাকে উপদেশ দান করতে আসবে না। তোমাদের কর্তব্য হবে আমার আদেশ পালন করা।

সভাস্থ সকলে নীরব। রাবণ পুনরায় বললেন—আমি মারীচ ও সুবাহুকে ভারতে প্রেরণ করেছি। আমার ধারণা অদ্য অথবা কল্য তারা সে স্থানের সংবাদ গ্রহণে সক্ষম হবে।

সেই মুহূর্তে দূত সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে সংবাদ পরিবেশন করল—মারীচ সভাকক্ষের দ্বারে উপস্থিত মহারাজ।

—তাকে এ স্থলে নিয়ে এস।

দূতের প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরে দূত ক্ষতবিক্ষত অসুস্থ মারীচকে ধরে সভাকক্ষে প্রবেশ করল। মারীচের অবস্থা দেখে রাবণ স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করে ভূমিতলে পদচারণা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—একি মারীচ, এ তোমার কী অবস্থা? সুবাহু কোথায়?

—সে হত, তাড়কাও নিহত।

—কে এই অসাধ্যসাধন করল?

—আমরা ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর যজ্ঞকাণ্ড পণ্ড করে অশান্তি সৃষ্টি করছিলাম। ভেবেছিলাম আমাদের ভয়ে ঋষিগণ সিদ্ধাশ্রম পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে, আমরা আশ্রম দখল করে এ স্থান থেকে কিছু প্রজাদের সেই আশ্রমে বসতি স্থাপন করাব। এই পর্যন্ত বলে মারীচ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—একটু জল পান করব।

রাবণ প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন—এক পাত্র বলবর্ধক সুরা মারীচকে পান করতে দাও, ও শরীরে শক্তি পাবে।

প্রতিহারী রাবণের আদেশ পালন করল। সুরা পান করে মারীচ অনেকটা সুস্থ হয়ে পুনরায় শ্রীরামকথা ব্যক্ত করল—ঋষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞকালে কোন বাক্য উচ্চারণ করেন না, অথবা আমাদের কোন বাধা দান করেন না। সেই সুযোগে আমরা রুধির, মাংস, বিষ্ঠা ইত্যাদি অস্পৃশ্য বস্তু যজ্ঞস্থানে ক্ষেপণ করতে লাগলাম। বিশ্বামিত্র

কোন কথা বললেন না, নীরবে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা ভাবলাম, ঋষিরা আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রম পরিত্যাগ করছেন। কিন্তু চতুর্থ দিবসে বিশ্বামিত্র পুনরায় ফিরে এলেন, সঙ্গে দুই রাজপুত্র। বয়সে কিশোর বালক, কিন্তু শক্তিতে সূর্যের ন্যায় ভয়ংকর। জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীরাম, অনুজ লক্ষ্মণ। শ্রীরাম অনায়াসে তাড়কার ন্যায় ভয়ংকরী শক্তিধারিণী রমণীকে শরাঘাতে হত্যা করল। আমরা দূর থেকে সে যুদ্ধ লক্ষ্য করলাম। শ্রীরামের লক্ষ্য অভ্রান্ত। প্রতিটি শর তাড়কার বক্ষ বিদীর্ণ করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল।

সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হয়ে বিশ্বামিত্র পুনরায় যজ্ঞে বসলেন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ প্রহরারত আমি ও সুবাহু যে মুহূর্তে নিকটবর্তী হয়েছি, সেই মুহূর্তে রাম-লক্ষ্মণ আমাদের লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ করল। শ্রীরামের শরের তীক্ষ্ণতা অসম্ভব এবং শরক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে তীরমুখে অগ্নিসংযোগ হয়। শ্রীরামের শরে সুবাহু মুহূর্ত-মধ্যে নিহত হল। আমার পৃষ্ঠে শরাঘাত হয়, তাই হতচেতন হয়ে আমি যোজন-খানেক দূরে নিক্ষিপ্ত হই। দশ দিন পরে আমার জ্ঞানলাভ হয়। ওই বীরশ্রেষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সমস্ত সংবাদ আপনাকে দান করতে এলাম।

রাবণের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি পদচারণা করতে করতে বললেন—ভারতবর্ষে এত বড় বীরের জন্ম হয়েছে আমার ধারণা ছিল না। বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরম তৃপ্তি। আমিও দেখতে চাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কত বড় বীর।

—কিন্তু কী কারণে আপনি শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হবেন? —বিভীষণ বললেন।

—শ্রীরাম আমার অনুচরবৃন্দকে হত্যা করেছে।

—কিন্তু অকারণে হত্যা করেন নি। আপনার অনুচরবৃন্দই অকারণে ঋষিগণকে উত্যক্ত করেছিল।

—বিভীষণ, তুমি প্রতি কথায় তর্ক কর। আমি শূর্পনখা এবং আরও অনুচর-বৃন্দকে ভারতে প্রেরণ করছি। শূর্পনখার সঙ্গে শ্রীরাম যদি সঙ্গম করে, তাহলে নারীর শ্লীলতাহানির অপরাধে সে অপরাধী হবে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে। যে ভাবেই হোক শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করা চাই, না হলে ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব নয়।

—কিন্তু মহারাজ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সাধারণ বীর নয়। তাঁদের বীরত্ব আমি অব-লোকন করেছি। তাঁদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং প্রত্যেকটির প্রয়োগ-বিধি ওঁরা এত নিখুঁত ভাবে জানেন যে একটি অস্ত্রও ব্যর্থ হয় না। আমি অনু-সন্ধানে জ্ঞাত হয়েছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যারাজ দশরথের দুই পুত্র। রাজা দশরথও প্রবল পরাক্রমশালী বীর, তবে তাঁর দীর্ঘ বয়স হয়েছে। এই বয়সে তিনি হয়ত তেমন

বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না, কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনী অপরাজেয়। মহারাজ, ভারতবর্ষের উত্তরাখন্ড জয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাবণ পদচরণা করতে করতে অবশেষে পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করে বললেন —হুঁ, মারীচের সংবাদ সত্য। আমি পুষ্পক রথে পরিভ্রমণ করে অযোধ্যা নগর অবলোকন করেছি। অতি সুরক্ষিত নগরী। এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ওই রাজ্য জয় করা সত্যিই সম্ভব নয়। কিছুকাল ওই স্থানে অবস্থান করলে আমার সৈন্যবর্গের খাদ্য নিঃশেষিত হয়ে যাবে, আমাদের মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কোন পথ উন্মুক্ত থাকবে না।

মারীচ প্রণামপূর্বক নিবেদন করল—মহারাজ যদি অভয় দেন তো আমি কিছু নিবেদন করতে পারি।

—বেশ কর।

—বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজা বালী এবং সুগ্রীব। এঁদের সঙ্গে যুদ্ধে হয়ত আমারা জয়লাভ করতে পারি।

রাবণ অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন—সুগ্রীবকে আমি ভয় করি না, কিন্তু বালী মহাবিক্রমশালী যোদ্ধা। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করব কি না এ বিষয়ে আমি সন্দিহান।

সভাস্থ সকলেই নীরব। রাবণ অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর ধীর কণ্ঠে বললেন—আমার মনে একটি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

সকলেই উন্মুখ হয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। রাবণ ধীর কণ্ঠে পুনরায় বললেন ছলে বলে কৌশলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে লঙ্কায় বন্দী করে আনলে ভারতের শৌর্যবীর্য অনেকখানি খর্ব হবে। অযোধ্যাধিপতি দশরথও পুত্রশোকে হীনবীর্য হয়ে পড়বেন। সেই সময় আর্যাবর্ত আক্রমণ করে সমগ্র দেশ জয় করতে আমার বিলম্ব হবে না।

—কিন্তু বিনা দোষে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বন্দী করে আনা রাজনীতি বিরুদ্ধ হবে না? —বিভীষণ প্রশ্ন করলেন।

রাবণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—বিভীষণ প্রতি কথায় তর্ক করে। কে বলেছে, বিনা দোষে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বন্দী করব? শূর্পনখা তার অনুচরীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতে গমন করবে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে অরণ্যে গমন করেন সংবাদ পেলাম। শূর্পনখা ছলে বলে কৌশলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে কামার্ত করে তুলবে। পরনারীর সঙ্গে কামার্ত সঙ্গম মহাপাপ। সেই পাপে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুষ্ট হলে ওঁদের বন্দী করে আনব।

—আর যদি কামার্ত না হন? বিভীষণের প্রশ্ন।

—তাহলে শ্রীরাম নিশ্চয়ই শূর্পনখাকে নির্যাতন করবেন। নারী নির্যাতনও মহাপাপ। সেই পাপের জন্য আমি তাঁদের বন্দী করে আনব।

এ যুক্তির কোন উত্তর দিতে পারলেন না বিভীষণ। তিনি নীরবে বসে রইলেন।
রাবণ শূর্পনখাকে সংবাদ প্রেরণ করলেন। সংবাদ শ্রবণে শূর্পনখা সভায় উপস্থিত হলেন। শ্যামাঙ্গী যৌবনপুষ্টা নারী। এক প্রকার নারী বিদ্যমান, যাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করলে ভক্তির উদ্রেক হয় না বরং পাশবিক যৌনকর্মের ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়, শূর্পনখা সেই প্রকৃতির নারী। স্বল্পবাসিনী শূর্পনখা রাবণের প্রতি দৃকপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন—আমায় ডাকছ কেন ?

—ভগ্নি। তোমাকে আরও সজ্জিত হয়ে, আরও স্বল্পবাসিনী হয়ে অযোধ্যার রাজপুত্রদ্বয় শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে প্রলুব্ধ করতে হবে। তাঁরা তোমার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেই পরনারীর অপমান করা হবে এবং তখনই আমার কার্য আরম্ভ হবে। পারবে তুমি ?

তীব্র কটাক্ষে সভাস্থ সকলকে লেহন করে শূর্পনখা উত্তর দিলেন—মহারাজ! শূর্পনখার অসাধ্য কর্ম নাই। পৃথিবীর যে কোন মানবকে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্যেই বোধহয় আমার জন্ম। আমার কটাক্ষ থেকে উদ্ধার পেয়েছে এমন মানবের নাম আমার স্মরণে আসছে না।

—সেই জন্যেই তো তোমাকে আহ্বান করেছি ভগ্নি, কিন্তু—রাজা রাবণ সিংহাসন হতে অবতরণ করে পদচারণা করতে করতে বললেন—কিন্তু শূর্পনখা, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অত্যন্ত চরিত্রবান। অহল্যার কুটিরে সমস্ত রাত্রি যাপন করেছেন, কিন্তু অহল্যার প্রতি কোনরূপ অশালীন ব্যবহার করেন নি বরং তাঁকে মাতৃ সম্বোধনে ভূষিতা করছেন।

অধর ওষ্ঠ নৃত্য করিয়ে এক বিচিত্র অঙ্গীভঙ্গ করে শূর্পনখা বললেন—অহল্যা বৃদ্ধা আর প্রবীণা কিতু আমার প্রতি দৃকপাত করলেই অনেকের লালসারস নিঃসৃত হতে থাকে। হয়ত এই রাজসভাতেই অনেকের হচ্ছে, কেবল মহারাজের উপস্থিতিতে কোন প্রস্তাব করার সাহস নেই কারও।

মহারাজ রাবণ বিব্রত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—শূর্পনখা, তুমি দিন দিন অত্যন্ত প্রগলভা হয়ে উঠছ। যাও, তোমাকে যে নির্দেশ দিলাম, সেইমত কার্য কর।

শূর্পনখা আর কোন বাক্য উচ্চারণ না করে সহচরীদের সঙ্গে রাজসভা পরিত্যাগ করলেন।

বিভীষণ অত্যন্ত বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন—মহারাজ, এ প্রকার কার্য কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত। আমি শ্রবণ করেছি শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের চরিত্র অত্যন্ত নির্মল। তাঁরা রাজপুত্র হয়েও ভোগবিলাস করেন না। অত্যন্ত নিয়মে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তারপর মারীচের মুখে শ্রবণ করলাম তাঁরা অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। মহারাজ, শ্রীলঙ্কার শূরবৃন্দের মধ্যে একমাত্র আপনি ভারতে গমন করে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন। আপনি আমাদের যেটুকু অস্ত্র শিক্ষা দান করেছেন সেইটুকুই আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি। এই অবস্থায় শ্রীরামের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত হওয়া আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

রাবণ ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন—বিভীষণ আমার সঙ্গে প্রতি কথায় তর্ক উত্থাপন করে, যা আমি বিন্দুমাত্র পছন্দ করি না। আমি যা ন্যায্য মনে করি, তাই করে থাকি। বিভীষণের যদি আমার যুক্তি মনঃপূত না হয়, তাহলে সে অনায়াসে রাজসভা পরিত্যাগ করে নিজ প্রাসাদে সরমা সমীপে দিনাতিপাত করতে পারে। তার বিলাসব্যসনের কোন অসুবিধা হবে না। দাস-দাসী ঐশ্বর্য এবং আমোদ-প্রমোদের সর্ব উপকরণই বিভীষণের প্রাসাদে উপস্থিত থাকবে। আমি চাই, সে যেন আমার রাজকার্যে কোন হস্তক্ষেপ না করে।

কিছুক্ষণ নীরবে পদচারণা করে মহারাজ রাবণ বললেন—বিভীষণ, তোমার মনের গোপনে যে ইচ্ছা বর্তমান, তা আমি জ্ঞাত। আমার দৃষ্টি কিন্তু দশদিকে। আমি জানি, তুমি যেন তেন প্রকারে লোকসমাজে আমাকে হেয় করে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে লঙ্কার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হতে চাও। কিন্তু জেনে রাখ, রাবণ যতদিন জীবিত থাকবে, তোমার সে আশা পূর্ণ হবে না।

বিভীষণ অপমানিত হয়ে আসন পরিত্যাগ করলেন। তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাবণ পুনর্বার বললেন—ইচ্ছা হলে তুমি রাজসভা পরিত্যাগ করতে পার।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

নত মস্তকে বিভীষণ রাজসভা পরিত্যাগ করে প্রাসাদের বাইরে উপনীত হলেন। সুরম্য পথের দু'ধারে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ। সেই পথ অতি মনোরম অশোক কানন পর্যন্ত বিস্তৃত। আশোক কানন অতিক্রম করে বিভীষণ আপন প্রাসাদকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। দ্বারপ্রান্তে এসে শ্রবণ করলেন সুললিত কণ্ঠসঙ্গীত। সে সঙ্গীতে বাধা প্রদান করলেন না বিভীষণ। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সঙ্গীতের শেষ মূর্ছনা যখন বাতাসে বিলীন হয়ে গেল, তখন বিভীষণ কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। রাণী সরমা সদ্য সমাপ্ত সঙ্গীতের আবেশে ছিলেন। তিনি প্রথমে স্বামীর আগমন অনুধাবন করতে পারেন নি, পরক্ষণেই অসময়ে স্বামীকে দর্শন করে বিস্মত নেত্রে প্রশ্ন করেন—এ কি দেব? আপনি অসময়ে রাজসভা পরিত্যাগ করে এলেন?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিভীষণ উত্তর দান করলেন—আমি রাবণের রাজসভা হতে বিতাড়িত।

—কারণ?

—আমি তাকে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিলাম। দুই আর্য রাজপুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বন্দী করে আনার উদ্দেশ্যে শূর্পনখা প্রভৃতি গুপ্তচরীদেব ভারত ভূ-খণ্ডে প্রেরণ করছেন। রাণী, আমি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে পরিষ্কার অবলোকন করেছি রাবণের অহঙ্কারে লঙ্কার সর্বনাশ আসন্ন।

রাণী সরমা কোন উত্তর দান করলেন না। নীরবে স্বামীর দক্ষিণ হস্ত আপন হস্তের মধ্যে আবদ্ধ করে বললেন—আসুন, আপনি বিশ্রাম করবেন।

নীরবে বিভীষণ সরমার অনুগামী হলেন।

ক্রমশঃ শ্রীরামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের অতি প্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি আপামর সকলের সঙ্গেই মধুর ব্যবহার করতেন এবং সকলের বিপদে আপদে উদ্ধারকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তিনি সর্বদা প্রশান্তচিত্ত, মৃদুবাক্যে উত্তর দান করেন, পরুষ কণ্ঠস্বর তাঁর নাই বলেই প্রজা সাধারণের বিশ্বাস। তিনি রাজপুত্র হয়েও সাধারণ নাগরিকগণের সঙ্গে অতি স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতেন। কেউ সামান্য উপকার করলে তিনি অতি তুষ্ট হন, আবার কেউ যদি অপকারের বাসনা পোষণ করে, তাঁকেও তিনি ক্ষমা করেন না।

ক্ষাত্রধর্মকে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করলে স্বর্গলাভ হয়, এ কথা তিনি নিষ্ঠাসহকারে মানেন। অশ্রেয়স্কর এবং ধর্মবিরুদ্ধ আলোচনায় তাঁর রুচি নেই। বিচারক্ষেত্রে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শনে দক্ষ। তিনি নীরোগ, তরুণ, বাগ্মী, বিশালবপু, দেশকালজ্ঞ, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন অতি অল্পকালের মধ্যেই।

মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে এই সব গুণ লক্ষ্য করে স্থির করলেন, তাঁর জীবিতকালেই শ্রীরামচন্দ্রকে রাজাসনে অভিষিক্ত করবেন। শত্রুঘ্ন এবং ভরত মাতুলালয়ে। মহারাজ দশরথ জ্ঞাত ছিলেন ভরত ও শত্রুঘ্ন শ্রীরামচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং প্রতিনিয়ত তাঁর আজ্ঞাবহ। তবু রাজা দশরথ কেকয়রাজকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর ভয়, যদি কেকয়রাজ তাঁর প্রিয় ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য রাজ্যভাগ দাবি করেন, তখন অখণ্ড অযোধ্যারাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে পরিণত হবে। সেইজন্য রাজা দশরথ স্থির করলেন, শ্রীরামের অভিষেক আয়োজন সম্পূর্ণ করে ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় থেকে আনাবার ব্যবস্থা করবেন।

মহারাজ দশরথ রাজসভায় সকলকে আমন্ত্রিত করে ধীর স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আমার এই রাজ্যের আরও সুখবৃদ্ধি কামনা করি। আমার পূর্বপুরুষদের পন্থা অবলম্বন করে, আমিও যথাশক্তি প্রজাপালন করেছি। বর্তমানে আমার জীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দেবার অভিষিক্ত করার মনস্থ করেছি। তার উপর রাজ্যপালনের ভার ন্যস্ত করে আমি ঈশ্বরচিন্তায় দিনাতিপাত করতে চাই। আপনারা সকলেই এ স্থানে উপস্থিত। আপনাদের নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ অভিমত শ্রবণ করতে অভিলাষ পোষণ করি।

রাজা দশরথ নীরব।

মেঘদর্শনে ময়ূরের যে আনন্দ উপস্থিত হয়, সেইরূপ আনন্দের অনুনাদে সমস্ত

রাজসভা গুঞ্জিত হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ, সেনাধ্যক্ষ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলে একমত হয়ে রাজা দশরথকে বললেন—সত্যই মহারাজ আপনার বয়স হয়েছে। আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবল রাম অনায়াসে অত্যন্ত সুচারুরূপে রাজ্যপালন করতে পারবেন। আপনি অনুমতি দান করে আমাদের ধন্য করুন।

মহারাজ দশরথ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি সকলের মনের সত্য ইচ্ছা পুনর্বার বিচার করার জন্যে ক্ষুব্ধতার অভিনয় করে বললেন—আপনারা আমার কথা শ্রবণ মাত্রেই শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শ্রীরামকে রাজাসনে আসীন দেখতে অভিলাষী। তবে কি আমার ধারণা হবে, আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের সুচারুরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সমর্থ হই নি? আমি কি ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করি নি?

রাজার ভাষণের প্রত্যুত্তরে রাজন্যবর্গ বললেন—না মহারাজ। ও কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করলে তার মহাপাপ হবে। কিন্তু আপনার পুত্রের বহু সদগুণ। এই সময়ে রাজ্যাভিষেক না করলে পরে হয়ত রাজপুত্রের গুণাবলী বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই মেধাবী পুত্র যদি একবার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, তাহলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। শ্রীরাম আপনার অতি অনুগত। শ্রীরামচন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করলেও আপনি যে পরামর্শ দেবেন, সেই পরামর্শ তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করবেন। এখন আপনার প্রসাদে সকলের মনস্কাম সিদ্ধ হোক। আমরা আপনার পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে চাই।

দশরথ প্রীত হয়ে মৃদু হাস্য করলেন, তারপর বশিষ্ঠ, বামদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণগণকে উদ্দেশ করে বললেন—এই পবিত্র চৈত্র মাসে আপনারা রামকে যৌবরাজ্যদানের আয়োজন করুন।

সভায় পনুর্বার হর্ষধ্বনি উত্থিত হল। সেই ধ্বনি শান্ত হলে দশরথ বশিষ্ঠকে বললেন—ভগবান, আপনি অভিষেকের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের জন্য আজই আজ্ঞা দিন।

বশিষ্ঠদেব মন্ত্রিগণকে নির্দেশ দিলেন—সুবর্ণাদি রত্ন, পূজাদ্রব্য, সর্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, মধু, ঘৃত, অচ্ছিন্ন বস্ত্র, রথ, সর্বায়ুধ, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণ গজ, দুই চামর, ধ্বজ, শ্বেত ছত্র, শত স্বর্ণকুম্ভ, স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং আরও যা আবশ্যক সংগ্রহ করে রাখ। রাজ অন্তঃপুর এবং নগরের সমস্ত দ্বার সজ্জিত কর। প্রভাতকালে শত সহস্র দ্বিজকে উত্তম অন্ন, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, লাজ ও প্রচুর দক্ষিণা দিও। আগামীকল্য সূর্যোদয় হলেই স্বস্তিবাচন হবে। ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ এবং আসনের ব্যবস্থা কর। পতাকা উড্ডীন করাও, রাজমার্গ জলসিক্ত কর, গায়িকা গণিকাগণ অলংকৃতা ও সুসজ্জিতা হয়ে প্রাসাদের

দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবমন্দিরাদিস্থানে পূজা দাও। সুবেশধারী বীরগণ দীর্ঘ অসিচর্ম ধারণ করে অঙ্গনে প্রবেশ করবেন।

মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রকে বললেন—তুমি একবার শ্রীরামকে নিয়ে এস।

মহারাজের আদেশে সুমন্ত্র রামকে রাজসভায় ডেকে আনলেন। শ্রীরাম রথ হতে অবতরণ করে, দশরথের নিকটে গমন করলেন। দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন করে পার্শ্বস্থ সিংহাসনে বসিয়ে বললেন—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার একান্ত প্রিয় এবং প্রজাগণও তোমার গুণাবলীর জন্য অত্যন্ত অনুরক্ত। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম-ক্রোধজাত ব্যসন পরিহার করে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্য ও প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন করবে। সর্বদা ধনাগার ও আয়ুধাগার পূর্ণ রাখবে। যিনি প্রজাদের তুষ্ট করে রাজ্য পালন করেন, তাঁর মিত্রগণ অমৃতলাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দিত হন।

শ্রীরাম নিরুত্তর।

শ্রীরামের বন্ধুগণ রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণ করে দ্রুতগতিতে মহারানী কৌশল্যার নিকট গমন করে শুভসংবাদ পরিবেশন করল। মহারানী কৌশল্যাও তাদের স্বর্ণদানে পরিতুষ্ট করে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলেন। বন্ধুগণ রাজসভায় প্রত্যাগমন করল।

রাজা দশরথ সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। সভাসদগণ হর্ষধ্বনি করে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন মহারাজাকে অভিবাদন করে।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করে রাজা দশরথের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করে বললেন—পিতা, আমি কী সভাকক্ষ ত্যাগ করতে পারি?

রাজা দশরথ সানন্দে অনুমতি দিলেন—যাও বৎস।

শ্রীরামচন্দ্র অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হলেন।

পুরবাসিগণ বিদায় নেবার পর রাজা দশরথ মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, পরদিন পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ এবং অমাত্যবর্গ সকলেই সেই অভিমত ব্যক্ত করলেন। সকলের অনুমতি লাভ করার পর, অন্তঃপুরে গমন করলেন মহারাজা দশরথ। অন্তঃপুরে নিজ কক্ষে শ্রীরামচন্দ্রকে আহ্বান করে বললেন—শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে পুনরায় আহ্বান করলাম কতকগুলি গোপনীয় বার্তা জ্ঞাপন করার জন্যে।

শ্রীরামচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান রইলেন।

রাজা দশরথ ধীরকণ্ঠে বললেন—শ্রীরাম, আমি আগামীকল্য তোমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভাবান্তর নাই। একই ভাবে নীরবে দণ্ডায়মান রইলেন।

দশরথ মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই সময়ে ভরত এই রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে,

এই সময়ই অভিষেকের উপযুক্ত সময়, এই আমার মত। এ কথা সত্য তোমার, ভ্রাতা ভরত সংস্বভাব, জ্যেষ্ঠের অনুগত, ধর্মাত্মা, স্নেহশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তবু কেকয়-রাজকে আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয় না, তাঁর প্ররোচনায় ভরতের মন বিচলিত হতে পারে। ভরতকে আমি দোষ দান করি না। মানুষের চিত্ত অস্থির, সাধু ও ধার্মিক-গণের মনও কারণ উপস্থিত হলে বিকারগ্রস্ত হয় এবং আপন সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশায় শুভকার্যে বাধা দান করে। অতএব তুমি প্রস্তুত থেকো, আগামীকল্য তোমার রাজ্যা-ভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার প্রতি আর কোন আদেশ আছে?

—বর্তমানে নেই। তুমি এখন অন্তঃপুরে মাতৃসদনে গমন করতে পার।

শ্রীরামচন্দ্র নীরবে দশরথের কক্ষ পরিত্যাগ করে মহারানী কৌশল্যার কক্ষে দিকে যাত্রা করলেন। এই শুভ সংবাদ সর্বপ্রথমে মাতাকেই দান করা বিধেয়।

পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীরাম মাতার নিকট গমন করলেন। রান কৌশল্যা তখন পুত্রের মঙ্গলকামনায় দেবমন্দিরে আরাধনায় রত। তাঁর সঙ্গে ছিলে সুমিত্রা, সীতা এবং লক্ষ্মণ।

শ্রীরামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা জ্ঞাপন করে বললেন—মা! তুমি এতক্ষণে সমস্ত সংবাদই শ্রবণ করেছ।

—সংবাদ নয় বৎস, শুভসংবাদ—কৌশল্যা সস্নেহ কণ্ঠে উত্তর করলেন।

মৃদু হাস্যে শ্রীরাম প্রত্যুত্তর করলেন—আমার সমস্ত সংবাদই তোমার নিক শুভ সংবাদ। ঋষি বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে আজ রাত্রিতে সীতার সঙ্গে আ উপবাস করব। অভিষেকের জন্য অন্যান্য যে সব মঙ্গলাচার আবশ্যক তুমি তা আয়োজন কর।

কৌশল্যা আনন্দে অধীর। তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন—বৎস, তুমি চিরজীবি হও। তোমার শত্রু দূরে হোক। তুমি রাজ্যশ্রী লাভ করে আমার এবং সুমিত্রা আত্মীয়স্বজনকে আনন্দিত কর।

লক্ষ্মণ নীরব। শ্রীরাম তাকে সাদর আহ্বান করে বললেন—লক্ষ্মণ, তুমি আমার সঙ্গে রাজ্যভার গ্রহণ করবে।

তারপর শ্রীরাম কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করে আপন প্রাসাদের দিকে যা করলেন।

বশিষ্ঠ দশরথের নির্দেশে শ্রীরামের প্রাসাদে গমন করলেন। শ্রীরাম ও সী ঋষিকে প্রণাম করে আপন গৃহে অভ্যর্থনা করলেন। বশিষ্ঠ যথাযথ আশীর্বাদ ক উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করলেন। পদতলে কুশাসনের উপর শ্রীরাম ও সী উপবিষ্ট হলেন।

বশিষ্ঠ ধীরকণ্ঠে বললেন—শ্রীরাম, কল্য প্রভাতে তোমার রাজ্যাভিষেক।

শ্রীরামচন্দ্র নীরব। সীতা পুলকিতা।

বশিষ্ঠ পুনরায় ব্যক্ত করলেন—রাজকার্য অতি নিরাসক্ত ভাবে পালন করতে হয়। তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি জনপ্রতিনিধি। জনসাধারণের অর্থেই তোমার রাজকোষ পূর্ণ, অতএব তুমি যে অর্থ ব্যয় করবে, তা তোমার অর্থ নয়, অপরের অর্থ, সেইজন্যে অত্যন্ত সাবধানে সেই অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং সেই ব্যয়ের প্রত্যেকটি অংশের হিসাব রাখতে হবে। বৎসরান্তে একদিন রাজসভায় রাজ্যের প্রতিটি জনসাধারণকে আহ্বান করে রাজসভা অনুষ্ঠিত করে আয়-ব্যয়ের হিসাব দান করতে হবে। জনসাধারণের অনুমোদন লাভ করলে পুনরায় এক বৎসরের জন্য আয়-ব্যয়ের চিত্র নির্ধারণ করবে এবং সভাস্থলে ব্যক্ত করবে। সকলের অনুমোদন লাভ করলে পুনরায় এক বৎসরের জন্য সেই ভাবে অর্থ ব্যয় করবে।

শ্রীরামচন্দ্র ধীরকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—আমি এ সবই অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পালন করব এবং এই সমস্ত বিষয়ে আমি অত্যন্ত পারদর্শী।

—আমি সে বিষয়ে জ্ঞাত, বৎস। এক্ষণে যে কারণে তোমার নিকট আমার আগমন সেই কারণ ব্যক্ত করি।

শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিতকণ্ঠে বললেন—আপনি অনায়াসে আপনার আদেশ আমাকে দান করতে পারেন।

—তুমি এবং লক্ষ্মীমূর্তি সীতাদেবী অদ্য রাত্রে উপবাস করবে। দু'জনে পৃথক শয্যায় শয়ন করবে। কুশাসনের শয্যায় আজ রাত্রিযাপন করবে। ফলমূল আহার করবে। আমার বক্তব্যের সারাংশ হল তোমরা উভয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন কর।

—যথা আজ্ঞা ঋষিদেব। শ্রীরাম ও সীতা বশিষ্ঠকে প্রণাম করলেন।

—একটি কথা মনে রেখ। নৃপতি হবার পূর্বে এক রাত্রির জন্যেও সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে হয়। সন্ন্যাসীর নিরাসক্তি নিয়ে রাজ্যপালন করতে হয়।

একটু নীরব থেকে বশিষ্ঠ ধীরকণ্ঠে বললেন—আমি জানি বৎস, তুমি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং চরিত্রবান। তবু এই সমস্ত উপদেশবাণী ব্যক্ত করা আমার কর্তব্য, সেজন্যেই বললাম। এক্ষণে আমি বিদায় নিলাম, তোমরা শান্তিতে বাস কর।

বশিষ্ঠ শ্রীরামের ভবন থেকে বিদায় নিয়ে নিজ আশ্রমে চলে গেলেন।

শ্রীরাম-সীতা কুশাসনে উপবিষ্ট হয়ে পূজারতি করলেন। সীতাদেবী পট্টবস্ত্র পরিধান করে আহারের নিমিত্ত ফলাহার প্রস্তুত করলেন।

শ্রীরামের জন্য পৃথক কুশাসন সাজিয়ে পানপাত্রে পবিত্র পানীয় পূরণ করে, থালাপাত্রে ফলমূল মিষ্টান্ন নৈবেদ্যর সাজে সাজিয়ে আসনের সামনে রেখে বললেন—আসুন আর্য। আহার গ্রহণ করুন।

শ্রীরামচন্দ্র আহারে প্রবৃত্ত হলেন। সীতাদেবী বাতাস করতে লাগলেন।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্যে বললেন—আর্যে, আজ আর আমাকে পরিচর্যা করতে হবে না। আজ আমি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করব।

ততোধিক মৃদুহাস্যে সীতাদেবী উত্তর দিলেন—আমিও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করব। সংসারধর্মী নারীর সন্ন্যাসধর্মই হল পতিসেবা, ঈশ্বরসেবা নয়। পতির সেবাই ঈশ্বরসেবা, পতিপ্রেমই ঈশ্বরপ্রেম। আমি অদ্য রাত্রে আপনাকে স্পর্শ করব না। পৃথক শয্যায় শয়ন করব, কিন্তু পতিসেবা পরিপূর্ণভাবে করব। সে কর্তব্যে আমাকে বাধা দিবেন না।

—তোমার তর্কে আমি পরাভূত। শ্রীরামচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন এব নীরবে আহারে মনোনিবেশ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র আহার সমাপ্ত করে উঠতে সীতাদেবী তাঁর শয্যার আয়োজন কে দিলেন কুশ নির্মিত শয্যাবস্তুতে। শ্রীরামচন্দ্র শয়ন করার পর সীতাদেবী সামান আহার করে পৃথক শয্যায় শয়ন করলেন এবং পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত হলেন।

পরদিন প্রভাত থেকে অযোধ্যানগরী আনন্দমুখর। প্রতি রাজপথের বাঁে বাঁকে সুসজ্জিত তোরণদ্বার। উচ্চ বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি উচ্চস্থান নানাপ্রকা পুষ্পে সজ্জিত। নাগরিকবৃন্দ প্রত্যেকেই নূতন ও সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলাচার। নর্তকীবৃন্দ এবং গণিকাগণও পরমানন্দে নানাপ্রকার আভরণে সজ্জিতা হয়ে পথে চলেছেন। অযোধ্যা নগরের আবালবৃদ্ধ বনিতা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। আজ তাদের প্রিয় যুবরাজ শ্রীরামচন্দ্রে রাজ্যাভিষেক উৎসব। এ আনন্দের বন্যা এত প্রবল যে কেউই স্থির ভাবে দিনাতিপা করতে পারছে না। প্রত্যেকেই অস্থির আনন্দে পদচারণা করছেন এবং ভাবছেন, কখন রাজপুরী থেকে আনন্দোৎসবের আহ্বান আসবে।

রাজা দশরথ রাজসভা সজ্জিত করছেন আপন তত্ত্বাবধানে। পার্শ্বে ঋষি বশি অপেক্ষা করছেন, সুমন্ত্র রাজসভাকক্ষ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করছেন এবং প্রজাগণে উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা করছেন।

রাজা দশরথ সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—এই সিংহাস শ্রীরামচন্দ্র যখন আরোহণ করবে, তখন কী অপূর্ব শোভা বর্ধিত হবে।

—এ কথা সত্য মহারাজ।—সুমন্ত্র মন্তব্য করলেন।

রাজসভায় যখন মহারাজ দশরথ, বশিষ্ঠ এবং সুমন্ত্র কথোপকথন করছিলেন তখন রানী কৈকেয়ী তাঁর স্বীয় প্রাসাদে পরিচারিকা মন্থরাকে বললেন— মন্থরা, আজ আমার কি আনন্দের দিন। আজ আমার পুত্র শ্রীরাম রাজা হবে।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে মন্থরা প্রশ্ন করল—শ্রীরাম কবে থেকে তোমার পুত্র হ কৈকেয়ী?

রানী কৈকেয়ী বিস্মিত হয়ে শয্যা পরিত্যাগ করে মন্থরাকে প্রশ্ন করলেন—এমন কথা বলছ কেন? কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং আমি তিন ভগ্নী রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন আমার চার পুত্র। আমি কোনদিন রাম ও ভরতের মধ্যে পার্থক্য বোধ করি নি, রামও আমাকে কোনদিন আপন মাতার চেয়ে কোন অংশে কম সম্মান প্রদর্শন করে নি। সে প্রত্যহ প্রভাতে এসে আমাকে প্রণাম করে আমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে তবে ব্যায়ামাগারে প্রবেশ করে। সে রাজা হলে তো আনন্দের কথা।

মন্থরা ধীরপদে কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গমন করল। অলিন্দে কেউ কোথাও আছে ক না লক্ষ্য করল, তারপর দ্বার বন্ধ করে পুনরায় কৈকেয়ীর শয্যাপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে রানীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পরম সোহাগভরা কণ্ঠে বলল—কৈকেয়ী, আমি তোমাকে বালিকা বয়স থেকে সেবা ও পরিচর্যা করছি।

—অস্বীকার করছি না।—কৈকেয়ীর উত্তর।

—আমি তোমার মঙ্গল ব্যতিরেকে অমঙ্গল প্রত্যাশা করব না।

—সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিন্ত।

—তাহলে মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর।

রানী কৈকেয়ী নীরব।

মন্থরা শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করে মৃদুকণ্ঠে বলল—তোমাকে মহারাজ দশরথ কেন বিবাহ করেছিলেন?

রানী কৈকেয়ী বিহ্বল দৃষ্টিতে মন্থরার দিকে অবলোকন করলেন, কোন উত্তর-দান করতে পারলেন না।

মন্থরা একই সুরে বলতে লাগল—মহারাজ দশরথ কেকয়রাজের প্রতাপে ভীত, সন্ত্রস্ত। তাঁর সর্বদা ভয়, যদি কেকয়রাজ অযোধ্যা অধিকার করে নেন, তাই তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে আপন রাজত্বকে নিষ্কন্টক করেছেন।

—না না, এ কথা বিশ্বাস হয় না। মহারাজ আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন।

—স্নেহ বা প্রেম করেন না, স্নেহ এবং প্রেমের অভিনয় করেন। প্রকৃতই যদি তোমাকে স্নেহ করতেন তবে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পূর্বেই তোমাকে দান করতেন। এ সময়ে তিনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে রাখতেন না। প্রকৃতপক্ষে রাজা দশরথ অতি গোপনে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্য সম্পন্ন করতে চান।

—তাতে মহারাজের কী কার্যসিদ্ধি হবে? আমার নিকট শ্রীরাম রাজা হলেও যা লাভ, ভরত রাজা হলেও সেই লাভ।

কৈকেয়ীর উত্তরে মন্থরা মৃদু কুটিল হাস্যে মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ করল। অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর মন্থরা পুনরায় বলতে শুরু করল—ভরত রাজা হলে তুমি হবে রাজমাতা, শ্রীরাম রাজা হলে তুমি হবে রাজমাতা কৌশল্যার দাসীমাত্র।

—চুপ কর। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কৈকেয়ী মন্থরাকে ভর্ৎসনা করলেন—কৌশল্যা আমার

জ্যেষ্ঠাপ্রতিম সহোদরা। তিনি আমাকে স্নেহ করেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কোনদিন তো তিনি আমাকে সোহাগ না করে আপন প্রাসাদে গমন করেন না।

—এ সব মহারানীর ভণিতা মাত্র। যতদিন শ্রীরামচন্দ্র রাজা না হবেন, ততদিন কৌশল্যা তোমার প্রতি এমন ব্যবহার করবে, কিন্তু যেদিন শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবেন, তার পরদিন হতে কৌশল্যা তোমাকে দাসীর ন্যায় জ্ঞান করবে। কৌশল্যা চিরকাল রাজমাতা হয়ে থাকবে, তুমি তার দাসী হয়ে দিনাতিপাত করবে।

—মন্থরা, তুমি কি বলছ?

—আমি যথার্থ কথাই বলছি। তুমি মূঢ়, তাই এখনও শয়ন করে আছো। ওঠ। তুমি আপন প্রকৃত অবস্থা অনুভব করতে পারছ না। তুমি মহারাজার প্রিয় নও, কেবল বাহ্যিক সু-ভাগ্যের আচরণ পেয়ে থাক; তবু তুমি সৌভাগ্যের গর্ব কর। তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মে নদীর ন্যায় অস্থায়ী।

রানী কৈকেয়ী তখন সত্যই বিহ্বলা। তিনি সভয়কণ্ঠে বললেন—আমার কি সত্যই কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে? তাই যদি হয়ে থাকে আমাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা কর।

ক্রোধে ও দুঃখে অলংকার খুলে ফেলে মন্থরা বলল—অতি দুঃখেও আমার হাসি আসছে। তোমার মহাবিপদ সমুপস্থিত। সপত্নীপুত্রের শ্রীবৃদ্ধি মৃত্যুতুল্য কোন বুদ্ধিমতী নারী সেইজন্য সুখী হয়?

কৈকেয়ী তখনও ধীরকণ্ঠে উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন—রাম ধর্মজ্ঞ, গুণবান শান্ত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, শুদ্ধস্বভাবের। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বদাই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, রাম রাজা হবার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পুত্রতুল্য পালন করবে। মন্থরা, তোমার কিসের খেদ? রামের পরে ভরতও নিশ্চয় পৈতৃক সিংহাসন লাভ করবে। রাজ্য যদি রামের হয়, তাহলে সে রাজ্য ভরতের হবে। শ্রীরাম আমাকে কৌশল্যার থেকেও অধিক সেবাযত্ন করে।

—তুমি মূর্খ, তাই তুমি এ কথা বলছ। রামের পর রামের পুত্র রাজা হবে তোমার পুত্র নয়।

মন্থরা কুটিল নয়নে কৈকেয়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল, তারপর ধীরকণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গিতে বলল—ভামিনী, রাজার সকল পুত্র যেমন রাজ্য পায় না, তেমনি সকলেই একই রাজ্যে থাকলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। সেইজন্যে রাম রাজ্যলাভের পরই রাজ্য নিষ্কণ্টক করার জন্য ভরতকে দেশান্তরে অথবা লোকান্তরে পাঠাবে। তার চেয়ে আমার উপদেশ পালন কর। ভরতকে রাজগৃহ থেকেই বনবাসে পাঠিয়ে দাও, এ রাজ্যে আর কখনও এনো না। বৎস আমার অন্তত: জীবিত থাকবে। তাতে তোমারও মঙ্গল, আমারও ভাল। তুমি চিরকাল কৌশল্যার দাসীবৃত্তি করে জীবনপাত কর। আমি বরং রাজগৃহে

ত্যাগমন করি, আর যাই হোক দাসীর দাসীবৃত্তি আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মন্থরার কথায় রানী কৈকেয়ীর ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল, তিনি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ঘন ঘন পরিত্যাগ করে বললেন—আমি আজই রামকে বনবাসে পাঠাব এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব। এখন তুমি তার উপায় বল।

—প্রতিজ্ঞা করছ ?

—প্রতিজ্ঞা করছি।

—শোন তাহলে। তুমি আমাকে বলেছিলে একসময়ে মহারাজ যুদ্ধ করতে গিয়ে খুব আঘাতপ্রাপ্ত হন। তুমি তখন তাঁর সেবা কর। তোমার সেবাযত্নে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন মহারাজ তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন তিনি তোমাকে দুটি বরদান করবেন। তুমি বলেছিলে, এখন থাক—পরে প্রয়োজন কালে যথার্থ বর প্রার্থনা করব। সেই প্রয়োজন কাল আসন্ন। তুমি অভিমান কক্ষে প্রবেশ করে, অভিমান ও ক্রন্দনের অভিনয় কর। আমি মহারাজকে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করছি। তিনি এসে তোমায় প্রশ্ন করলে, তুমি দুটি বর প্রার্থনা করবে। প্রথম বরে রামচন্দ্রকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে প্রেরণ করতে হবে, দ্বিতীয় বরে ভরতের সদ্যই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। রাম দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর বনবাসে থাকলে, প্রজাগণ ক্রমে রামের কথা ভুলে যাবে এবং ভরতের অনুরাগী হবে। সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র প্রত্যাগমন করলেও প্রজাগণ আর তাকে রাজা বলে স্বীকার করবে না।

মন্থরার উপদেশ কৈকেয়ীর হিতকর বলে মনে হল। তিনি শয্যাত্যাগ করে বললেন—মন্থরা, তোমার উপদেশমত আমি যদি রামকে বনবাসে প্রেরণ করতে পারি এবং ভরতকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে আমি তোমাকে সর্ব আভরণে ভূষিত করব।

—তুমি ক্রোধাগারে শীঘ্র যাও, যে কোন মুহূর্তে মহারাজ স্বয়ং এস্থানে উপস্থিত হতে পারেন।

মন্থরার পরামর্শ অনুযায়ী রানী কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গমন করে সমস্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করে ভূমিতলে শয্যা গ্রহণ করলেন।

অনতিবিলম্বে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী-প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ময়ূর ময়ূরী চারিদিকে নৃত্যরত। পুষ্পবৃক্ষে প্রাত্যহিক পুষ্প প্রস্ফুটিত। চতুর্দিকে যেন এক অনিন্দ্য আনন্দের প্রকাশ।

—প্রিয়ে, প্রিয়তমা—রাজা দশরথ কৈকেয়ী কক্ষে প্রবেশ করে রানীর অন্বেষণ করলেন। রানী নাই। মহারাজ চিন্তা করলেন রানী হয়ত প্রসাধনে ব্যস্ত,

সেইজন্যে প্রসাধন কক্ষে প্রবেশ করলেন। সে স্থানেও রানী অবর্তমান। চিন্তিত হয়ে মহারাজা দ্বাররক্ষীকে প্রশ্ন করলেন—রানীমা কোথায় ?

মৃদুকণ্ঠে দ্বাররক্ষী উত্তর দিল—তিনি ক্রোধাগারে !

—ক্রোধাগারে ? বিস্মিত মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন—ক্রোধাগারে কেন ?

দ্বাররক্ষী নীরব।

মহারাজ অনুভব করলেন তিনি ভ্রান্তস্থানে প্রশ্ন করেছেন। তিনি দ্বাররক্ষীকে কোন প্রশ্ন না করে ক্রোধাগারের উদ্দেশে গমন করলেন।

ক্রোধাগারের দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধ দ্বার অল্প আয়াসেই উন্মুক্ত হয়ে গেল কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে মহারাজ বিস্মিত, বিমূঢ়, চিন্তিত। রানী কৈকেয়ী ভূলুণ্ঠিতা। তাঁর অলঙ্কারাদি কক্ষের সর্বত্র অযত্ন রক্ষিত।

মহারাজ কক্ষের দ্বার বন্ধ করলেন, তারপর ধীর পদক্ষেপে রানীর পার্শ্বে ভূমিতলে উপবিষ্ট হয়ে রানীর মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নিয়ে অত্যন্ত আদর ও সোহাগমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারানী, তোমার এ অবস্থা কেন ?

রানী কৈকেয়ী নীরবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাজা দশরথ বিহ্বল ও বিস্মিত হয়ে বললেন—রানী, কী হয়েছে তোমার ? তোমায় কি কেউ অপমান করেছে ? কেউ তিরস্কার করেছে ?

রানী কৈকেয়ী রাজার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে রোদনভরা কণ্ঠে বললেন—না মহারাজ, আপনি জীবিত থাকতে কেউ আমাকে অপমান বা তিরস্কার করবার সাহস রাখে না।

ক্ষণিক নীরব থেকে মহারানী কৈকেয়ী পুনর্বার সক্রন্দনে উক্তি করলেন—মহারাজ আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, তবেই আমি এই শয্যাতল ত্যাগ করব।

আলুলায়িতা ভূলুণ্ঠিতা রানী কৈকেয়ীর মস্তকে সস্নেহে হস্ত লেপন করে মহারাজ দশরথ তাঁর প্রেমের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে বললেন—তুমি কি জান না যে তোমার চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, কেবল রাম ব্যতিরেকে। আমার জীবনের অবলম্বন স্বরূপ সেই রামের শপথ করে প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা চাইবে, যা বলবে আমি তাই করব।

কৈকেয়ী সবিনয়ে উত্তর দিলেন—প্রাণাধিক, তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ এ কথা চন্দ্র সূর্য, তেত্রিশকোটি দেব-দেবী শুনেছেন, সাক্ষী রইলেন।

—কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। রাজা দশরথ যে প্রতিজ্ঞা করে তা কোনদিন নিষ্ফলা যায় না। প্রাণাধিকে, এবার গাত্রোত্থান কর। সুকেশো হও। তোমার ইচ্ছা কী আমাকে জ্ঞাত কর, আমি সম্পন্ন করে জীবন সার্থক করি।

—মনে আছে, তুমি আমাকে দুটি বর প্রদান করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে ?

রাজা দশরথ রানী কৈকেয়ীকে বক্ষে আলিঙ্গন করে প্রেমপ্লুতকণ্ঠে বললেন—সে প্রতিজ্ঞা আমি জীবিতকালে কোনদিন বিস্মৃত হব না। বল প্রিয়ে, তোমার প্রার্থনা কী ?

বক্ষলগ্না কৈকেয়ী দু বাহু দিয়ে মহারাজ দশরথের কণ্ঠ আবেষ্টন করে প্রেমনিঃসৃত কণ্ঠে বললেন—আমি দুটি বর প্রার্থনা করি ?

—এই মুহূর্তে কর। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আমি তা পূর্ণ করি।

মহারানী কৈকেয়ী ধীর-স্থির কণ্ঠে বললেন—প্রথম বরে আমি প্রার্থনা করি অদ্যই শ্রীরামের পরিবর্তে ভরতের রাজ্যলাভ হোক। তার অভিষেকের আয়োজন করুন। দ্বিতীয় বরে শ্রীরাম চীর অজিনধারী তপস্বী হয়ে চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করুক। ভরতের যৌবরাজ্য নিষ্কণ্টক হোক।

সাত

রাজা দশরথ সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা-লাভ করে চিন্তা করলেন, তিনি কি দিবাস্বপ্ন দেখছেন ? কৈকেয়ী যে বর প্রার্থনা করেছেন, তা কি সত্যই ? ক্লিষ্ট কণ্ঠে পুনরায় দশরথ প্রশ্ন করতে রানী কৈকেয়ী একই বরদ্বয় প্রার্থনা করলেন।

দশরথ উন্মত্তের ন্যায় বললেন—নৃশংসা দুষ্টচরিত্রা কুলনাশিনী পাপিনী, রাম তোমার কি ক্ষতি করেছে, আমিই বা কি অপরাধ করেছি ? রাম সর্বদা জননীর তুল্য তোমাকে সেবা করে, কেন তুমি তার এরূপ অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়েছ ? তুমি পূর্বে বহুবার বলেছ যে তোমার নিকট ভরত এবং রাম সমান, তবে কেন রামকে বন-বাসে প্রেরণ করতে চাও ? ভরতের থেকেও রাম তোমার অধিক সেবা করে, তার নিন্দা কেউ করে না। রাম সত্যবাক্যে সকলের মনোরঞ্জন করে। দ্বিজগণকে দান করে, গুরুজনকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, যুদ্ধে ভয়ংকর শরধনু দ্বারা শত্রু জয় করে। সেই একমাত্র রাজা হবার যোগ্য। রাম কোনদিন কাউকে অপ্রিয় কথা বলে না। আমিই বা কী প্রকারে তাকে এই কঠিন অপ্রিয় বাক্য বলব ? কাতরকণ্ঠে দশরথ অনুনয় ভিক্ষা করে বললেন—আমার জীবনের সায়াহ্ন উপস্থিত। তুমি করুণা কর। তোমার এই বরপ্রার্থনা প্রত্যাহার কর। তুমি আমাকে হত্যা কর না। রামবিহনে আমার মৃত্যু অবধারিত। আমি তোমার পদস্পর্শ করে করুণাভিক্ষা করছি, তুমি আমাকে অধর্মে লিপ্ত কর না।

—মহারাজ ! কৈকেয়ী সেদিন সেবাযত্নে মহারাজের জীবন রক্ষা করেছিল বলেই

আজ তিনি জীবিত। শ্লেষাক্ত কণ্ঠে কৈকেয়ী পুনরায় উচ্চারণ করলেন—আজ তুমি রামকে রাজ্য দান করে কৌশল্যার সঙ্গে নিত্য বিহার করতে চাও? ধর্ম-অধর্ম জানি না। তুমি আমার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই অঙ্গীকার তোমাকে পূরণ করতে হবে, অন্যথায় আমি বিষপান করে আত্মহত্যা করব। আমাকে যদি একদিনও দেখতে হয় রাজমাতা কৌশল্যার নিকট রাজ্যের লোক হাতজোড় করে করুণাভিক্ষা করছে, আর আমি দাসীর ন্যায় দীনভাবে দিনপাত করছি, সেই দিনই আমি মরণকে আলিঙ্গন করব।

কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর বাক্যে দশরথ নীরব, নিথর। পরক্ষণেই তিনি পুনর্বার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হলেন। অল্পক্ষণ পরে দশরথ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—কৈকেয়ী, তুমি তো এ প্রকৃতির নারী নও? কে তোমাকে এই অনর্থক কার্যে প্রবৃত্ত করেছে? তুমি প্রেতিনী-আবিষ্ট হয়ে আমাকে যা বলছ, তাতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? রামকে বনে প্রেরণ করলে কৌশল্যা আমাকে কি বলবেন? শঠ ও স্বার্থপর নারীজাতিকে ধিক—অবশ্য সকল স্ত্রীলোককে বলছি না, ভরতের মাতাকেই বলছি।

কৈকেয়ী উত্তরে বললেন—মহারাজ, তুমি নিজেকে সত্যবাদী দৃঢ়ব্রত বলে থাক। তবে কেন প্রতিশ্রুত বর প্রত্যাহার করতে চাও? তাই যদি কর, আমি অযোধ্যার প্রতি গৃহে গৃহে প্রচার করব—দশরথ, তুমি পরম অধর্মচারী রঘুকুলপতি।

দশরথ নীরব, বিষণ্ণ, প্রস্তরবৎ স্থাণু।

কৈকেয়ী সাদরকণ্ঠে বললেন—মহারাজ, তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন পাপীর ন্যায় বিষণ্ণ হয়ে ভূলুণ্ঠিত কেন? ধর্মজ্ঞরা বলেন,সত্যই পরম ধর্ম। আমি তোমাকে সেই সত্যপালন করতে বলেছি কেবল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রাত্রি সমাগত। সমস্ত রাজ্য এক অনাগত অমঙ্গল আশঙ্কায় স্তব্ধ। দশরথ আপন সত্যপাশে বদ্ধ। বামনের বাক্যে বলিরাজ যেরূপ বদ্ধ হয়েছিলেন রাজা দশরথের অবস্থাও তদ্রূপ। তথাপি তিনি অন্তিম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি কঠিনকণ্ঠে বললেন—পাপিয়সী, আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্রদ্বারা তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু এখনই তোমাকে পরিত্যাগ করলাম, ভরতকে ত্যাজ্যপুত্র করছি। অনতিবিলম্বে রামের অভিষেক কার্যারম্ভ হবে। যদি রামের অভিষেক না হয়, তবে সেই কারণেই আমার মৃত্যু হবে এবং রাজ্যাভিষেকের সমস্ত উপকরণ সহকারে রাম আমার দেহ সৎকার করবে, ভরত নয়।

কৈকেয়ী ততোধিক কঠিন কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—এখন আবার অন্য কথা বলছ কেন? এখনই রামকে আনাও, তাকে বনে প্রেরণ করে আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যদান কর।

দশরথের স্নায়ুমণ্ডলী ক্রমশঃ শিথিলতা ধারণ করল। সমস্ত দেহ অবশ হয়ে

গেল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—আমি ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ। আমার চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি রামকে দেখতে ইচ্ছা করি।

প্রতি গৃহে মঙ্গলঘট পূর্ণ হল। শঙ্খধ্বনিতে অযোধ্যানগরী পূর্ণ হল। নাগরিকবৃন্দ নবনির্মিত পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত অবস্থায় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উৎসব দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মধ্যে মধ্যে জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয় ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগল।

ঋষি বশিষ্ঠ শুভ মুহূর্তে উপস্থিত হলে অভিষেকের উপকরণ সম্ভার সজ্জিত করে সশিষ্য রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি সুমন্ত্রকে অপেক্ষারত অবস্থায় দেখে আদেশ দিলেন—শীঘ্র রাজাকে সংবাদ দাও, আমি উপস্থিত, সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, পুরবাসী, বণিকগণ, নাগরিকবৃন্দ, অন্যান্য রাজন্যবর্গ প্রভৃতি সকলেই অপেক্ষা করছেন। এই শুভ মুহূর্তে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক পূজা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন।

সুমন্ত্রের রাজপুরীতে অবারিত গতি। তিনি ক্রোধাগারের সমীপে উপস্থিত হয়ে রাজা দশরথের প্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্বক বললেন—মহারাজ, দিবাকর উদিত হয়ে যেরূপ সাগর মহাসাগরকে আনন্দ প্রদান করে, সেইরূপ আপনি প্রজাগণকে দর্শন দান করে, তাদের আনন্দবর্ধন করুন। অভিষেকের আয়োজন পূর্ণ। সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শোকার্ত দশরথ আরক্ত নয়নে সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—তোমার কথায় আমার মর্মস্থল ছিন্ন হচ্ছে।

সুমন্ত্র দ্বিধাগ্রস্ত। বিস্মিত। চিন্তিত। রাজা দশরথের শোকার্ত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে দ্বার হতে কিঞ্চিৎ দূরে সরে গেলেন।

রানী কৈকেয়ী দ্বারপ্রান্তে এসে বললেন—সুমন্ত্র, রাজ্যাভিষেকের আনন্দে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে মহারাজ পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর। আপনি রামকে সংবাদ প্রেরণ করে এই কক্ষে আনয়ন করুন।

সুমন্ত্র করযোড়ে বিনীত ভঙ্গিতে উত্তর দান করলেন—দেবী, রাজাদেশ না হলে আমি কী ভাবে এ কার্য পালন করি ?

দশরথ ভূমিতল হতে ক্ষীণকণ্ঠে আদেশ দিলেন—সুমন্ত্র, আমি রামের দর্শনলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করি, শীঘ্র তাকে এস্থলে আনয়নের ব্যবস্থা কর।

সুমন্ত্র অভিবাদন করে রাজাদেশ পালনের নিমিত্ত রামের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রা করার পূর্বে সুমন্ত্র ক্ষণিক অপেক্ষা করে কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—আমি রাজাজ্ঞায় রামকে আনতে যাচ্ছি। কিন্তু ঋষি বশিষ্ঠ, রাজা দশরথ এবং রামের পূজনীয়। তিনি যদি প্রশ্ন করেন রাজার নিদ্রাভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি কক্ষ ত্যাগ করছেন না, তখন আমি তাঁকে কী উত্তর দান করব ?

মহারাজ দশরথ গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিলেন—আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছি, রামকে নিয়ে এস। তবে আমার আজ্ঞা পালন করছ না কেন? বিলম্ব করছ কেন? যাও, শীঘ্র যাও, রামকে এস্থানে উপস্থিত কর।

সুমন্ত্র আর দ্বিরুক্তি না করে ধ্বজপতাকাশোভিত আনন্দমুখর রাজপথে রথ-চালনা করে রাম-ভবনে উপস্থিত হলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রাসাদভবন স্বর্ণে, রৌপ্যে, পুষ্পে, শস্যে সুসজ্জিত। দ্বারের সম্মুখে বহু লোক উপহারসহ কৃতাঞ্জলি হয়ে উর্ধ্বমুখে রামের জন্যে অপেক্ষা করছে। সুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বার পার হয়ে দেখলেন কুণ্ডলধারী যুবকগণ প্রাস ও কার্মুক হস্তে পাহারা দিচ্ছে। কাষায় বস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা বেত্রহস্তা বৃদ্ধারা দ্বারদেশে বসে আছে। সুমন্ত্রকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

সুমন্ত্র তাদের একজনকে বললেন—শ্রীরামকে সংবাদ দাও,আমি দ্বারে উপস্থিত।

অল্পক্ষণ পরে একজন মহিলা কক্ষের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আপনি কক্ষাভ্যন্তরে আসুন।

সুমন্ত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে স্বর্ণময় পর্যংকে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর অঙ্গ রক্তবর্ণ চন্দনে অনুলিপ্ত, পার্শ্বে সীতাদেবী চামরহস্তে উপবিষ্টা। এ যেন চিত্রা নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রের অপূর্ব মিলন।

সুমন্ত্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে শ্রীরাম পর্যঙ্ক থেকে অবতরণ করে প্রশ্ন করলেন—কি সংবাদ সুমন্ত্রদেব?

—মহারাজ আপনাকে রানী কৈকেয়ী-আলয়ে আহ্বান করেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রের বার্তা শুনে সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আনন্দিত স্বরে বললেন—দেবি, মহারাজ নিশ্চয়ই মাতৃপ্রতিমা কৈকেয়ীর সঙ্গে অভিষেকের পরামর্শ করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাচ্ছি। ততক্ষণ তুমি সখীদের সঙ্গে বিচরণ কর।

সীতা রামের সঙ্গে দ্বারদেশ পর্যন্ত অনুগমন করে বললেন—মহারাজ তোমাকে দ্বিজগণ সম্পাদিত যৌবরাজ্যে এবং পরে রাজসুয় যজ্ঞে অভিষিক্ত করুন। তুমি ব্রত গ্রহণ করে পবিত্র অজিন ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ করবে। এই আমি দেখব। দেবতাগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রাসাদের বাইরে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা হল। দুই ভ্রাতা সুমন্ত্রের সঙ্গে রথারোহণ করে দ্রুতবেগে রাজপথ অতিক্রম করে মহারাজ ভবনে উপস্থিত হলেন।

শ্রীরাম দশরথের নিকটে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলেন—রাজা অত্যন্ত বিষণ্ণ ও শুষ্ক।

শ্রীরাম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর পিতার ও কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করলেন। দশরথ অশ্রুসজল নয়নে কেবলমাত্র রাম নাম উচ্চারণ করলেন।

শ্রীরাম তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পিতাকে লক্ষ্য করলেন। রাজার রূপ পাদপৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ, তিনি ব্যাকুলভাবে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

পিতার এই শোক দেখে রাম চিন্তা করলেন, কি এমন ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য পিতার এই শোচনীয় অবস্থা? মহারাজ কি তাঁর উপর কুপিত হয়েছেন? অন্যদিন রামদর্শনে তিনি আনন্দিত হন। প্রসন্ন মনে কথাবার্তা বলেন। আজ কেন সম্পূর্ণ নীরব?

শ্রীরাম রানী কৈকেয়ীর প্রতি দৃকপাত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—মাতা, আমি কি অজ্ঞানতাবশে কোন অপরাধ করেছি? পিতার কি কোন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ হয়েছে? কুমার ভরত, শত্রুঘ্ন অথবা আমার মাতৃগণের কোন অশুভ হয় নি তো? দেবি! আপনি কি অভিমানবশে পিতৃদেবকে কোন কঠিন বাক্যে জর্জরিত করেছেন?

ধীর, স্থির, অকম্পিত কণ্ঠে রানী কৈকেয়ী উত্তর দিলেন—রাম, রাজা কুপিত হন নি, কোনও বিপদ হয় নি। এঁর মনে তোমাকে কিছু বলার বাসনা আছে। কিন্তু কুণ্ঠায়, ভয়ে, লজ্জায় সে কথা উচ্চারণ করতে পারছেন না। তুমি রাজার অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য সেই অপ্রিয় কথা ওঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে না। ইনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তোমাকে অবশ্য পালন করতে হবে। রাজা আমাকে আদর করে বর দিয়ে এখন অনুতাপ করছেন।

রানী কৈকেয়ী অল্পক্ষণের জন্য নীরব হলেন। তিনি শ্রীরামের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তারপর পুনরায় বললেন—সত্যই ধর্মের মূল। অতএব রাজা যেন তোমার প্ররোচনায় কুপিত হয়ে সত্য ত্যাগ না করেন। শুভ বা অশুভ রাজা যা বলবেন, তাই তোমাকে পালন করতে হবে—এই প্রতিশ্রুতিতে যদি প্রস্তুত থাক, তবে তোমাকে আমি সব কথা বলতে পারি।

শ্রীরাম রাজোচিত ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন, রাম কখনও দু' প্রকার কথা বলে না। রাজা কি চান আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

রানী কৈকেয়ী শ্রীরামের কথার রেশ শেষ হতে না হতে বললেন—বহুদিন পূর্বে এক যুদ্ধে আহত তোমার পিতার সেবা করি, তিনি সুস্থ হয়ে উঠে আমাকে দুটি বর দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই বরগ্রহণ আমি স্থগিত রেখেছিলাম। বর্তমানে আমি সেই দুই বর প্রার্থনা করেছি। প্রথম বরে অদ্যই ভরতের রাজ্যাভিষেক হবে, দ্বিতীয় বরে তুমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করে চতুর্দশ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে বনবাসী হবে! আমার ইচ্ছা, তুমি কালবিলম্ব না করে পিতৃসত্য পালন কর।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্যে উত্তর দান করলেন—দেবি, নিশ্চয়ই পিতৃসত্য পালন করব। কিন্তু রাজা আপন মুখে একথা উচ্চারণ করতে এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? রাজার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য জটাচীরধারী হয়ে বনে যাত্রা করব। দূতেরা আজই দ্রুতগামী অশ্বে ভরতকে আনতে যাক। আমি সত্বর দণ্ডকারণ্যে যাবার ব্যবস্থা করছি।

কৈকেয়ী মনে মনে হৃষ্ট হলেন, তবু কোথায় যেন সন্দেহের তীর বিঁধে হয়ে থাকল। তিনি আপন হৃদয়কে যথাযথ শান্ত করে বললেন—হ্যাঁ, দূতেরা ভরতের মাতুলালয়ে যাবে। তোমাকেও তো বনগমনের জন্য উৎসুখ দেখছি, অতএব তুমিও শীঘ্রই বনে যাও। লজ্জার জন্যই রাজা কথা বলছেন না, তুমি শীঘ্র যাত্রা করে এঁর দীনভাব দূর কর। তুমি যাত্রা না করলে উনি স্নান ভোজনও করবেন না।

রাজা দশরথ ধিক ধিক শব্দ উচ্চারণ করে, মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়লেন।

কৈকেয়ীর কথায় শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর ভাবে উত্তরদান করলেন—দেবি, আমি অর্থ-লোভী হয়ে পৃথিবীতে বাঁচতে চাই না। আপনি জানবেন, আমি ঋষিদের মতই বিশুদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করেছি। ধার্মিক, নির্লোভ, বীর না হলে, নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি না থাকলে প্রকৃত নৃপতি হওয়া সম্ভব নয়। আমার জীবনে নিশ্চয়ই কোথাও অসম্পূর্ণতা আছে, সেইজন্য আমি রাজা হতে পারলাম না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন—আমি জননীকে জানিয়ে এবং সীতাকে অনুনয় করে আজই বনে গমন করব।

দশরথ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র নীরবে রাজা দশরথ এবং কৈকেয়ীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কৈকেয়ী-পুরী হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সে স্থান থেকে শ্রীরাম অভিষেকশালার সামগ্রীসম্ভার প্রদক্ষিণ করলেন, কিন্তু তাতে দৃষ্টিপাত না করেই মৃদু পদক্ষেপে জননীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরাম রাজ্য, রাজ-ছত্র, চামর, রাজভূষণ, রথ, স্বজন ও পৌরজনকে ত্যাগ করে বনযাত্রার জন্য প্রস্তুত। সেই লোকোত্তরচরিত রামের চিত্তবিকার লক্ষিত হল না। তাঁর ধারণা, এখনো তিনি সম্পূর্ণ নায়ক রূপে নিজেকে সৃষ্ট করতে পারেন নি, নিশ্চয়ই কোথাও চরিত্র-পূরণের কোন অসাফল্য বর্তমান রয়ে গেছে। এখনও সম্পূর্ণ দেশের সঙ্গে, সর্ব জাতির সঙ্গে পরিচিত নই, সেইজন্য রাজত্ব গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয় নি।

শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা ভবনে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বার্তা জ্ঞাপন করলেন। সে স্থানে লক্ষ্মণও উপস্থিত ছিল। কৌশল্যা রামের বনগমনের কথা শ্রবণ করে ভুলুণ্ঠিতা হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে উদ্দেশ করে বললেন—মাতা, রাঘব রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে যাবেন, এ আমি অত্যন্ত অন্যায় মনে করি। আমাদের পিতার বয়স অনেক হয়েছে। বার্ধক্যজনিত বিপরীত বুদ্ধিতে তিনি এই সব কাণ্ড করে বসে আছেন। যদি তাঁর বিন্দুমাত্র ধর্মজ্ঞান থাকত, তাহলে তিনি কখনই দেবতুল্য পুত্রকে ত্যাগ করতে পারতেন না। রাজা বর্তমানে বৃদ্ধ এবং স্ত্রৈণ। তিনি স্ত্রীবুদ্ধিতে প্রলয়ঙ্কর কাজ করছেন, আমরাও প্রলয়ঙ্করতর কার্যে প্রবৃত্ত হব।

তারপর লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকট গমন করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—রাঘব, জনসাধারণ কিছু জ্ঞাত হবার পূর্বেই আমরা অর্থাৎ আপনি এবং আমি এই রাজ্য অধিকার করে

নিই। আমি যদি কৃতান্তের তুল্য ধনুর্বান হস্তে আপনার পার্শ্বে দন্ডায়মান হই তাহলে কার সাধ্য আমাদের বাধা দেয়? যারা ভরতের পক্ষ নেবে তাদের সকলকেই আমি অনায়াসে বধ করব। আমি বৃদ্ধ পিতাকে হরণ করব। যিনি স্ত্রৈণ, যিনি বিপরীত বুদ্ধিতে এই কুকর্ম করেছেন, তার শাস্তি প্রয়োজন। আমি তাকে হরণ করে কারারুদ্ধ করব অথবা বধ করব, বয়োজ্যেষ্ঠগণও অপরাধ করলে, তার প্রতিবিধান সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। রাঘব, আপনি আমাকে কেবল আদেশ দান করুন, আমি নিমেষের মধ্যে রাজ্য অধিকার করে নিই। যে রাজ্য ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আপনার প্রাপ্য সে রাজ্য থেকে কেন আপনি বঞ্চিত হবেন?

রাম কৌশল্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কৌশল্যা বললেন—পুত্র, লক্ষ্মণের কথা তো শুনলে, যদি উচিত বোধ হয়, তাই কর। সপত্নী কৈকেয়ীর কথায় তুমি শোকার্তা জননীকে পরিত্যাগ করে যেও না। রাজা যেমন তোমার পূজ্য, আমিও সেরূপ তোমার পূজনীয়া। আমি তোমাকে বনে যেতে দেব না।

শ্রীরাম মৃদু হাস্য করলেন।

কৌশল্যা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি হাসছো কেন?

—জননি! আপনি কেবল জননী, কিন্তু আমি শুধু পুত্র নই, আমি রাজা, আমি জননায়ক। আমি দৃষ্টান্ত রেখে যাব, যা স্মরণ করে চিরকাল নায়কের চরিত্র সৃষ্ট হবে।

—কি সে?

—আমি লোভী নই, আমি অবাধ্য নই, অথচ আমি বীর এবং সকলের সম্মান রক্ষা করার ক্ষমতা রাখি। জননী আমার, এখনও আমার রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত হয় নি, এখনও আমাকে লোকচরিত্র সম্পর্কে বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতে হবে। বহু দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আপনি দেখবেন, চতুর্দশ বৎসর অতি সত্বর অতিবাহিত হয়ে যাবে! দেখবেন চতুর্দশ বৎসর পরে বন হতে প্রত্যাগমন করে পুনর্বার আমি অযোধ্যার নৃপতি হব। এখন দৈব বাম, রাজ্যাভিষেকের সময় যথার্থ নয়।

লক্ষ্মণ রুষ্টকণ্ঠে বললেন—দৈব বাম? দৈবের এবং বিধির উদাহরণ দেন যাঁরা ভীরু কাপুরুষ, তাঁরাই দৈবের দোহাই দেন, ভাগ্যের কথা তোলেন, কিন্তু যাঁরা বীর, যাঁরা পুরুষ, তাঁরা আপন পৌরুষে সেই ভাগ্যকে জয় করে নেন। আমরা আজ পৌরুষের দ্বারা দৈব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব; দেখা যাক আমরা জয়লাভ করি, কি দৈব জয়লাভ করে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বললেন—লক্ষ্মণ, বীরত্ব প্রদর্শন করা ক্ষণিকের কর্ম। বিদ্রোহ করা তদপেক্ষা সহজ কাজ, কিন্তু সর্বদিক রক্ষা করে আপন কর্তব্য পালন করাই মনুষ্যধর্ম, আর সেই ধর্মই পালন করা সবচেয়ে কঠিন। সেই ধর্ম-পালনই আমার কর্তব্য।

—কি ধরনের কর্তব্য আপনি করছেন ? লক্ষ্মণ উগ্রস্বরে উত্তর দিলেন—বৃদ্ধ রাজার এখন বনযাত্রা করা উচিত। তিনি রানীদের সঙ্গে প্রমোদ-আহ্লাদ করবেন আর তরুণ যুবক সন্ন্যাসীর চীর পরিধান করে বনবাসে যাত্রা করবেন এ কেমন ধর্ম ?

—লক্ষ্মণ! পিতার আদেশ পালন করাই ধর্মের প্রধান কথা।

—মাতার আদেশ কি পালনীয় নয় ? —কৌশল্যা প্রশ্ন করলেন।

—পিতা বর্তমানে প্রথমে পিতার আদেশ পালন করতে হয়। জননী আমার, আপনি জ্ঞাত আছেন আমাদেরই বংশে পিতার আদেশে ভূমি খনন করতে গিয়ে সগর-বংশের বিনাশ হয়, ধর্মজ্ঞ ঋষি কিন্তু পিতার আজ্ঞায় গোবধ করেছেন। জামদগ্ন্য রাম পিতার আদেশে জননী রেণুকার শিরচ্ছেদন করেছিলেন। আজ যদি পিতা জীবিত না থাকতেন নিশ্চয়ই আপনার আদেশ সর্বাগ্রে পালন করতাম।

রাম অল্পক্ষণ নীরব থেকে সোহাগভরা কণ্ঠে বললেন—জননি আমার, যদি জীবনে আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন না করি, সাধারণ মানুষ কেন আমার আদেশ পালন করবে ?

রানী কৌশল্যা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যখন কিছুতেই রামকে বনযাত্রা হতে নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন কৌশল্যা সজল নয়নে বললেন—তুমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, বীরশ্রেষ্ঠ। তোমাকে তর্কে পরাভূত করা আমার সাধ্যাতীত। আমি তোমার জননী, গর্ভধারিণী। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার বনযাত্রা সার্থক হোক, জয়যাত্রা হোক। চতুর্দশ বৎসর আমি প্রতীক্ষায় থাকব। আমি 'জীবিত থাকব। আমি প্রত্যক্ষ করব, তুমি চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত করে পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেছ! তুমি আপন ধর্মে প্রজারঞ্জক হয়ে রাজ্যপালন করছ।

হৃষ্টমনে শ্রীরামচন্দ্র মাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে আপন ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন সীতাদেবীর অনুমতি ভিক্ষার প্রয়াসে।

আট

জনকদুহিতা সীতাদেবী দেবার্চনা সমাপ্ত করে হৃষ্ট ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় উপবিষ্টা ছিলেন।

শ্রীরাম অধোবদনে ও বিষণ্নচিত্তে কক্ষে প্রবেশ করলেন। পরম বুদ্ধিমতী সীতাদেবী অনুভব করলেন কিছু অমঙ্গল ঘটনা ঘটেছে। তিনি আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—প্রভু, এই শুভদিনে তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখছি কেন? শতশলাকাময় শ্বেত ছত্র, হংসশুভ্র চামর স্তুতি পাঠক বন্দী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমার সঙ্গে নেই কেন? তোমার সম্মুখে চতুরশ্ব রথ, কৃষ্ণগিরিতুল্য হস্তী এবং কাঞ্চনময় সিংহাসন কেন এল না? অভিষেকের সময়ে তোমাকে নিদারুণ নিরানন্দ দেখছি কেন?

শ্রীরাম উত্তরদান করলেন—সীতা, পূজনীয় পিতা আমাকে চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে প্রেরণ করছেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করছেন। বনযাত্রার পূর্বে তোমাকে দর্শন করতে এসেছি।

সীতাদেবী গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি ঘটনা ঘটেছে আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত কর।

শ্রীরামচন্দ্র ধীর অকম্পিত স্বরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন।

সীতাদেবী নীরব।

শ্রীরাম ধীর স্থির কণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গীতে বললেন—কল্যাণী, তুমি ব্রত উপবাসে নিরত থাকবে। প্রত্যহ দেবার্চনার পর, আমার পিতার পাদবন্দনা করবে, আমার শোকার্তা মাতা কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা করবে। ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করবে না অথবা কিছু সাহায্য ভিক্ষা করবে না। কারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি অন্যের স্তুতি সহ্য করতে পারে না এবং সাহায্যপ্রার্থিনীর প্রতি অশুভ আচরণ করতে পারে। ভরত-শত্রুঘ্ন আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তুমি তাদের সন্তানের মত পালন করবে।

সীতাদেবী স্বামীর কথা একমনে শুনলেন, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না।

সীতার দৃষ্টিতে রামের অস্বস্তি। সীতার চক্ষুদ্বয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শ্রীরাম অধীর কণ্ঠে বললেন—দেবী! এ রকম নীরব থেকো না। যা হোক কিছু বাক্য উচ্চারণ কর।

সীতা তখনও নিশ্চুপ।

শ্রীরাম ভীত হলেন। চিন্তা করলেন এই শোকবার্তা শ্রবণ করে সীতা প্রস্তরবৎ হয়ে গেছেন। আতঙ্কিত স্বরে শ্রীরাম উচ্চকণ্ঠে বললেন—সীতা, সীতা কথা কও—

সীতা ধীরকণ্ঠে বললেন—তুমি আমাকে তুচ্ছ ভেবে কি বলছ, সেই কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। তোমার কথাগুলি শাস্ত্রজ্ঞ বীর রাজপুত্রের অযোগ্য এবং শোনাও উচিত নয়! আর্যপুত্র—তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পুত্রবধূ এঁরা সকলেই আপন আপন ভাগ্যফল লাভ করে থাকেন। কেবলমাত্র পত্নীই পতির ভাগ্য পায়, অতএব তোমার সঙ্গে আমিও বনে যাত্রার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন বীর নায়ক সীতাদেবীর বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অপেক্ষণ পরে স্নেহমিশ্রিত স্বরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে সম্বোধন করে বললেন—আমি জনহীন দুর্গম বনে যাব, যেখানে বহু প্রকার মৃগ, সরীসৃপ, শার্দুল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশু বিচরণ করে। সেখানে তোমাকে সংগে নিয়ে যাবার সংকল্প করতেও সাহস হচ্ছে না।

সীতাদেবী মনমোহিনী হাস্য করলেন। শ্রীরামচন্দ্র অনুভব করলেন সীতাদেবী সর্বপ্রকার দুঃখের উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে এক চিরশান্তির রাজ্যে বিচরণ করছেন। সীতাদেবী হাস্যমধুর কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—যেমন পিতার ভবনে, তেমনি বনে আমি তোমার সঙ্গে বাস করব। সংযত ব্রহ্মচারিণী হয়ে নিত্য তোমার সেবা করব. মধুগন্ধী বনে মনের আনন্দে তোমার সঙ্গে থাকব। তোমার বিহনে স্বর্গবাসেও আমার রুচি নেই।

সীতাকে নিরস্ত কবার নিমিত্ত রাম বললেন—তুমি ধর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, অতএব এইখানে বসবাস করেই ধর্মাচরণ কর। লতাকণ্টকে সমাকীর্ণ শ্বাপদ-সরীসৃপ-সংকুল অরণ্যে বহু বিপদ, বহু দুঃখ। সেখানে তোমার যাওয়া উচিত হবে না।

মৃদুহাসিনী সীতা সজলনয়নে বললেন—মহাশয়, শার্দুল সরীসৃপ প্রভৃতি কোন জীবই অকারণে অন্যকে আক্রমণ করে না। হত্যা করে না। তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করলে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আক্রমণ করে, অথবা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যের জন্য আক্রমণ করে। আমি তাদের প্রতি এমন ব্যবহার করব যে তারা বন্ধুভাবে আমাকে রক্ষা করবে। আর্য, তুমি বনবাসের যে দোষ বললে, তোমার স্নেহভাগিনী হয়ে আমি তা গুণ বলেই বিচার করব। বনের হিংস্র পশুরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, স্বয়ং ইন্দ্রও ছলনা করে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

শ্রীরামচন্দ্র নীরব।

সীতা সানুনয় কণ্ঠে বললেন, পূর্বে পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণদের নিকট শ্রবণ করেছি, আমার ভাগ্যে বনবাস লিখিত আছে। তাঁদের সেই ভবিষ্যতবাণী সার্থক হোক। আমি বনবাসে যাত্রার জন্য মন স্থির করে ফেলেছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি

পতিব্রতা, তোমার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, তোমাকে ভক্তি করি, আমাকে নিয়ে চল, নয় তো বিষপানে অথবা অগ্নিপ্রবেশে বা জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করব।

শ্রীরামচন্দ্র শেষ চেষ্টা করলেন সীতাকে নিবৃত্ত করার—সীতা, তোমাকে সেই ভয়ঙ্কর বনে কি প্রকারে সঙ্গে নিই বল তো ?

সীতাদেবী স্বামীকে উত্তেজিত করার জন্যে উপহাস করে বললেন—আমার পিতা কি জ্ঞাত ছিলেন যে তাঁর জামাতা আকারে পুরুষ, কিন্তু কার্যে স্ত্রীলোকের থেকেও অধম ? কি তোমার ভয় যে পত্নীকে ত্যাগ করে যেতে চাও ? তুমি আমাকে বালিকা বয়সে বিবাহ করেছিলে। তোমার ধনুর্ভঙ্গ দর্শন করে সেদিন মোহিত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ বুঝছি তুমি ভরতের ভয়ে আমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছ না। কিন্তু মনে রেখ, তুমিও বনবাসে যাত্রা করবে আর আমিও আত্মহত্যা করব। নিশ্চয়ই জান জনক-দুহিতা জানকী কখনও মিথ্যাভাষণ করে না।

সীতার কণ্ঠস্বরে শ্রীরামচন্দ্র ভীত হয়ে পড়লেন। সীতা ব্যতিরেকে অন্য কোন নারীকে আপন পত্নীরূপে কল্পনা করাও পাপ এই স্থির বিশ্বাস শ্রীরামচন্দ্রের মনে একান্তভাবে বদ্ধমূল। সেইজন্য ভার্যাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন - তথাস্তু। আমার কোথাও ভয় নাই। তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় না জানার জন্যই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই নি। মৈথিলী, তুমি যখন আমার সঙ্গে বনে যাওয়াই স্থির করেছ, তখন তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। তুমি আমার সহধর্মচারিণী হয়ে চল। বনযাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মণদের রত্ন এবং ভিক্ষুকদের ভোজ্য দান কর। মহার্ঘ ভূষণ, উত্তম বস্ত্র, রমণীয় ক্রীড়নক, শয্যা, যান এবং আমাদের ব্যাক্তিগত সম্পদ যা আছে, তা ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে দান কর।

সীতাদেবী পরম আনন্দে স্বামীর আদেশ পালনে ব্যাপৃতা হলেন।

লক্ষ্মণ রাম-সীতার সংকল্পে জ্ঞাত হয়ে বললেন—আপনারা যখন বনযাত্রার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছেন, তখন আপনাদের সঙ্গে আমিও বনে যাব।

শ্রীরামচন্দ্র সস্নেহ ভঙ্গীতে উত্তরদান করলেন—সৌমিত্রি, তুমি ধর্মপরায়ণ, বীর, আমার প্রাণসম প্রিয় অজ্ঞাবহ সখা। তোমার কোন কথায় না বলতে আমার বাধে, কিন্তু ভেবে দেখ, আমরা উভয়েই যদি রাজ্যত্যাগ করি, তাহলে জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রার চরম দুর্গতি হবে। রাজমাতা কৈকেয়ীর বশেই থাকবেন মহারাজ দশরথ, অন্যান্য সপত্নীদের সহিত তিনি দাসীর ন্যায় ব্যবহার করবেন। তুমি বরং এখানে বাস করে আপন শক্তিতে তাঁদের ভরণপোষণ কর।

লক্ষ্মণ অস্থির কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—আপনার ভয়ে ভরত সে কার্য কখনই করবে না। যদি কখনও করে, আমাদের প্রত্যাগমনের পর নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে বধ করব। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমাকে আপনাদের সহচর হবার আদেশ দিন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন কোন প্রকারেই লক্ষ্মণকে নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন আদেশ দিলেন—বেশ, তবে তোমার সুহৃদগণের,* অনুমতি নিয়ে এস। রাজা জনকের মহাযজ্ঞে বরুণ ভীমদর্শন ধনু, অভেদ্য কবচ, দিব্য তূণ, অক্ষয় বাণ এবং সূর্যতুল্য আভাময় স্বর্ণালংকৃত খড়্গ দিয়েছিলেন, তা আচার্যের গৃহে রাখা আছে। তুমি শীঘ্র সেসব নিয়ে এস। লক্ষ্মণ সানন্দে গমনোদ্যোগ করলে শ্রীরাম পুনরায় বললেন—আর একটি কাজ কর। তুমি বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে শীঘ্র ডেকে আন। আমি আমার ব্যক্তিগত অর্থ, সম্পদ সমস্ত কিছু ব্রাহ্মণদের দান করে যাব।

লক্ষ্মণ আপন সুহৃদবর্গের অনুমতি ভিক্ষা করে সুযজ্ঞকে আহ্বান করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণের সাহায্যে ব্রাহ্মণগণকে এবং দরিদ্র জনসাধারণকে তাঁর নিজস্ব সম্পদের সমস্তই অকাতরে দান করলেন। তাঁরা হৃষ্টমনে দান গ্রহণ করে বিদায় নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন - এখন আমি নিশ্চিন্ত। এবার স্বচ্ছন্দে বনযাত্রা করতে পারি।

নয়

রাম-লক্ষণ-সীতা দশরথ ভবনের সম্মুখে পদব্রজে উপস্থিত হলেন। জনসাধারণ ব্যাকুল নয়নে তাঁদের অবলোকন করলেন। সকলেই একবাক্যে বললেন, আমরাও রামের সঙ্গে বনযাত্রা করব। যেস্থানে রাম বসবাস করবেন, সেই বন নগর হয়ে উঠবে আর এই নগর বনে রূপান্তরিত হবে।

শ্রীরামচন্দ্র দশরথ ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে সুমন্ত্রকে আহ্বান করে বললেন—সুমন্ত্রদেব, আমরা বনযাত্রার পূর্বে পিতামাতার দর্শন ভিক্ষা করি। আমরা দ্বারে উপস্থিত, আপনি মহারাজকে সংবাদ প্রেরণ করুন।

সুমন্ত্র নত মস্তকে রাজপুরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং রাজা দশরথের কক্ষ-সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাম-আগমনের বার্তা ঘোষণা করলেন।

দশরথ উত্তরদান করলেন—সুমন্ত্র, তুমি আমার সকল মহিষীকে সংবাদ দান কর তাঁদের এস্থানে উপস্থিত হতে বল। তাঁদের সকলের সম্মুখে আমি শ্রীরাম দর্শন করব।

সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন। কৈকেয়ী সেই কক্ষেই উপস্থি

* বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সুহৃদগণের অনুমতি লাভ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই সুহৃদগণের মধ্যে ঊর্মিলাও ছিলেন নিশ্চয়ই। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি ঊর্মিলা চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করবেন প্রতীয়মান হয় না।

ছিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রাদি তিনশত মহিষী সেস্থানে উপস্থিত হলেন। একমাত্র কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর সকলেই ক্রন্দনরতা।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাজা দশরথ বললেন—যাও সুমন্ত্র, শ্রীরামকে নিয়ে এস।

সুমন্ত্র রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। দশরথ বিস্মিত হয়ে বললেন—এ কি! সঙ্গে লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মীস্বরূপা বধূরাণী কেন?

শ্রীরাম নির্ভীক কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—ওঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন।

—কেন? আমি তো সে শপথ করিনি।

—আমরা স্বেচ্ছায় বনযাত্রা করছি—লক্ষণ সামান্য ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

শ্রীরাম শান্তকণ্ঠে বললেন—ওঁর বাক্যে আপনি ব্যথিত হবেন না। আপনি তো লক্ষ্মণের চরিত্র জ্ঞাত আছেন।

অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর শ্রীরাম পুনরায় বললেন—এখন আমাদের অনুমতি দান করুন, আমরা বনযাত্রা করি।

দশরথ আকুল ক্রন্দনে, ব্যর্থ রোষে, বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললেন—শ্রীরাম, তুমি আমাকে বন্দী কর, হত্যা কর। দুর্মতিকে বন্দী করায়, হত্যা করায় কোন পাপ নেই। আমাকে বন্দী করে তুমি রাজ্যগ্রহণ কর।

সন্ন্যাসীর নির্লোভ কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র শান্তচিত্তে বললেন—আমার এই বনযাত্রার প্রয়োজন ছিল। সমগ্র দেশকে সম্পূর্ণরূপে না জেনে রাজসিংহাসনে উপবেশন করা অসম্পূর্ণ অভিষেক। আপনি বর্তমানে নিশ্চিন্তমনে রাজত্ব করুন, আমি বনবাস সম্পূর্ণ করে পুনরায় রাজত্ব করব।

রামের কথায় সকলেই ক্রন্দন করে উঠলেন। কৈকেয়ী নির্বিকারকণ্ঠে বললেন—আর বিলম্ব কেন? চীর পরিধান করে ওরা বনবাসে যাত্রা করুক।

সুমন্ত্র ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন—রানী কৈকেয়ী। আমি দীর্ঘদিন রাজসেবা করেছি। আমি জ্ঞাত আছি আপনার পিতা আপনার মাতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি আপনার পিতার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিলেন। আপনি সেই ত্যাজ্য রানীর দুহিতা। আপনার মধ্যেও দুষ্টবুদ্ধি বর্তমান। আপনার অশুভ কর্মে মহারাজার মৃত্যু ঘটবে। আপনি এখনও দুর্মতি পরিহার করে রামকে তার নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দিন। আপনি মহারাজ দশরথের অনিষ্ট ডেকে আনবেন না।

কৈকেয়ী সুমন্ত্রের বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন হস্তে চীরবস্ত্র আনয়ন করে রাম-লক্ষ্মণকে দিয়ে বললেন—পরিধান কর।

রাম-লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে আদেশ পালন করলেন। সীতাদেবী জনসমক্ষে রাজবস্ত্র পরিত্যাগ করে, চীরধারণ করতে লজ্জাবোধ করছিলেন, তাই চীরহস্তে অধোবদনে সলজ্জভাবে দণ্ডায়মানা ছিলেন।

—কই ? তুমি পরিধান করছ না ? কৈকেয়ী প্রশ্ন করলেন। সীতা কোন উত্তরদান করলেন না। নীরবে দণ্ডায়মানা রইলেন।

—না। ঋষি বশিষ্ঠের কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠল—দুঃশীলা কৈকেয়ী, রাজাকে বঞ্চনা করে তোমার স্পর্ধা আকাশচুম্বী হয়েছে। সীতা বনে যাবেন না। সে বরপ্রার্থনা তুমি কর নি এবং রাজাও পূরণ করেন নি। রামের অবর্তমানে আমরা সীতাদেবীর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য পরিচালনা করব, অন্যথায় আমরাও ওঁদের সঙ্গে বনযাত্রা করব।

রানী কৈকেয়ী, তুমি তোমার পুত্রকে এখনও জান না। ভরত কখনও অনিচ্ছাদত্ত সিংহাসন গ্রহণ করবে না। সে কিভাবে সিংহাসন লাভ করেছে শ্রবণ করলে এই সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করবে। সেইজন্য আমি পরামর্শ দিচ্ছি, অযোধ্যার রাজসিংহাসন শূন্য করো না। এখনও সময় আছে। তুমি তোমার রবপ্রার্থনা প্রত্যাহার করে নাও।

শ্রীরামচন্দ্র ধীর কণ্ঠে বললেন—মহামতি বশিষ্ঠ। আপনি বংশের হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু আপনি যে বাক্য প্রয়োগ করছেন তাতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। আমার প্রতিজ্ঞা সমগ্র আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাবর্ত একত্রীকরণ করে এক অখণ্ড ভারতরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। সেই কারণে সমস্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রয়োজন। পিতা আমাকে যে আদেশ দান করেছেন, তা শাস্তি নয়, আশীর্বাদ। আমি আশা করি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর বাদানুবাদ হবে না।

শ্রীরাম অগ্রসর হয়ে লজ্জিতা সীতার কাছ হতে চীর গ্রহণ করে, সীতার রানী-বেশের উপরেই চীর পরিধান করিয়ে দিলেন। তারপর পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা, রানী কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাদিকে প্রণাম করে বিদায়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করে মহারাজ দশরথকে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ আমাদের বিদায় দান করুন। আমরা বনযাত্রা আরম্ভ করি।

দশরথ ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—জানকী চীর পরিধান করে বনগমন করবেন এ প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই। পাপীয়সী কৈকেয়ী, বৈদেহী তোমার কি অপরাধ করেছেন ? তিনি রাজবেশে স্বামীসঙ্গে বনগমন করবেন ! আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা অতিক্রম করলে তোমার নরকবাস হবে।

বনগমনোদ্যত রাম নতমস্তকে রাজা দশরথকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার বৃদ্ধা মাতা উদারহৃদয়া কৌশল্যা কখনও আপনার নিন্দা করেন নি। ইনি পূর্বে কখনও দুঃখ পান নি, বর্তমানে আমার বিরহে তিনি শোকসাগরে নিমজ্জিতা হবেন। এঁকে আপনি সসম্মানে যত্ন করে রাখবেন—এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা বিদায় গ্রহণ করছি।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কক্ষ থেকে নির্গত হয়ে গেলেন। সকলে প্রস্তরবৎ স্থাণুর মত দণ্ডায়মান রইলেন।

রথের ধূলি যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ দশরথ তাকিয়ে রইলেন, তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কৌশল্যা তাঁকে উঠিয়ে দক্ষিণ কর ধারণ করলেন, কৈকেয়ী বাম দিকে রইলেন। দশরথ প্রলাপের ন্যায় উক্তি করতে লাগলেন—কৈকেয়ী পাপীয়সী, আমার অঙ্গ তুমি স্পর্শ কর না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না। তুমি আমার ভার্যা নও, আত্মীয় নও, তোমার অনুজীবিরাও আমার কেউ নয়। আমি তোমাদের প্রত্যেককে পরিত্যাগ করলাম। ভরত যদি এই রাজ্য পেয়ে সুখী হয় তবে সে আমার প্রেতাত্মার উদ্দেশে যা দান করবে তা যেন আমার কাছে না পৌঁছায়।

দশরথ বিলাপ করতে করতে বললেন—যে সকল অশ্ব রামকে নিয়ে গেছে, তাদের পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রামকে দেখছি না। আমার যে পুত্র চন্দনচর্চিত শয্যায় শয়ন করত, সে আজ প্রস্তরে মস্তক রেখে শয়ন করবে।

কৌশল্যা রাজা দশরথকে বললেন—রামের উপর বিষ উদ্গীরণ করে কৈকেয়ী বর্তমানে নির্মোকমুক্ত সর্পীর ন্যায় বিচরণ করবে। রাম এখন সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে প্রবেশ করবে। বনের কষ্ট ওরা কিছুই জানে না। তুমি কৈকেয়ীর কথায় যাদের ত্যাগ করেছ, তাদের এখন কি অবস্থা হবে? কবে সেই দিন আসবে যখন রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে আবার এখানে দেখে আমার শোকের অবসান হবে?

সুমিত্রা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আর্যা, তোমার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ। সে পিতার সত্যরক্ষার্থে রাজ্যত্যাগ করে গেছে, তার জন্য শোক করছ কেন? সর্বভূতে দয়ালু লক্ষ্মণ তোমার পুত্রের সেবা করবে। সঙ্গে বধূ বৈদেহী আছে। দেখো, শ্রীরামের কোন কষ্টই হবে না। বরং শ্রীরামের মিষ্ট স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসবে।

শ্রীরামচন্দ্রের রথের পিছনে পিছনে অযোধ্যার অধিকাংশ নরনারী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। অযোধ্যা নগরী পার হয়ে যখন শ্রীরামের রথ তমসা নদীতীরে উপস্থিত হল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। শ্রীরাম সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন—আমরা এ স্থানেই রাত্রিবাস করব।

সুমন্ত্র রথের গতি রুদ্ধ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র চিন্তিতভাবে তাঁকে বললেন —প্রজাগণ যেভাবে আমার অনুসরণ করছেন, ভরত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অনতিকাল পরেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে।

—আমারও তাই আশঙ্কা।

—কিন্তু আমি চাই না অযোধ্যায় গৃহযুদ্ধ হোক। অযোধ্যার রাজ্য এমন এক

রাজ্য হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে, যার আদর্শ অনুকরণ করে, যুগ যুগ ধরে নৃপতিরা আপন কর্তব্য করে যাবেন এবং অযোধ্যার রাজধর্মকে আদর্শ বলে গ্রহণ করবেন। আমি এই ভারতে এক অখণ্ড রাজত্ব স্থাপন করব।

—কিন্তু কী প্রকারে এইসব প্রজাগণকে রাজ্যে প্রত্যাগমন করতে বলব বুঝতে পারছি না।

মৃদু হাস্যে শ্রীরাম উত্তর দিলেন– সে বুদ্ধি আগামীকল্য উষাকালে দেব। এখন বিশ্রামের আয়োজন করা হোক।

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র বৃক্ষতলে শ্রীরাম-সীতার তৃণশয্যার আয়োজন করলেন।

শ্রীরাম রথের উপর আরোহণ করে প্রজাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করলেন।

—বৎস প্রজাগণ, তোমরা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ কর, এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। তোমরা যদি আমাকে সত্যই ভালবাস, তাহলে তোমরা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর। একটা কথা মনে রেখ, আমাকে কেউ রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন নি। আমি স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করে বনবাস জীবন গ্রহণ করেছি। রাজ্যগ্রহণের পূর্বে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন একান্ত প্রয়োজন। সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ না করলে নিরপেক্ষভাবে এবং নির্বিকারভাবে রাজ্য পরিচালনা করা যায় না, সেইজন্য স্বেচ্ছায় আমার সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ। তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর। ভরতও অত্যন্ত ধার্মিক, শান্ত ও বীরবাহু। সে অনায়াসে শত্রুনিধন করতে পারবে এবং রাজ্য পরিচালনা করবে। তোমরা লক্ষ্য করবে, অতি অল্প কালের মধ্যেই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং তারপর বন হতে প্রত্যাগমন করে আমি সসম্মানে সিংহাসনে আরোহণ করব। তোমরা গৃহে ফিরে যাও। আর একটি কথা। জীবনে তোমরা একাধিক বিবাহ করবে না। স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রতিমা। জীবনে এক স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার কর। আমি সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি, কখনও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করব না। সীতা আমার প্রাণাধিকা, সীতাই আমার লক্ষ্মী প্রতিমা। আমার সীতা যেস্থানেই অধিষ্ঠিতা থাকবে, আমার জীবনলক্ষ্মীও সেই স্থানে অবস্থান করবেন। আমার মিনতি, তোমরা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে মনের সুখে সংসার কর। আমি বনবাস সম্পূর্ণ করে ফিরে এসে তোমাদের সুখী দেখতে চাই—

—না, না, আপনি যে রাজ্যে নাই, আমরাও সে রাজ্যে নাই। আমরা আপনাদের অনুসরণ করব।

সেই জনসমুদ্র গর্জনের মত উচ্চারণ করল। শ্রীরাম নিরুপায় হয়ে বললেন

—বেশ, তোমাদের যা অভিরুচি তাই কর, কিন্তু সাবধান, যেন কোনদিন গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি ক'র না।

—বাক্য দান করলাম, আমরা শান্তিতে বসবাস করব।

শ্রীরাম ক্ষণিক চিন্তা করলেন, তারপর রথ হতে অবতরণ করে সীতা-লক্ষ্মণ-সুমন্ত্র সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন—ফল-মূল আহার করে রাত্রিবাসের আয়োজন হোক। অদ্যই আমাদের বনবাসের প্রথম রজনী।

নীরবে সীতা সকলের আহারের ব্যবস্থা করলেন। নিঃশব্দে সকলে আহার করলেন, তারপর নীরবে শয্যাগ্রহণ করলেন।

রাত্রিশেষের পূর্বেই উষাগমনের প্রাক্কালেই শ্রীরামচন্দ্র শয্যাত্যাগ করে সীতা, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রকে আহ্বান করে বললেন—তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নাও। প্রজাগণ এখনও নিদ্রিত। ওদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমাদের স্থানত্যাগ করতে হবে, না হলে ওরা আমাদের পরিত্যাগ করবে না।

সুমন্ত্র মুহূর্তমধ্যে রথ প্রস্তুত করলেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করলেন। রথ প্রায় নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগল, পশ্চাতে পড়ে রইল সুপ্ত নাগরিকের দল। বহুদূরে যাবার পর রথ বাঁকের পথ ধরে বনের অন্যদিকে চলে গেল, শ্রীরাম পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন আর প্রজাগণকে চোখে পড়ছে না।

প্রজাগণ নিদ্রাভঙ্গে দেখল রাম-লক্ষ্মণ-সীতার রথ অন্তর্হিত! সুমন্ত্রও নেই। হাহাকার উঠল। তারা সকলে একই সঙ্গে কাঁদতে লাগল—আমরা পিতৃহারা হলাম, মাতৃহারা হলাম। হা রাম, কোথা-রাম!

অনেকক্ষণ বিলাপের পর কোন দিকে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যাত্রা করছেন তারা স্থির করতে পারল না। গভীর বনের মধ্যে কোথায় যাবে সঠিক ধারণা করতে না পারায় অনন্যোপায় হয়ে পুনরায় অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করল। সকলের মুখেই শোকের চিহ্ন, সকলের চোখেই অশ্রুধারা।

রামের রথ বহুদূরে অতিক্রম করে দেশান্তরে উপস্থিত হল। গ্রামের পথ ধরে যখন রথ অতিক্রম করছে গ্রামবাসীগণ পুলকিত হৃদয়ে রাম-সীতার দর্শন লাভ করছে এবং নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করছে—ধিক কামুক রাজা দশরথ। স্ত্রীর প্ররোচনায় এমন দেবতাপ্রতিম পুত্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। ধিক, তাঁকে শতাধিক।

গ্রাম হতে গ্রামান্তর অতিক্রম করে অবশেষে রথ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হল। এ স্থান অতি মনোরম, ঋষিগণের আশ্রম, দেবোদ্যান ও হ্রদ বিদ্যমান। সারস-ক্রৌঞ্চ নিনাদিত গঙ্গার তীরবর্তী শৃঙ্গবেরপুর মধ্যে প্রবেশ করে রাম বললেন—আমরা এ স্থানে আজ রাত্রিযাপন করব।

রথের গতি হ্রাস করলেন সুমন্ত্র। এক বৃক্ষতলে রথের গতি স্তব্ধ করলেন, তারপর রথ হতে অশ্বগুলি খুলে নিয়ে তাদের বিশ্রামের আয়োজন করলেন।

অদূরে ইঙ্গুদী বৃক্ষ। বৃক্ষতলে রাম-সীতার শয্যা প্রস্তুত করলেন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র। সুমন্ত্র বললেন—আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি অশ্বগুলির খাদ্যের সন্ধান করি।

রামের অনুমতি গ্রহণ করে সুমন্ত্র বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দিগন্তে রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ অবতরণ করছে। একটু পরেই সমস্ত বনভূমি অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে গেল।

সুমন্ত্র অশ্বগুলিকে এনে এক বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে বাঁধলেন। তিনি রামকে বিমর্ষভাবে বললেন—অশ্বের আহার্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। আজ রাত্রে ওরা অনাহারেই থাকবে। সুমন্ত্রের বাক্য শেষ হতে না হতে সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলেন দূর থেকে বহু আলোকবর্তিকা ওদের প্রতি এগিয়ে আসছে।

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ ভীত হয়ে ধনুর্বাণ প্রস্তুত করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীরাম নির্দেশ দিলেন—পূর্বে কিন্তু তোমরা কেউ শরক্ষেপণ করবে না। ওরা শত্রু নাও হতে পারে।

অল্পক্ষণ পরে আলোকবর্তিকাগুলি আরও নিকটবর্তী হল। পরস্পরের কথাবার্তা শ্রবণ-সীমার মধ্যে গোচরীভূত হল।

শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর অথচ ধীরকন্ঠে প্রশ্ন করলেন—বন্ধুগণ, তোমাদের পরিচয় জ্ঞাপন কর।

অপর পক্ষ থেকে হর্ষমুখর কণ্ঠে উত্তর ভেসে এল—বন্ধুবর শ্রীরামচন্দ্র, আমি শৃঙ্গদেবপুর নিষাদরাজ গুহক। তোমার আগমন বার্তা শ্রবণ করে সাক্ষাৎ প্রয়াসে এসেছি। আমাদের ব্যর্থ করো না এই আমার অভিলাষ।

শ্রীরামচন্দ্র সহর্ষে বললেন সুস্বাগতম বন্ধুবর। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রদেব, তোমাদের ধনুর্বাণ প্রত্যাহার কর।

অল্পক্ষণ পরেই নিষাদরাজ গুহক তাঁর অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গ সহকারে সম্মুখে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামচন্দ্র অগ্রসর হয়ে গুহককে আলিংগন করে হর্ষমুখরিত কণ্ঠে বললেন—এসো প্রিয়সখা। আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর।

আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় নিষাদরাজ গুহক বললেন—বন্ধুবর, তুমি কেবল আদেশ দান কর। তোমার জন্য কি করব বল?

শ্রীরামচন্দ্র সহর্ষে উচ্চারণ করলেন—তুমি শক্তিশালী রাজা হওয়া সত্ত্বেও পদব্রজে আত্মীয়স্বজন সহকারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, এতেই আমি ধন্য।

নিষাদরাজ গাঢ় ভক্তিপূর্ণকণ্ঠে উত্তর দিলেন—ভ্রাতৃপ্রতিম প্রিয় বন্ধু, তোমরা উচ্চবর্ণের, আমাদের ন্যায় নিম্নবর্ণের মানুষদের তোমরা ঘৃণা কর, অবহেলা কর, কিন্তু তুমি তার ব্যতিক্রম। সেইজন্যে আমার ইচ্ছা, তুমি আমার রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ কর। অযোধ্যা হস্তান্তরিত হয়েছে, তাতে তোমার কি এসে যায়? আমার এই বিরাট রাজ্য তুমি ভোগ কর। প্রয়োজন হলে তুমি আমার সৈন্যবর্গ নিয়ে অযোধ্যা আক্রমণ কর। আমি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে দিনাতিপাত করব।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্য করলেন। দক্ষিণ হস্ত গুহকের মস্তকে অর্পণ করে

বললেন—তোমার উদারচিত্তের কথা কে না জানে ? আমার বর্তমানে রাজ্যলাভের অভিলাষ নাই, তা যদি থাকত, আমি মুহূর্তমধ্যে পিতাকে বন্দী করে অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করতে পারতাম। আমি অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েছি। প্রথম কারণ, সর্বজাতি সমন্বয়ে আমি এক অখন্ড ভারতরাজ্য সৃষ্টি করব, দ্বিতীয় কারণ, সন্ন্যাস জীবন যাপন করে রাজসিক বিলাস ব্যসনের প্রতি লোভ মোহ আসক্তি দূর করব। আমি প্রকৃতই এক জনপ্রতিনিধি রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকব ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

নিষাদরাজ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—বন্ধুবর, আমরা তোমাদের জন্য প্রচুর ভোজ্যবস্তু এনেছি। লেহ্য, পেয়, চব্য, চূষ্য সমগ্র খাদ্য ভান্ডারই আমাদের সঙ্গে বর্তমান। তুমি গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর।

নির্বিকার অথচ সুমিষ্টকণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিলেন—আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রা যাপন করছি। ও সব খাদ্য ভান্ডারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমার প্রজাগণকে এই খাদ্য বিতরণ করলেই আমার গ্রহণ করা হবে। তুমি কেবল আমার একটি উপকার কর।

—আদেশ কর—

—আমার রথের অশ্বেরা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। ওদের আহারের এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করলেই আমি ধন্য হব।

তৎক্ষণাৎ নিষাদরাজ গুহকের আদেশে শ্রীরামের রথাশ্বদের আহার্য পানীয় সরবরাহের আয়োজন করা হল।

নৈশ আহার গ্রহণ করে শ্রীরাম-সীতা বৃক্ষতলে ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করলেন। গুহক লক্ষ্মণকে বললেন—তুমি আহার্য গ্রহণ করে উত্তম শয্যায় শয়ন কর। তোমাকে তো রাজা দশরথ বনে প্রেরণ করেন নি, তুমি কেন রাজসুখ গ্রহণ করবে না ?

লক্ষ্মণ সহাস্যে বললেন—পিতৃপ্রতিম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং মাতৃপ্রতিমা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ যেস্থানে ভূমিতলে শায়িতা সেস্থানে আমি কি প্রকারে সুখশয্যায় শয়ন করি ? আমি ওঁদের পদতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করব। আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা গ্রহণ করুন। আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

—বেশ, তোমরা শয্যা গ্রহণ কর, আমরা তোমাদের সারারাত পাহারা দেব।

নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে কথাবার্তা সাঙ্গ করে লক্ষ্মণ আহারাদি সম্পন্ন করে শয্যা গ্রহণ করলেন। নিষাদরাজ সুমন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে রক্ষা করতে লাগলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র গুহককে বললেন—এবার আমরা গঙ্গা পার হব। আমাদের জন্য একটি নৌকার ব্যবস্থা করে দাও।

গুহকের আদেশে অনতিবিলম্বে একটি উত্তম নৌকা সংগ্রহ করা হল।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—পরপার থেকে আমাদের বনযাত্রার শুভারম্ভ। আমাদের কেশরাশিতে জট ধারণ করতে হবে, সেই জন্যে কিছু বটের আঠা প্রয়োজন।

নিষাদরাজের আদেশে প্রতিহারীগণ বটের আঠা সংগ্রহের জন্য যাত্রা করল।

সুমন্ত্র বিষাদভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—আমার প্রতি কি আদেশ?

—তোমার কর্তব্য শেষ। তুমি শীঘ্র পিতার নিকট প্রত্যাগমন কর। তোমার থেকে পিতার আর কোন প্রিয় সুহৃদ নাই।

—রামহীন পুরীতে প্রত্যাগমন করার ইচ্ছা আমার নাই। আমি এই রথ সহকারে তোমার সঙ্গে বনে গমন করি, পুনরায় এই অশ্বরথেই তোমাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

—না। তুমি প্রত্যাগমন না করলে যবীয়সী মাতা কৈকেয়ীর প্রত্যয় হবে না আমাদের বনবাস হয়েছে। সেইজন্যে যত শীঘ্র পার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর। আমি চাই অযোধ্যা ভরত-শাসিত রাজ্য হোক। তুমি পিতাকে যত্ন করবে। ভরতের প্রতি অনুগত থাকবে আর আমার মাতাগণকে সশ্রদ্ধ চিত্তে যত্ন করবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক, আমি চতুর্দশবর্ষ পরে বনবাস সম্পন্ন করে পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করব।

সুমন্ত্র নতমস্তকে দণ্ডায়মান রইলেন।

নিষাদরাজ গুহকের নির্দেশে বটের আঠা সংগৃহীত হল অতি অল্পকালের মধ্যেই। শ্রীরামচন্দ্রের মেঘনিন্দিত-স্কন্ধোপর-লাঞ্ছিত কেশরাশিতে আঠা মিশ্রিত করে দিলেন নিষাদরাজের অমাত্য এবং সহচরবৃন্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের মুখসৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ ধারণ করল। ইক্ষ্বাকুকুলধ্বজ-দশরথতনয় দেববিনিন্দিত কান্তিধারী শ্রীরামচন্দ্র অচিরাৎ রূপ ধরলেন সর্বত্যাগী জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর।

লক্ষ্মণের জটা প্রস্তুত হবার পর শ্রীরামচন্দ্র বললেন—এবার আমাদের বিদায় দাও বন্ধু। বনবাস যাত্রাকালে একটি অনুরোধ করি। অকারণে কোন রাজ্য আক্রমণ করবে না। অত্যধিক লোভগ্রস্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করবে না। আপন রাজ্য অত্যন্ত শান্তিতে এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে রক্ষা করবে। তুমি প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করবে, তারা যেন তোমাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে।

নিষাদরাজের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র উপদেশ দান করলেন। তারপর বললেন—বিদায় বন্ধু। বিদায় সুমন্ত্র।

সকলের চক্ষু-পল্লব অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

দশ

গঙ্গার অপরপারে তরণী হতে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীরাম বললেন—লক্ষ্মণ, এবার আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করব। প্রথমে তুমি ধনুর্বাণ হস্তে অগ্রসর হবে, মধ্যে সীতা, সর্ব পশ্চাতে আমি তোমাদের দুজনকে রক্ষা করে অগ্রসর হব।

বনপথ ধরে অগ্রসর হতে একসময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল! শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বললেন—আজ প্রথম আমরা জনপদের বাইরে গভীর অরণ্যে রাত্রিযাপন করবো। সাবধানে রাত্রিযাপন করতে হবে। হিংস্র শ্বাপদ যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে, অতএব খুব সাবধানে রাত্রিযাপন করতে হবে।

লক্ষ্মণ শ্রীরাম-সীতার শয্যা প্রস্তুত করে বললেন—কোন চিন্তা নেই। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ কেউ আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

বনের মধ্য থেকে যে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন দুই ভ্রাতা, সীতা সেই খাদ্য তিন ভাগ করে, প্রথমে দুই ভ্রাতাকে দান করলেন, তারপর আপন ভাগ ভক্ষণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনজনে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সারাদিনের পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত ছিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

পরদিন প্রভাতে নদীতীরে পৌঁছে শ্রীরাম দূরে জলঘর্ষণের শব্দ এবং ধূম্র লক্ষ্য করলেন। শ্রীরাম বললেন—ওই জলশব্দ বোধহয় গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল আর ধূম্ররাশি বোধহয় কোন ঋষির আশ্রম হতে নির্গত হচ্ছে। চল, আমরা ওই দিকে যাত্রা করি।

তিনজনে নদীতীর ধরে অগ্রসর হলেন।

পদব্রজে বহুদূর পথ অতিক্রান্ত হয়ে অবশেষে তাঁরা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হলেন। সম্মুখে এক পবিত্র তপোবন। তপোবনের মধ্যস্থলে অতি সুন্দর এক ঋষি-আশ্রম। গুরু এক প্রবীণ ঋষি। শিষ্যঋষিগণকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা দান করছেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দান করলেন।

ঋষি তাঁর আসন থেকে নেমে এসে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। শ্রীরামের মস্তকে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হস্ত প্রসারিত করে ঋষি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—আমি ঋষি ভরদ্বাজ। তোমাদের বনযাত্রার কথা এবং কারণ আমি শুনেছি। তোমরা আমার আশ্রমে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পার।

শ্রীরাম প্রণাম করে বললেন—আপনার আশ্রমবেষ্টিত তপোবন জনপদবহুল। আমি জনহীন অরণ্যে বাস করার প্রয়াসী। আপনি আমাকে সেই পথের নির্দেশ দান করুন।

— বেশ, যথাকালে নির্দেশ দান করব। এখন বিশ্রাম কর। কিছু ফলাহার ভক্ষণ কর—

—আপনি যা আদেশ করবেন, তাই কবব—শ্রীরাম ঋষি ভরদ্বাজকে প্রণাম করে বললেন। রামের পর সীতা এবং লক্ষ্মণ ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করলেন ঋষির শিষ্যেরা রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেদিনের মত পাঠাভ্যাস স্থগিত রইল।

পরদিন প্রভাতে ভরদ্বাজ মুনি-নির্দিষ্ট পথে, যাত্রা করলেন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ। যমুনার তীরবর্তী পথ ধরে তিনজনে চলেছেন চিত্রকূট পর্বতের সন্ধানে। সম্মুখে লক্ষ্মণ মধ্যে সীতা পশ্চাতে শ্রীরাম।

একস্থানে উপস্থিত হয়ে ওঁরা দেখলেন খেয়া পারাপারের ঘাট বর্তমান। একটি নৌকার সাহায্যে তিনজন যমুনা নদী পার হয়ে অন্য পারে উপস্থিত হলেন এবং ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশ অনুযাযী যমুনার পশ্চিমে স্রোতের বিপরীত দিকে পদব্রজে যাত্রা করলেন।

পথের দুপাশে অদৃষ্টপূর্ব পাদপ, পুষ্পিত লতাগুল্ম দেখে সীতার হৃদয় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। সীতার আদেশে লক্ষ্মণ অনেক পুষ্প সংগ্রহ করে সীতাকে প্রদান করলেন।

একসময়ে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হল। দুই ভ্রাতা আহার্য বস্তু হিসাবে কয়েকটি মৃগ বধ করে আনলেন। সীতা রন্ধন করলেন। তিনজনে অতঃপর ভোজন করে সেস্থানেই নিশিযাপন করলেন।

প্রভাতকালে যমুনার পবিত্র জল স্পর্শ করে, চিত্রকূট পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। একসময়ে তাঁরা বাল্মিকীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। বাল্মিকী হর্ষিত হয়ে দশরথ তনয়দ্বয় এবং পুত্রবধূকে পরম যত্নে আপ্যায়িত করলেন।

বিশ্রামের পর প্রণামান্তে পনুরায় তিনজনে চিত্রকূটে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি নির্ধারণ করে, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন—আমাদের এস্থানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে, সেইজন্যে পর্ণশালা নির্মাণের উত্তম দৃঢ় কাষ্ঠ সংগ্রহ কর।

সীতা বিস্মিতা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজপুত্র, আপনি পর্ণশালা নির্মাণ করতে পারবেন ?

মৃদু হাস্যে রাম উত্তরদান করলেন—আদর্শ নৃপতির সবকার্যনিপুণ হওয়া

প্রয়োজন। প্রজাগণ, ঋষিগণ, কী ভাবে পর্ণশালা নির্মাণ করেন, সে শিক্ষা যদি গ্রহণ না করি, তাহলে তাঁদের বিপদের দিনে আমি তাঁদের পাশে সাহায্যের জন্য দাঁড়াব কি অভিজ্ঞতায় ?

স্বামীর কথায় স্ত্রী অভিভূতা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মণ দৃঢ় কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে মিলিত হয়ে এক পর্ণশালা নির্মাণ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—আমাদের এ স্থানে অধিককাল বাস করতে হবে, সেইজন্যে গৃহপ্রবেশের মঙ্গল পূজা আবশ্যক। তোমরা পূজাসামগ্রীর আয়োজন কর, আমি পূজা সম্পাদন করে গৃহপ্রবেশ করব।

পবিত্রভাবে পূজা সম্পাদনের পর তিনজনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং চিত্রকূট পর্বতাঞ্চলের সেই পর্ণশালায় দিনযাপন করতে লাগলেন।

নিষাদরাজ গুহকের কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করে সুমন্ত্র অযোধ্যার পথে প্রত্যাগমন করলেন।

শূন্য রথে সুমন্ত্রকে প্রত্যাগমন করতে দেখে অযোধ্যার জনকুলের শোকানল পুনর্বার প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তারা রাজপথের দুপাশে অলিন্দের উপরে গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে রামের জন্য বিলাপ করতে লাগলেন।

সুমন্ত্র নত মস্তকে ক্লান্ত শরীরে রথ চালনা করে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং রথ হতে অবতরণ করে ধীর পদক্ষেপে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। রাজা দশরথ সমীপে উপস্থিত হতে দশরথ কাতরভাবে সুমন্ত্রকে রামের সংবাদ প্রশ্ন করলেন।

সুমন্ত্র নত মস্তকে ধীরভাবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন এবং তিনি ও নিষাদরাজ গুহক যেস্থান হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন সেই পর্যন্ত বললেন। তারপর রাম-সীতা-লক্ষ্মণ গহন বনে প্রবেশ করলেন, ওঁরাও প্রত্যাগমন করলেন।

দশরথ হাহাকার করে উঠলেন। সীতা বধূমাতা জনকরাজার গৃহে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে লালিত-পালিত হয়েছেন, তিনি কী ভাবে, বনের কষ্ট সহ্য করবেন। আমি, পাপীয়সী কৈকেয়ীকে লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠাবার নির্দেশ দান করিনি। তাঁরা কেন বনে গেলেন ?

সুমন্ত্র সান্ত্বনা বাক্যে মহারাজকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। সীতাদেবী নানা পুষ্প, ফল ও মৃগশাবক পরিদর্শন করে পরমানন্দে আছেন। রাম-লক্ষ্মণ নিয়ত তাঁকে রক্ষা করছেন। ওঁরা অনায়াসে চতুর্দশ বৎসর বনবাস যাপন করে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে সিংহাসনে

উপবিষ্ট হবেন। তাঁরা পরম আনন্দে আছেন। তাঁদের জন্য আপনারা শোক করবেন না।

শোকের তুল্য শত্রু আর নাই। যিনি শোক বশ করতে পারেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও দশরথ তিনজনেই সুমন্ত্রের বাক্যে কিছুমাত্র প্রবোধ লাভ করলেন না বরং আরও শোকাকুল হয়ে পড়লেন।

দশরথ বললেন—রামবিহনে আমি প্রাণ বিসর্জন দেব। কৌশল্যা ও সুমিত্রা সান্ত্বনা বাক্যে বললেন—মহারাজ আমাদের হৃদয়ও শোকে উন্মত্ততায়। প্রাসাদের এক কোণে বধূমাতা ঊর্মিলা নিঃশব্দে ক্রন্দন করছেন আর সন্ন্যাসিনীর জীবন অতিবাহিত করছেন। তাঁর কথা কেউ স্মরণে আনছে না। কিন্তু আপনি যদি প্রাণ বিসর্জন করেন, তাহলে আমাদের কি হবে? কৈকেয়ী রাজমাতা হবেন, কৈকেয়ী-নন্দন আমাদের প্রতি অনাদর, অবহেলাজনিত ব্যবহার করবেন। আমাদের রক্ষার জন্যও আপনার জীবনধারণ একান্ত কর্তব্য।

দশরথ মৃদু হাস্য করলেন। সে হাসি অপরাহ্ণ সূর্যকিরণের মতই ম্লান তিনি একপাশে সুমিত্রাকে উপবেশন করিয়ে সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন—তুমি বিশ্রাম কর। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি আর ওই সিংহাসনে আরোহণ করব না। লক্ষ্য রেখ, যেন নিরাপদে রাজত্ব পরিচালিত হয়।

সুমন্ত্র অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

সুমন্ত্রের প্রস্থানান্তে দশরথ দুই রানীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—জানে পরকাল বলে কোন কাল বর্তমান আছে বলে আমার ধারণা নেই, কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস ইহকালেই সর্বকালের কর্তব্যচিহ্ন ও কর্তব্যফল প্রকাশিত। যে যেমন কর্ম করে, একই জীবনে সে তার ফল পায়। বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকালের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে মহাকালের ত্রিকাল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

মহারাজার উক্তির যথার্থতা অনুভূত না হওয়ায় রানীদ্বয় নিঃশব্দে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। দশরথ আত্মগতভাবে বললেন—কৈকেয়ী উপলক্ষ্য মাত্র পুত্রশোকে আমার মৃত্যু অবধারিত।

রানীদ্বয় তখনও নিশ্চুপ।

দশরথ তাঁর কথা বন্ধ না করে, একইভাবে বলতে লাগলেন—বাল্যে যেসব কর্ম আমরা করি, যৌবনের তাড়নায় তা বিস্মৃত হই। যৌবনের তাড়নায় যেসব কার্য সম্পাদন করি, অধিকাংশই অবশ্য অপকর্ম, প্রৌঢ়ত্বে অথবা বার্ধক্যে সেসব কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মরিত হই। যথাসময়ে কেবল সেই কথা স্মরণে আসে।

কৌশল্যা ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে মহারাজ? আমাদের নিকট ব্যক্ত করুন। আমরা সর্বান্তঃকরণে জ্ঞাত আছি, মহারাজ দশরথ কখনও কোন

পাপকর্ম করতে পারেন না, তিনি সত্যের অবতার। সত্যপাশবন্ধ ছিলেন বলেই আপনি কৈকেয়ীর অনুরোধে অনায়াসে শ্রীরামের ন্যায় নির্দোষ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করেছেন। যিনি এতখানি সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন, তিনি কি এমন কুকর্ম করেছেন, যাঁর জন্য অনুশোচনা করছেন এবং মৃত্যুকামনা করছেন।

দশরথ ক্ষণিক নীরব।

অল্পক্ষণ পরে ধীরকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন—আমি তখন কুমার। কৌশল্যার সঙ্গেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই নি। আমার আনন্দ ছিল মৃগয়ায়। প্রত্যেক রাজপুত্রেরই মৃগয়ায় আনন্দ থাকে এবং আগ্রহ থাকে। তাতে কোন দোষ নাই। আমার শরনিক্ষেপ ছিল অভ্রান্ত এবং আমি শব্দ শ্রবণে শরক্ষেপণ করতে পারতাম। আমার অসাধারণ গুণ ছিল, শব্দ শুনে আমি লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম, সেজন্য আমাকে শব্দভেদী বলত সকলে। আমারও প্রবল ইচ্ছে হত শব্দ লক্ষ্য করে শরনিক্ষেপ করি। একদিন সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃগয়া করতে বেরোলাম। রাত্রির গভীর অন্ধকারে আমি শব্দের অপেক্ষায় বিচরণ করতে লাগলাম। কোথাও কোন শব্দ নাই। অকস্মাৎ অদূরে শ্রবণ করলাম এক মৃগশাবক জলপান করছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলাম আর আমার অন্তরাত্মাকে শিহরিত করে এক মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল।

আলোকবর্তিকা হস্তে দ্রুতপায়ে গেলাম সেই জলাশয়ের তীরে।

এক ঋষিকুমার তীরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে।

আমার শর তার বুকের মধ্যস্থলে বিদ্ধ। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে বলল—রাজকুমার, আমি কি অপরাধ করেছি? আপনি আমায় বধ করলেন?

আমি নিরুত্তর, আমি নিশ্চুপ। প্রস্তরীভূত হয়ে পড়েছি যেন। মুনিপুত্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলল, অদূরেই আমাদের আশ্রম। সেস্থানে আমার অন্ধ মাতাপিতা আছেন। তাঁরা তৃষ্ণার্ত। আমিই তাঁদের যষ্টি স্বরূপ, আমি তাঁদের জন্য এই কলসে জল পূর্ণ করে নিতে এসেছিলাম। আমি জল সংগৃহীত করে নিয়ে গেলে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারিত হবে। রাজকুমার শীঘ্র আমাকে পিতার সমীপে নিয়ে চলুন। আমার মৃত্যু আসন্ন। আমি আপনাকে কোন অভিশাপ দেব না, কেবল মৃত্যুর পূর্বে মাতাপিতাকে দর্শন করতে চাই।

—আমি পারিনি কৌশল্যা, আমি ব্যর্থ হয়েছি সুমিত্রা। আমার ক্রোড়েই মুনিপুত্রের মৃত্যু হল। আমি মৃত ঋষিকুমার ও জলপূর্ণ কলস নিয়ে অন্ধমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলাম।

অন্ধমুনি এবং তাঁর পত্নী অধীর আগ্রহে বললেন—এসেছিস বাবা, আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত। আমাদের জলপান করা।

আমি নীরব।

অন্ধমুনি আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে? কথা বলছিস না কেন?

আমি তখন ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলাম—আমি ইক্ষাকুবংশ-জাত রাজকুমার দশরথ। আমি শব্দভেদী বাণ প্রয়োগের অধিকারী। আপনার পুত্র অন্ধকারে জলাশয় হতে জলকুম্ভ পূর্ণ করছিল, আমি সেই শব্দকে মৃগের জলপানের শব্দভ্রমে শরক্ষেপণ করি। সেই শরে তার মৃত্যু ঘটেছে। তার মৃতদেহ এবং জলপূর্ণ কলস আপনাদের সম্মুখে। আমি সমস্ত ঘটনাই বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করলাম। এক্ষণে আপনার যে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে দান করুন, আমি অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করব।

অন্ধমুনি পুত্রশোকে হাহাকার করতে লাগলেন। আমি নিঃশব্দে সেস্থানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ হাহাকারের পর অন্ধমুনির শোকভার কিছু লাঘব হতে তিনি বললেন—দশরথ বিনাদোষে খেলার ছলে তুমি আমার পুত্রকে হত্যা করেছ।

—আমি অস্বীকার করিনি।

ওই আমার অন্ধের যষ্টি। ওই আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করত। তার অভাবে আমরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করব।

আমি নীরব।

অন্ধমুনি পুনরায় বললেন—তবু তুমি সর্বান্তঃকরণে অপরাধ স্বীকার করেছ, তাই তোমাকে গুরুতর অভিশাপ দেব না। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আমি যেরূপ পুত্রশোকে মৃত্যুবরণ করতে চলেছি, তুমিও তেমনি পুত্রশোকে মৃত্যুবরণ করবে।

দশরথ নীরব। কৌশল্যা সুমিত্রাও নীরব। অনেকক্ষণ পরে দশরথ কাতরকণ্ঠে বললেন—তারপর আমার বিবাহ হল। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলাম। দীর্ঘ দিন আমার কোন সন্তান হয়নি, সেদিন ভেবেছি মুনির কথা কি মিথ্যা হবে? আমি যদি অপুত্রক থাকি, তাহলে আমার পুত্রশোকে মৃত্যু ঘটবে কি প্রকারে? আমি সেদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছি ঈশ্বর আমার যেন পুত্রশোকে মৃত্যু হয়। আমার পুত্র হোক। বংশরক্ষা হোক। আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্র যেন মুখাগ্নি করে। পুত্রের হাতের অগ্নি গ্রহণ করে মৃত্যু ঘটলেও আমার পরম শান্তি।

অবশেষে রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের জন্ম। আমি সেদিন বুঝতে পারিনি অভিশাপ আশীর্বাদের রূপ নিয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত। আজ বুঝতে পারছি, পুত্রশোকে আমার মৃত্যু আসন্ন। সেই অভিশাপ এতদিনে ফলবতী হতে চলেছে। তোমরা অনর্থক আমার জীবনের আশা করছ, আমি অচিরে প্রাণত্যাগ করব।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা হাহাকার করে উঠলেন। রাজা দশরথ বিলাপ করতে করতে রাত্রির দ্বিতীয় যামে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলেন।

এগার

মৃত্যুসংবাদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠ এবং সুমন্ত্র সকলকে আহ্বান করে
লেন—রাজার মৃত্যুসংবাদ এখনই প্রচার করবে না। রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।
ার মৃতদেহ তৈলাধারে রক্ষিত করে, দ্রুতগামী অশ্বে ভরতকে আনয়নের ব্যবস্থা
। ভরত অযোধ্যায় এসে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, সিংহাসনে আসীন
ক। কোন প্রজা যেন ঘুণাক্ষরেও অবগত না হয় যে অযোধ্যার সিংহাসন শূন্য
আছে।

দ্রুতগামী অশ্বে দূত প্রেরণ করলেন সুমন্ত্র। সুমন্ত্র দূতকে সাবধান করে বলে
লন—ভরত যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে, রাম বনবাসে যাত্রা করেছেন এবং
া দশরথের মৃত্যু ঘটেছে।

দূতগণ বিদ্যুৎবেগে রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কেকয়রাজ, যুধাজিৎ, ভরত ও শত্রুঘ্ন দূতগণকে দেখে বিস্মিত হলেন। প্রধান
বললেন—মহারাজ দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখতে চেয়েছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের মতই কান্তিমান ভরত এ সংবাদে কোন প্রকার হর্ষ প্রকাশ
লন না। বিষণ্ণ বদনে উত্তরদান করলেন—মাতামহ! এই দূতেরা আমাকে
া সংবাদ দানে প্রবোধ দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে অযোধ্যার সমূহ বিপদ
স্থিত।

—প্রাণাধিক! মনে কেন এই সন্দেহ? কেকয়রাজ প্রাণসম প্রিয় দৌহিত্রকে
করলেন।

—আমি রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন অবলোকন করেছি। মহারাজ দশরথ এক সুউচ্চ
ত হতে গভীর তৈলাশয়ে পতিত হয়েছেন। পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে
ধ্যার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় অযোধ্যায় ঘোর বিপদ
স্থত।

—সেজন্যে তোমাকে অচিরাৎ তোমার রাজ্যে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। যুধাজিৎ,
বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্তে রথে অশ্ব যোজনা কর। মহামূল্য
রসমূহ কল্যাণবরেষুদ্বয়ের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। দূতগণ, তোমরা
ম কর। অবিলম্বে রাজপুত্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবেন।

আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। আমরা এই মুহূর্তে রাজপুত্রদ্বয়কে সঙ্গে
যাত্রা করতে অভিলাষী। আমাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

কেকয়রাজ বাক্যালাপে সময়ের অপচয় ঘটালেন না। তিনি আপন তত্ত্বাবধা ভরত ও শত্রুঘ্নের যাত্রার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করে, দূতগণের সঙ্গে যাত্রার করিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সমস্ত নগর স্থির ও নিস্তব্ধ। নগরীর বুকের ওপর এক শীতল নিস্তব্ধতার আচ্ছাদন ভরত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সমস্ত গৃহের বাতায়ন-দ্বার রুদ্ধ। নাগরিক গণ নির্বাক। বিপণিসমষ্টি বন্ধ। তোরণ-দ্বারগুলি ছিন্ন-ভিন্ন। সমস্ত নগর যেন এক শোকসাগরে নিমজ্জিত।

ভরত রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়ে প্রথমেই গমন করলেন পিতৃসমীপে। রাজা দশরথের দর্শন কোথাও না পেয়ে, মাতা কৈকেয়ীর নিকট তিনি গমন করলেন

রানী কৈকেয়ী পুত্রকে দর্শন করে হৃষ্টচিত্তে তাকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক তার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

ভরত মাতাকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলেন মাতা, পিতার পর্যঙ্ক শূন্য কেন: তিনি কি মাতা কৌশল্যার নিকট? পূর্বে তাঁর চরণ বন্দনা করে তারপর পিতৃপ্রতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণবন্দনা করে আমি, আপনার নিকট আসছি।

—আমার নিকট কিছুক্ষণ বস বৎস—কৈকেয়ী বললেন।

—আচ্ছা মাতা, আমাকে এত ত্বরান্বিত করে অযোধ্যায় নিয়ে আসা হল কেন

—শোন বৎস। ধীরভাবে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ কর। যা কিছু করা হয়েছে তোমার মঙ্গলের জন্যে। আমি তোমার গর্ভধারিণী, তা করেছি।

ভরতের অন্তরাত্মা শিহরিত। শঙ্কিত দৃষ্টিতে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন

কৈকেয়ী ভরতের প্রতি দৃকপাত না করে, আপন মনে উৎফুল্লতার সঙ্গে বলতে লাগলেন—তোমার পিতার নিকট আমার দুটি বর প্রাপ্য ছিল। আমি সেই বরদ্বয় গ্রহণ করেছি। তোমার পিতা সত্যপাশে বদ্ধ ছিলেন। সেই দুটি বর প্রার্থনা মাত্রই আমাকে দান করেছেন।

কম্পিত হৃদয়ে ভরত প্রশ্ন করলেন—কী বরদ্বয়?

—প্রথম বরে আমি রামের পরিবর্তে তোমাকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠি করেছি। দ্বিতীয় বরে, আমি রামকে চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনবাসে প্রেরণ ক তোমার রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করেছি। এখন তুমি সুখে নির্বিবাদে রাজ্যসুখ ভোগ কর

ভরত প্রস্তরবৎ নিশ্চল নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করলেন

—পিতা কোথায়?

—জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমার পিতা ইহলোক ত্যাগ ক সেই অমরধামে প্রয়াণ করেছেন। তুমি শোক ত্যাগ কর। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রি সম্পন্ন করে রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ভরত অনেকক্ষণ জননীর প্রতি পলকহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইলেন, রপর একসময় সখেদে উচ্চারণ করলেন—তুমি আমার জন্মদাত্রী, গর্ভধারিণী—মাকে কি বলব ? ধিক তোমাকে। ধিক আমাকে—

ভরত জ্যা-নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় কক্ষ হতে নির্গত হয়ে রাজসভায় এলেন। শষ্ঠ ও সুমন্ত্রকে প্রণামপূর্বক রোদন করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ নির্বিকার কণ্ঠে লেন—ভরত, এখন রোদনের সময় নয়। রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে আছে। জাগণ এখনও জানে না রাজার মৃত্যু ঘটেছে। অবিলম্বে তুমি পিতার অন্ত্যেষ্টি-য়া সম্পন্ন করে, রাজ সিংহাসনে উপবেশন কর। আমি রাজার মৃত্যু ষণা করি।

—কিন্তু এ রাজ্য আমি গ্রহণ করব না।

—কেন ? পিতার আদেশে যেরূপ শ্রীরাম বনে গমন করেছেন. পিতার দেশেই সেইরূপে তুমি রাজসিংহাসন গ্রহণ করবে। ওঠ, এখন শোকের সময় , কর্তব্যের সময়। অবিলম্বে সমস্ত কার্য সমাধা করতে না পারলে সেন্যবর্গ দ্রোহী হয়ে উঠবে এবং সমগ্র দেশে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

ভরত অশ্রুমোচন করে কর্তব্যকর্মে রত হলেন। ঋষি বশিষ্ঠের আদেশে ন্ত্র এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ তৈলাধার হতে রাজা দশরথের মৃতদেহ স্বর্ণনির্মিত ঙ্কে শায়িত করে চন্দন-পুষ্প-ধূপ সুগন্ধিতে পূর্ণ করে রাজসভার কক্ষমধ্যে আনয়ন লেন।

ঋষি বশিষ্ঠ সর্বসাধারণের নিকট ঘোষণা করলেন, রাজা দশরথ দেহত্যাগ রছেন এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সরযূ নদীতীরে সম্পন্ন হবে।

রাজপুরী হতে শোকযাত্রা নির্গত হল। অশ্ববাহিত রথে দশরথের পুষ্পসজ্জিত দেহ। পশ্চাতের রথে ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ এবং সুমন্ত্র। তাঁদের পশ্চাতে ন্যবর্গ এবং অমাত্যগণ। সর্বপশ্চাতে স্রোতের ন্যায় নরনারী।

মখাগ্নির পর একসময়ে দাহকার্য সমাপ্ত হল। ভরত ও শত্রুঘ্ন চিতাগ্নিতে যূ নদীর জল দান করে চিতা নির্বাপিত করলেন এবং পিতৃআত্মার শান্তি কামনা লেন।

অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পাদনের পর বশিষ্ঠ আদেশ দিলেন--ভরত, এবার যাধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হও আমি তোমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন র।

—আমায় আপনারা এই রাজ্যের রাজার স্বীকৃতি দেবেন ? ভরতের তীক্ষ্ন শ্নে বশিষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য চকিত হয়ে উঠলেন, পরমুহূর্তেই গম্ভীরতর কণ্ঠে রদান করলেন—স্বীকার করতেই হবে। মহারাজার নির্দেশ।

—আপনাদের মনের নির্দেশ কি বলে ?

কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে বশিষ্ঠ সুমন্ত্র এবং অন্যান্য অমাত্যগণ নিশ্চুপ ভা দণ্ডায়মান রইলেন।

—দেখেছেন, আপনাদের মনের স্বীকৃতি নেই।

ভরত কক্ষমধ্যে পদচারণা করতে করতে বললেন—মহামান্য বশিষ্ঠদেব, মান্য সুমন্ত্রদেব, আপনারা আমার থেকে অনেক জ্ঞানী। আপনারা ইতিহাসে বহু গৃহযুদ্ধ অবলোকন করেছেন, কিন্তু গৃহমিলন কদাচিৎ লক্ষ্য করেছেন। আপনা যদি আমাকে রাজার মর্যাদা দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার আদেশ অথবা নির্দেশ : অনুনয় শ্রবণ করুন। এখনও সময় আছে। অধিক বিলম্ব হয়নি। আ সকলে একত্রে যাত্রা করে পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে গৃহে ও তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করি।

সকলে ভরতের কথায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। বশিষ্ঠদেব কিছুক্ষণ ন থাকার পর মৃদুকণ্ঠে ব্যক্ত করলেন—রামচন্দ্র কী তোমার অনুরোধ রক্ষা করবেন ?

সে ধর্ম তাঁর, কিন্তু এ রাজ্য তাঁকে প্রত্যর্পণ করার ধর্ম আমার। আমি ধর্ম পালন করব। আমার গর্ভধারিণী যে পাপকার্য করেছেন, আমি তার প্রায় করব। আপনারা সকলে প্রস্তুত হয়ে নিন, আমি কল্য প্রভাতেই যাত্রারম্ভ ক বাসনা করি।

ভরত অতিরিক্ত একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। গম্ভীর পদক্ষেপে শত্রু সঙ্গে অন্তঃপুরের দিকে গমন করলেন।

কৈকেয়ীর কক্ষদ্বারে শত্রুঘ্ন সুসজ্জিতা মন্থরাকে দেখতে পেয়ে তার আকর্ষণ করে ভরতকে বললেন—মাতা কৈকেয়ী কখনও এইরূপ দুষ্কার্য অ বুদ্ধিতে করতে পারেন না। তাঁর প্রকৃতিও সেরূপ নয়। আমি অনুচরবৃন্দের হতে সংবাদ পেয়েছি, এই দুষ্টা নারীর প্ররোচনায় মাতা কেকেয়ী পূর্বাপর চিন্তা করে এই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন। আপনি আদেশ করুন, আমি ওকে বধ করি-

ভরত গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন—ওকে মুক্তি দাও। নারী অবধ্য।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ভরত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—আমার ঐশ্বর্যলোভিনী, তা যদি না হতেন, তাহলে অনার্যা দাসীর পরামর্শে কুকার্য করেন!

ভরত সেখানে অপেক্ষা না করে আপন ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বারো

নিষাদরাজ গুহক দূরে হতে লক্ষ্য করলেন দিগন্তবিস্তৃত ধূলিরাশি উড্ডীন করে, সহস্র সহস্র সৈন্য অশ্বচালনা করে তাঁর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নিষাদরাজ সেনাপতিকে আহ্বান করে বললেন—সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে লক্ষ্য কর, কারা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য অগসর হচ্ছে। যত শীঘ্র পার, আমাকে সংবাদ প্রেরণ কর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি প্রত্যাগমন করে বললেন—মহারাজ, সর্বনাশ—

—কি সংবাদ ?

—অযোধ্যারাজ ভরত সসৈন্য অগ্রসর হচ্ছেন। আমার মনে হয় তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বধ করে আপন রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে চান।

—এই মুহূর্তে সমস্ত সৈন্যদলকে প্রস্তুত হতে আদেশ দাও। সংকেত পাওয়া মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করবে। আর সকল ধীবরকে আদেশ দাও, তারা যেন নৌকাসহ নদীর পরপারে চলে যায়। ভরতের একটি সৈন্যও যেন নদী পার হতে না পারে। আমাদের নির্দেশ পেলে পুনরায় তারা নৌকাসহ এপারে আসবে।

সেনাপতি নিষাদরাজের সকল আদেশ পালন করে পুনরায় রাজার বামদিকে এসে দাঁড়ালেন।

নিষাদরাজ আদেশ দিলেন—আর একটি কথা। পূর্বে আমরা আক্রমণ করব না। ওরা আক্রমণ করলে আমরা প্রতিহত করব, এবং আমাদের এক সৈন্যদল বামদিকের বনপথ দিয়ে গোপনে যাত্রা করে ওদের পশ্চাৎ দিকে চলে যাবে। সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে ওদের বনমধ্যে পরাজিত করে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

সৈন্যদল ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে।

নিষাদরাজ গুহক তাঁর সেনাপতি সহ স্থিরভাবে দন্ডায়মান। গুহক দেখছেন একসময়ে সৈন্যদল স্থির হয়ে গেল। আর অগ্রসর হচ্ছে না।

রথ হতে ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠদেব এবং সুমন্ত্র অবতরণ করে পদব্রজে নিষাদরাজের দিকে অগ্রসর হলেন।

নিষাদরাজ তখনও স্থিরভাবে দন্ডায়মান। ভরত অগ্রগামী হয়ে নিষাদরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি স্বর্গতঃ মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরত।

মুণ্ডিতকেশ ভরতকে নিরীক্ষণ করে নিষাদরাজ প্রশ্ন করলেন—মহারাজের কি হয়েছিল ? না—আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন ?

ভরত ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আপনার এ সন্দেহ স্বাভাবিক। তবে—আমি মিথ্যা কথা উচ্চারণ করি না। আমার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শোকে প্রাণত্যাগ করেছেন।

—তবে তো আপনি নিষ্কণ্টক? আমার ক্ষুদ্র রাজ্যে আগমনের কারণ কি?

—আমি পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্ধানে এসেছি। শুনেছি, তিনি প্রথমে আপনার নিকটে এসেছিলেন।

—তাঁকে আপনার কি প্রয়োজন? তিনি তো বনবাসী। তাঁকে হত্যা করে কি আপনি আপনার রাজত্বকে আরও নিরাপদ করতে চান?

—এ অভিযোগের জন্য আপনাকে আমি দোষ দেব না। সমগ্র মানবসমাজই আমার জননীর অপকীর্তির জন্য আমাকে এরূপ ধিক্কার দেবে। বিশ্বাস করুন, এই সমস্ত অঘটনের জন্য আমি দাবী নই। আমার অজ্ঞাতে সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে। আমি আমার জননীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়েছি। শ্রীরামচন্দ্রের যেস্থানে দর্শন পাব, সেস্থানেই তাঁর পদবন্দনা করে পুনরায় তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নূতনভাবে পুনরায় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব। আমরা তাঁর আজ্ঞায় একত্রে রাজ্য পরিচালনা করব।

নিষাদরাজ ভরতকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ন্যায় ব্যক্তি আমি জীবনে দেখিনি। আপনারা আজ রাত্রে আমার রাজ্যে বিশ্রাম করুন। কল্য প্রভাতে সকলে একসঙ্গে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাত্রা করব ওঁরা আমার নিকট হতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

নিষাদরাজ সেনাপতিকে সৈন্যদের আপ্যায়নের নির্দেশ দিয়ে ভরত, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্নকে আপন প্রাসাদে অভ্যর্থনা করলেন। সেনাপতিকে আরও নির্দেশ দিলেন সৈন্যসহ রাজা গুহকও ভরতের সঙ্গে যাত্রা করবেন। আহারের পর ভরত নিষাদ রাজকে প্রশ্ন করলেন—আপনারাও আমাদের সঙ্গে কেন যাবেন?

—দুটি কারণে যাব। নিষাদরাজ ধীরকণ্ঠে বললেন—প্রথম কারণ এই মহামিলন দর্শন করে ধন্য হব, দ্বিতীয় কারণ যদি আপনি শ্রীরামচন্দ্রের কোন অনিষ্ট সাধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই মুহূর্তে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করব।

মৃদু হাস্যে ভরত প্রত্যুত্তর করলেন—আপনি যথার্থই রাজনীতিজ্ঞ এবং শ্রীরামের হিতাকাঙ্ক্ষী।

অভিবাদন করে নিষাদরাজ ভরতের কক্ষ হতে নির্গত হয়ে সেনাপতির নিকট গমন করলেন।

সেনাপতি শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে?

না। কিছু না, তবে সমস্ত সৈন্যদলকে প্রস্তুত থাকতে বল। আগামীকল

প্রভাতে ভরতের সঙ্গে আমরাও যাত্রা করব। যদি ভরত আমাদের ছলনা করে শ্রীরামের অনিষ্টসাধনে ব্রতী হয়, সেই মুহূর্তে আমরা প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ করব। সমস্ত রকম অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেন সৈন্যদল যাত্রা করে, তারা যেন নৌকা এ পারে এনে নিজ নিজ গৃহে রাত্রিবাস করে।

সেনাপতি সেই ক্ষণেই নিষাদরাজের আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পরদিন সকালে স্নানাদির পর সকলে নৌকাযাত্রা করে নদীর অন্য পারে উপস্থিত হলেন।

বনপথ ধরে অগ্রসর হতে হতে ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের সন্নিকটবর্তী হয়ে ভরত সকলকে নির্দেশ দিলেন —সৈন্যদল, তোমরা এ স্থানে অবস্থান করো। আমরা এ স্থান হতে পদব্রজে তপোবনে প্রবেশ করব।

রথ হতে প্রথমে ভরত অবতরণ করলেন। তারপর শত্রুঘ্ন বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র। অন্য রথ হতে অবতরণ করলেন নিষাদরাজ এবং সেনাপতি। তৃতীয় রথ হতে অবতরণ করলেন রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা।

বশিষ্ঠ তপোবনের মনোরম পথ ধরে আশ্রম অভিমুখে সকলকে নিয়ে চললেন। আশ্রম দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে ভরদ্বাজ ঋষি বিস্মত হয়ে প্রশ্ন করলেন– আপনি বশিষ্ঠদেব? সমস্ত কুশল তো?

—হ্যাঁ দেব। বশিষ্ঠদেব সশ্রদ্ধ অভিবাদন করলেন ভরদ্বাজকে। ভরদ্বাজও প্রত্যাভিবাদন করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—এঁদের পরিচয়?

বশিষ্ঠ এক এক করে সকলের পরিচয় প্রদান করলেন—ইনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ রানী কৌশল্যা, ইনি কৈকেয়ী, ইনি সুমিত্রা।

পরপর তিন রানী ঋষি ভরদ্বাজকে প্রণাম করলেন।

ভরতের দিকে দৃষ্টিপাত করে বশিষ্ঠদেব বললেন—ইনি দশরথতনয় ভরত এবং শত্রুঘ্ন। সর্বশেষে সুমন্ত্রদেবের পরিচয়দান কালে বশিষ্ঠদেব বললেন - ইনি অযোধ্যার অভিভাবকস্বরূপ প্রধান অমাত্য সুমন্ত্র দেব।

সকলেই ঋষি ভরদ্বাজের পদধূলি গ্রহণ করে প্রণাম করলেন।

ঋষি ভরদ্বাজ সকলের কুশল প্রশ্ন করে বললেন—আমার নিকট সদলবলে কী অভিপ্রায়ে?

ভরত উত্তরদান কালে বললেন—আমরা এসেছি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অন্বেষণে। আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, আমার পিতা তাঁকে অশাস্ত্রীয় নীতিতে রাজত্ব হতে বঞ্চিত করে বনবাসে প্রেরণ করেছেন। আমি রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে, অযোধ্যার জন-গণের প্রতিভূরূপে যাত্রা করেছি। শ্রীরামকে তাঁর রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে আমার কর্তব্যকর্ম করব।

ভরদ্বাজ মুনি পরমস্নেহে উত্তরদান করলেন—তোমার কল্যাণ হোক। তোমার

সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ, কিন্তু বৎস, রাজা দশরথ তাঁর সত্যপালন করেছেন। কোন অন্যায় কর্ম তো করেন নি।

—আমি পিতার কার্য সমালোচনা করতে অভিলাষী নই, কিন্তু তবু বলব, আমার পিতা অন্যায় কর্ম করেছেন।

—কেন এ কথা বলছ?

—ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন এবং যাকে যা খুশি দান করতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক রাজারই এ কথা মনে রাখা উচিত, তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। এমন কার্য তাঁদের করা উচিত নয়, যাতে দেশের ও দশের অমঙ্গল হয়। আমার পিতা এমন বরদান করেছেন যার জন্য অযোধ্যায় গৃহযুদ্ধের দামামা ধ্বনিত হতে পারত, সমস্ত দেশ জনশূন্য হয়ে যেতে পারত এবং বর্তমানে প্রত্যেক মানুষের মনে অশান্তি বিরাজ করছে। আমি সেই অশান্ত মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে বসে অনুরোধ করব অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট হোন।

ভরতের বাক্যে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। ঋষি ভরদ্বাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরীক্ষার জন্যই বললেন—তোমার দেয় রাজ্য শ্রীরাম কেন গ্রহণ করবে?

—কেন করবেন না? তর্ক প্রসঙ্গে স্বীকার করলাম রাজা দশরথ আমাকে অযোধ্যার সিংহাসন দান করেছেন, আমি গ্রহণ করেছি—এ কথা স্বীকার করেন কি না?

—বেশ করলাম—মৃদু হাস্যে ভরদ্বাজ উত্তর দিলেন।

- আমার রাজ্য আমি শ্রীরামচন্দ্রকে বিনাশর্তে দান করব। এর ভিতর কোন শঠতা বা ক্রূরতার স্থান থাকতে পারে না।

ভরতের বাক্যে ঋষি ভরদ্বাজ অতীব প্রীত হলেন। তিনি ভরতকে প্রশ্ন করলেন —তোমার সৈন্যদলকে তপোবনের বাইরে রেখে এসেছো কেন?

- সৈনিকদের অশ্বখুরাঘাতে এস্থানের মর্যাদা হানি হবে। অশ্বগণ অকারণে আপনার তপোবনের সৌন্দর্য নষ্ট করবে, পত্র ভক্ষণ করবে, তপোবনের শান্তি বিনষ্ট করবে।

ঋষি ভরদ্বাজ প্রীত হয়ে বললেন সাধু, সাধু—তুমিই সার্থক রাজপুত্র। তোমরা সকলে অদ্য রজনীতে এ স্থানে বিশ্রাম কর, আমি তোমার সৈন্যগণের আহারের ব্যবস্থা করি। কল্য প্রভাতে সকলে একসঙ্গে চিত্রকূট পর্বত অভিমুখে যাত্রা করব। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বর্তমানে চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করছে।

আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য—ভরত প্রণামপূর্বক বললেন।

চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে ভরত লক্ষ্য করলেন সমগ্র পর্বতাঞ্চল গভীর অরণ্যবেষ্টিত। এই অরণ্যাঞ্চলের অভ্যন্তর থেকে কী ভাবে দেবপ্রতিম রামচন্দ্রকে আবিষ্কার করবেন ভরত?

চতুর্দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ক্ষেপণ করে ভরত লক্ষ্য করতে লাগলেন। অকস্মাৎ পর্বতশিখরের প্রান্তে ধূম্রকুন্ডলী অবলোকন করলেন। ভরত সহর্ষে বশিষ্ঠকে বললেন—মহামুনি, আমার সন্দেহ শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণ ওই স্থানে বাস করছেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণ হতে ধূম্রজাল আকাশে উড্ডীন। চলুন প্রথম আমরা ওই স্থানে অন্বেষণ করি।

—তোমার কথাই সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। চল, আমরা ওই স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করি

সসৈন্য ভরত গভীর অরণ্য ভেদ করে চিত্রকূট পর্বতারোহণ আরম্ভ করলেন।

পর্ণকুটির হতে সৈন্যদের চিৎকার শ্রবণ করে রাম-লক্ষ্মণ উদ্যানে উপস্থিত হয়ে নিম্নদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন—অসংখ্য সৈন্যসহ কোন এক রাজা তাঁদের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন—তুমি বৃক্ষচূড়ে উঠে দেখ কারা আসছেন? কী তাদের অভিপ্রায়?

লক্ষ্মণ মুহূর্তমধ্যে রামের আদেশ পালন করলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন লক্ষ্মণ বৃক্ষ হতে অবতরণ করলেন, তখন তাঁর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ। ক্রোধে নাসিকা উর্দ্বোত্থিত। নেত্রদ্বয় আরক্ত।

রাম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কী হয়েছে লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ উগ্রস্বরে উত্তরদান করলেন—ভরত সসৈন্যে আমাদের আক্রমণের উদ্দেশে এই দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনি আদেশ দান করুন, আমি একাই শরক্ষেপণ করে ভরত এবং তার সৈন্যদলকে নিঃশেষ করে আসি।

ধীরকণ্ঠে রাম বললেন—স্থির হও। এত অল্পে কখনও উত্তেজিত হতে নেই। পূর্বে লক্ষ্য কর, ওরা কি করে? ওরা যদি বাণ নিক্ষেপ করে, আমরা মুহূর্তমধ্যে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে সমস্ত সৈন্যদলকে ভস্মে পরিণত করব।

লক্ষ্মণ অস্থিরভাবে উদ্যান মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন। সীতাদেবী পূজার্চনা সম্পাদন করে পুষ্পসাজে সজ্জিতা হয়ে কুটিরাভ্যন্তর হতে নির্গত হয়ে, শ্রীরামকে প্রণাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করলেন।

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সীতাদেবীকে প্রণাম করলেন, রাম উভয়কে আশীর্বাদ করলেন।

ভরতবাহিনীর কলরব নিকটবর্তী হতে লাগল। সীতা বিস্মিতা হয়ে প্রশ্ন করলেন—এই নির্জন প্রান্তরে ও কিসের কলরব?

লক্ষ্মণ উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন—ভরত সসৈন্যে আমাদের বধ করতে আসছে। আমাদের বধ করলে ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। শ্রীরামচন্দ্র আর কোনদিন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। চিরকাল ভরত রাজত্ব করবে।

—ছিঃ লক্ষ্মণ, এরূপ বাক্য কখনও উচ্চারণ করবে না। আমার দৃঢ় ধারণা

ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আমার বনবাসের সংবাদ শ্রবণ করে প্রাণসম, সখাসম, ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছে। আমার কথায় যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়, ভরত-মিলনের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভরতকে অনুরোধ করব, তোমাকে রাজত্ব দান করার জন্যে। আমার মনে প্রতীয়মান হয়, আমার নির্দেশ ভরত অমান্য করবে না।

লক্ষ্মণ আপন উগ্রবাক্যে আপনিই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। সীতাদেবী লক্ষ্মণের সাহায্যার্থে বললেন, লক্ষ্মণকে ও প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত নয়। ও যা বলেছে, তোমার মঙ্গলার্থেই বলেছে।

লক্ষ্মণ নীরবে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভরত শত্রুঘ্নকে নির্দেশ দিলেন—তুমি সৈন্য সহ পশ্চিমদিক অন্বেষণ কর। নিষাদরাজ আপনার সেন্যসহ পূর্বদিকে অন্বেষণ করুন, আমি উত্তর দিকে যাত্রা করছি। বশিষ্ঠদেব, আপনি মাতৃগণকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার পথ অনুসরণ করুন।

ভরতের নির্দেশ অনুযায়ী সকলে বিভক্ত হয়ে রাম-কুটির অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলেন।

ভরত উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক গুল্মলতাবেষ্টিত বৃক্ষের পাশ দিয়ে তার উত্তর গাত্রে পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অদূরে সুন্দর পর্ণকুটির। সম্মুখে উদ্যানবেদী। বেদীর উপর অধিষ্ঠান করছে চীরজটাজুটধারী রাম-সীতা-লক্ষ্মণ। ঐশ্বর্যে ভূষিত নয় তাঁদের দেহ, তবু স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করছে মুখমণ্ডলে। চন্দনচর্চিত নয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তবু এক অনির্বাণ জ্যোতিতে উদ্ভাষিত তাঁদের দেহবল্লরী। অনিমীলিত নেত্রে, অভিভূত হয়ে তিনি তাঁদের অবলোকন করতে লাগলেন, তারপর হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে বিদ্যুৎবেগে দ্রুতপায়ে শ্রীরামের পদপ্রান্তে পৌঁছে নিজেকে সমর্পণ করে আকুল ক্রন্দনে আর্তকণ্ঠে বললেন—পিতৃপ্রতিম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চক্ষুসকল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে দুই হস্তে উত্তোলিত করে, আপন বুকের মধ্যে আবেষ্টন করে ক্রন্দনরত কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—ভ্রাতা! তুমি আমার প্রাণসম সখা। তোমার উপর কী কোন ক্রোধ থাকতে পারে? সর্বান্তঃকরণে আমি তোমায় ক্ষমা করছি।

ভরত সীতাকে প্রণাম করলেন। সীতা ভরতকে আশীর্বাদ করলেন। ভরত ও লক্ষ্মণ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

—ভরত! শ্রীরামচন্দ্র চিন্তিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—এইরূপ অবস্থা কেন তোমার? কী হয়েছে? মহারাজ দশরথ উপস্থিত না হয়ে তুমি এসেছ কেন?

ভরত অশ্রুমোচন করে বললেন—আমার মাতার অপকীর্তির কোন কথাই আমার জ্ঞাত ছিল না। পিতা দশরথ যখন তোমাকে বনে প্রেরণ করেন, আমাকে সিংহাসন দান করেন, আমি তখন রাজগৃহে। আমি ঘূণাক্ষরেও এই ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনা করতে পারি নাই। তোমাদের যাত্রার অনতিকাল পরেই, দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতগণ আমাকে ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় আনয়ন করে। অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করে বুঝতে পারি রাজ্যে কোন অঘটন ঘটেছে। সমস্ত পুরী নিস্তব্ধ নিথর, যেন প্রেতপুরী। রাজপুরীতে প্রবেশ করে সমস্ত ঘটনা অবগত হই। তোমরা যেদিন বনবাসে যাত্রা করেছ সেইদিন মধ্যরাত্রে পুত্রশোকে রাজা দশরথ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সিংহাসন শূন্য থাকলে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে এই আশঙ্কায় বশিষ্ঠদেব সত্বর আমাকে মাতুলালয় হতে অযোধ্যায় আনয়ন করে, রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

বিবর্ণ ক্লান্ত কৃষ্ণকায় ভরতকে পুনরায় আলিঙ্গন করে শ্রীরামচন্দ্র শোকগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন—কি বললে? পিতা জীবিত নাই?

—না। যে কদিন আমি অনুপস্থিত ছিলাম সেই কদিন পিতার দেহ তৈলাধারে রক্ষিত ছিল।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরত সকলেই পিতৃশোকে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর শোকাগ্নি অল্প মাত্রায় প্রশমিত হতে শ্রীরাম সুমন্ত্রর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—পূর্বে চলুন, পিতৃতর্পণ সম্পন্ন করে আসি।

সুমন্ত্র সহ সকলে মন্দাকিনী তীরে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামচন্দ্র তর্পণ ও পিণ্ডদান সমাপ্ত করে সীতা ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পুনরায় পর্ণকুটিরে প্রত্যাগমন করলেন।

বেদীর উপর রাম-সীতা।

পদতলে ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন।

শ্রীরাম প্রশ্ন করলেন—ভরত, এখন তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

ভরত তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করার পূর্বেই বশিষ্ঠদেব রানী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। শ্রীরাম সর্বাগ্রে প্রণাম করলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে। পরে বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করে শ্রীরাম বললেন—বশিষ্ঠদেব আপনি বেদীপরে উপবেশন করুন, আমরা ভূমিতলে আসন গ্রহণ করছি।

ভরত আকুল ক্রন্দনে শ্রীরামকে উদ্দেশ করে বললেন—তার পূর্বে তুমি একবার উচ্চারণ কর, আমার মাতা কৈকেয়ীকে তুমি ক্ষমা করেছ।

—ছিঃ! ভরত! মাতা কৈকেয়ী আমার পূজনীয়া। উনি আমার জন্যে যা করেছেন, অন্যের চোখে অপরাধ হলেও আমার নিকট আশীর্বাদস্বরূপ ওঁর প্রতি

আমার কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ নাই। পূর্বেও ওঁকে যেমন জননীর ন্যায় ভক্তি করতাম, আজও তেমনি করি। মা কৈকেয়ী, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

কৌশল্যা সীতাকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে, সরোদনে বিলাপ করতে লাগলেন--হায়! জনকদুহিতা কন্যাপ্রতিমা বধূমাতা! তোমার দেহ অমূল্য রত্নখচিত অলংকার ও বেশভূষায় সজ্জিত থাকবে, তুমি দুগ্ধফেননিভ মসৃণ শয্যায় শয্যা গ্রহণ করবে, দাসদাসী তোমার সেবা করবে, তার পরিবর্তে আজ আমি কি দর্শন করছি। এর চেয়ে আমার মৃত্যু অনেক শ্রেয়ঃ ছিল।

শ্রীরাম মাতাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে কুটির প্রাঙ্গণে বসালেন, তারপর ধীরকণ্ঠে ভরতকে প্রশ্ন করলেন—এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

প্রত্যুত্তরে ভরত কোন কথা উচ্চারণের পূর্বেই নিষাদরাজ, জাবালি, সৈন্যগণ, নিষাদগণ এবং অযোধ্যাবাসী পুরনরনারিগণ উপস্থিত হলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন—এ সবের কী অর্থ ভরত?

ভরত শ্রীরামের পদতলে ভূপতিত হয়ে সক্রন্দনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন—পূজনীয় জ্যেষ্ঠ, আমরা তোমাকে চিরকাল পিতার ন্যায় মান্য করেছি, আজও তাই করি। পিতার অবর্তমানে তুমি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য পরিচালনা কর, এই প্রার্থনা নিয়ে আমরা চিত্রকূটে উপস্থিত। আমরা তিন ভ্রাতা তোমার আদেশ অনুযায়ী রাজ্য রক্ষা করব।

শ্রীরামচন্দ্র অল্পক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর সুমিষ্ট-স্নেহমিশ্রিত স্বরে উত্তরদান করলেন—প্রাণাধিক প্রিয় ভরত। তুমি মহাত্মা এবং নির্লোভ, এ আমি বহুদিন হতেই অবগত আছি। কিন্তু ভাই, ন্যায্য হোক, অন্যায় হোক, পাপ হোক, পুণ্য হোক, পিতৃআজ্ঞা পালন করাই হল পুত্রের প্রথম কর্তব্য। আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। আমি যদি আদর্শ পালন না করি, সমগ্র দেশের মানুষ ভবিষ্যত কালে কেন আমার আদেশ পালন করবে? আমি পিতৃসত্য পালন করে সমগ্র জাতির সামনে আদর্শ স্থাপন করতে চাই, পিতা-মাতা-রাজা যে আদেশ দেবেন, নির্বিচারে সে আদেশ পালন করা কর্তব্য। এই ভাবে দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে, শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। দেশে শান্তি বিরাজ করে। মাতা কৈকেয়ী উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু আমার এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীরামের এই অকাট্য যুক্তির কি উত্তর দেবেন ভরত প্রথমে কল্পনা করতে পারলেন না, তারপর ধীরকণ্ঠে প্রতি-যুক্তি দান করলেন—বেশ, তোমার বাক্যই শ্রেয়ঃ মনে করছি, কিন্তু আমরও কিছু বক্তব্য আছে।

—অনায়াসে এবং নির্ভয়ে ব্যক্ত করতে পার।

—মৃত্যুকালে মানুষের মতিভ্রম হয়। মৃত্যুকালে মোহগ্রস্ত হয়ে পিতার মতিভ্রম

ঘটেছিল, সেইজন্যে তিনি আমার মাতাকে অন্যায় বরদান করে রাজ্যে বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। আমি সারাজীবন নিন্দিত হয়ে কী ভাবে রাজ্য পরিচালনা করব? প্রজাগণ যখন বলবে, ভরত অন্যায়ভাবে রাজ্যগ্রহণ করেছে, আমরা তাঁকে স্বীকার করি না। রাজ্যে যদি বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন কী ভাবে রক্ষা করব? রাজনীতিতে যা অন্যায়, তাকে প্রত্যাখ্যান করা পাপ নয়। ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই রাজনীতির প্রধান এবং প্রথম কথা। সেইজন্যে শুধু আমার নয়, সমগ্র অযোধ্যাবাসী, নিষাদরাজ্যের প্রজাবৃন্দ, সকলের সামগ্রিক ইচ্ছা পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ কর তুমি, আমরা তোমার আজ্ঞায় রাজ্য পরিচালনা করি।

তারপরই প্রজাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভরত উচ্চকণ্ঠে বললেন—অযোধ্যাবাসী ভাইসব, নিষাদরাজ গুহক তোমরা নীরব কেন? তোমরাও আমার সঙ্গে শ্রীরামকে কেন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে বলছ না? আমার অনুরোধ শ্রীরাম উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তোমাদের অনুরোধ উনি কখনই প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

নিষাদরাজ গুহক ধীরকণ্ঠে বললেন—তোমাদের উভয়ের যুক্তিই অকাট্য, সেইজন্য আমরা কি বলব ধারণায় আনতে পারছি না।

শ্রীরামচন্দ্র উচ্চবেদীতে দণ্ডায়মান হয়ে প্রজাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—আমার প্রিয় ভ্রাতৃসম প্রজাগণ তোমরা হয়ত জ্ঞাত নও ভারতের দক্ষিণে সিংহল দ্বীপে মহাপরাক্রমশালী পৌলস্ত্যবংশজাত নৃপতি রাবণ রাজত্ব করেন। তাঁর প্রতিভা ও যুদ্ধনীতি অত্যন্ত তীক্ষ্ন। ভারতবর্ষ হতে তিনি আধুনিক শরবিদ্যা এবং অগ্নেয়াস্ত্র ক্ষেপণের কৌশল শিক্ষা করে আপন দেশে, সৈন্য ও সেনাপতিগণকে শিক্ষাদান করেছেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হয়ে রাবণের সৈন্যদল অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সিংহলভূমিতে ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইজন্য রাবণ যে কোন মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করতে পারেন। ভারতের অংশবিশেষ তিনি জয় করে, আপন রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে, নিজের দেশের জনগণকে তথায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি পুষ্পক-রথ চালনায় অত্যন্ত দক্ষ, এবং তাঁর দেশে অনেকগুলি ছোট-বড় পুষ্পক-রথ তৈরীর ক্ষেত্র আছে।

তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, আমি এত সংবাদ কোথা থেকে সংগ্রহ করলাম। বিবাহপূর্বে আমি ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে যাত্রা করেছিলাম, এ কথা সকলেরই স্মরণে আছে। সেস্থানে আমি তাড়কা এবং সুবাহুকে বধ করি, কিন্তু মারীচ আহত অবস্থায় পলায়ন করে। সেই সময়ে ঋষি বিশ্বামিত্র আমাকে রাবণের বিশেষ ঘটনা বিবৃত করেন এবং নির্দেশ দেন ভারতভূমিতে যদি অখণ্ড রাজত্ব স্থাপন করতে চাও, তাহলে রাবণ নিধনের জন্য প্রস্তুত হও।

বন্ধুগণ! আমার পিতা অন্তিমকালে আমাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—তুমি আমাকে বন্দী করে রাজা হও।

আমি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বনবাসে যাত্রা করি, কারণ আমি তখনই মনস্থির করেছিলাম, এই চতুর্দশ বর্ষে দক্ষিণাবর্তের রাজন্যবর্গের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে। আমি তাঁদের আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে পারব। আমার যোগ্য ভ্রাতা ভরত এদিকে অযোধ্যা ও উত্তরাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণ করতে সমর্থ হবে।

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষণিক নীরব থেকে পুনরায় বললেন, রাবণ পুষ্পক-রথে প্রায়ই ভারতের আকাশে উড্ডীন হয়ে দেশ পরিক্রমা করছেন। বিনাদোষে কোন রাজ্য আক্রমণ করা নীতিবিরুদ্ধ বলে তিনি আক্রমণ করতে পারছেন না, কিন্তু সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোন মুহূর্তে রাবণ ভারত আক্রমণ করতে পারেন।

জাবালিমুনি বললেন—তুমি তো বাবা আমাদের ভীত করে বনে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার অভাবে আমাদের বাঁচাবে কে? শোন, শাস্ত্রে আছে, মানুষ একাই জন্মায়, একাই মৃত্যুগ্রহণ করে। এ জগতে কে পিতা, কে মাতা? নিজের সুখই সুখ। তুমি বিনাকারণে বনে বনে সন্ন্যাসীর জীবন পালন করে কষ্ট পাবে? তার চেয়ে, অযোধ্যায় ফিরে চল। রাজ্যসুখ ভোগ কর এবং আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর।

শ্রীরাম মৃদু হাস্যে বললেন—আপনি ধর্মসম্মত কথা বললেন কিনা সে বিচার করবেন মহামতি বশিষ্ঠদেব, কিন্তু আমি সন্ন্যাসীবেশ গ্রহণ করেছি স্ব-ইচ্ছায়। আমরা সন্নাসীরূপে বসবাস করলে রাবণের অনুচরেরা আমাদের সহজে চিহ্নিত করতে পারবে না এবং সহজেই আমরা কার্যসিদ্ধি করতে পারব। অতএব প্রিয় ভরত, আমার নির্দেশ, তুমি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে রাজকার্য পরিচালনা কর।

বশিষ্ঠদেব বললেন--জবালি তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য ওই ধরণের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তুমি কি সত্যই ভরতের অনুরোধ রক্ষা করবে না?

—মহামতি বশিষ্ঠদেব। আমি যে উপদেশ ভরতকে দান করলাম, তা কি একান্তই অরাজনীতিজ্ঞ-সুলভ?

—না। এ কথা উচ্চারণ করার সাধ্য আমার নাই। তোমার দূরদর্শিতা দেখে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত।

--তবে আমাকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে কেন বলছেন? আমার পিতার আদেশ, আমার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ দেখা দিয়েছে। দেখবেন এতে দেশের মঙ্গল হবে। ভবিষ্যতের এক শুভসূচনার ভূমিকা আমার এই বনযাত্রা। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সার্থক হয়ে প্রত্যাগমন করি। ততদিন ভ্রাতা ভরত রাজ্য পরিচালনা করুক। সেও আমার ন্যায় শান্তিপূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে সমর্থ হবে।

সভাস্থ সকলে নীরব।

শ্রীরামচন্দ্র ধীরপদক্ষেপে ভরতের সম্মুখে এসে তার মস্তকে হস্ত স্থাপন করে

বললেন—ভাই ভরত, আমার আদেশ পালন কর। এ আদেশ সাংসারিক মান-অভিমানের নয়, এ আদেশ রাজনীতির। তুমি অন্তর্দেশীয় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি বহির্দেশীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করে সমস্ত ভারত ভূমিতে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব।

ভরত নতমস্তকে ধীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—তোমার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য। আমি তোমার প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করব। আমি রাজসুখ ভোগ করব না। আমিও তোমার মতই সন্ন্যাসজীবন যাপন করব। আমি নন্দিগ্রামে পর্ণকুটিরে ফলমূল আহার করে দিনাতিপাত করব। সেখান হতেই আমি রাজকার্য পরিচালনা করব।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে ভরত বললেন—আমার আর একটি নিবেদন আছে।

—বল? স্নেহের সঙ্গে রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

—তোমার পাদুকাদ্বয় আমায় দান কর। প্রণাম করে ভরত বললেন।

—তথাস্তু। পাদুকাদ্বয় পরিত্যাগ করে রামচন্দ্র কয়েক পদ পশ্চাতে গেলেন।

ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে বললেন—সর্বসমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি এই পাদুকাদ্বয়কে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব। পাদুকাদ্বয়ের ওপর রাজছত্র ধারণ করব। আমার কর্তব্যফল অর্পণ করব ওই পাদুকাদ্বয়ের উদ্দেশে। ন্যায় করছি, কি অন্যায় করছি সে বিচার করবেন মহামতি বশিষ্ঠদেব এবং মহামাত্য সুমন্ত্রদেব।

বিদায়—

ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে চিত্রকূট পর্বত হতে প্রত্যাগমনযাত্রা আরম্ভ করলেন। সকলে ভরতকে অনুসরণ করলেন। ধীরে ধীরে সকলে দিগন্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণের দুই চোখে অশ্রুর ধারা। চক্ষুর সম্মুখে ধীরে ধীরে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রজাগণ নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অশ্রুমোচন করে বললেন—এবার আমাদের চিত্রকূট পর্বত ত্যাগ করে আরও দক্ষিণে যাত্রা করতে হবে।

—কেন প্রভু? সীতা প্রশ্ন করলেন।

রাম সাশ্রুনয়নে বললেন—এ স্থান আর ভরতের অপরিচিত নয়। পুনরায় যে কোন মুহূর্তে ওরা চিত্রকূটে উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করতে পারে। অন্য কারণ, এই অসংখ্য লোকের এবং জীবজন্তুর মলমূত্র ত্যাগে এ স্থান অশুচিপূর্ণ ও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মণ প্রস্তুত হয়ে নাও। আজই আমরা আরও দক্ষিণে যাত্রা করব।

লক্ষ্মণ বিনাবাক্যে জ্যেষ্ঠের আদেশ পালনে ব্রতী হলেন।

তেরো

ভরত সদলবলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন—সুমন্ত্রদেব, জ্যেষ্ঠের এই পাদুকাদ্বয়কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব এবং এই পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক আয়োজন যথাশীঘ্র পারেন ব্যবস্থা করুন।

সুমন্ত্রদেব ভরতের আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি অভিষেক আয়োজনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করলেন এবং সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করাবার জন্য ঘোষণা করলেন।

অতি অল্পকালের মধ্যে, রাজ্যের জনগণ সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দর্শনে ধন্য হবার নিমিত্ত আগমন করলেন।

যথাসময়ে ভরত বশিষ্ঠদেবকে অনুরোধ করলেন—আপনি অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ করুন।

বশিষ্ঠদেব মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। মন্ত্র শেষে ভরত মস্তক হতে পাদুকাদ্বয় সিংহাসনের উপর সজ্জিত করে, চন্দন পুষ্প দ্বারা অর্চনা করে গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—হে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! তোমার প্রতিভূস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয়, তোমার প্রকৃত স্থানে আমি স্থাপিত করলাম। আজ হতে এই পাদুকাদ্বয়ই প্রকৃত রাজা। আমি রাজার প্রতিনিধি মাত্র। আমি তোমার প্রতীকরূপে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষভাবে রাজকার্য পরিচালনা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্ন্যাসজীবন যাপন করব। আমি প্রত্যহ রাজপুরীতে এসে রাজকার্য পরিচালনা করে পুনরায় নন্দিগ্রামে প্রত্যাগমন করব সন্ন্যাসীবেশে। চতুর্দশবর্ষ পরে, শ্রীরামচন্দ্র যখন পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করবেন, তিনি লক্ষ্য করবেন, তাঁর রাজভাণ্ডারের অর্থসম্পদ চতুর্দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রজাগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে এবং তাঁরই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

অযোধ্যা নগরীর জনগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল—জয় মানবশ্রেষ্ঠ ভরতের জয়।

ভরত জলদগম্ভীর স্বরে বললেন—আমার জয় নয়। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে জয়ধ্বনি করে ওঠ, জয় নৃপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

সকলে সমবেতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠল—জয়, শ্রীরামচন্দ্রের জয়। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা দীর্ঘায়ু হোন। তাঁরা নিরাপদে পুনরায় নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করুন।

ভরতের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে সমবেত জনগণ একই বাক্য উচ্চারণ করল।

অভিষেক-অন্তে ভরত সুমন্ত্রদেবকে নির্দেশ দিলেন—সুমন্ত্রদেব, আপনি রাজপুরীর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আমার জননীগণ ও বধূমাতাগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হল।

বশিষ্ঠদেবের পদধূলি গ্রহণ করে ভরত বললেন—মহামতি বশিষ্ঠদেব, আপনি রাজকার্যের তাৎক্ষণিক উপদেশ সুমন্ত্রদেবকে দান করবেন। জটিল সমস্যাবলী আমার নিকট ব্যক্ত করবেন। সাধ্যানুযায়ী আমি তার সমাধান করবার ব্যবস্থা করব।

ভরত বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করলেন। বশিষ্টদেব আশীর্বাদ করে বললেন—আমার দীর্ঘ জীবনে আমি এখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারছি না, রাম ও ভরতের মধ্যে কার হৃদয় মহত্তর। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে সন্ন্যাস জীবন যাপন করছে, আর তুমি রাজ্যমধ্যে সমস্ত রাজ্যসুখের ভিতর অধিষ্ঠান করেও, সর্বপ্রকার প্রলোভন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন পালন করছ। এ যে কত বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমার ব্যক্তিগত মত, তুমি শ্রীরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তোমার জয় হোক।

ভরত বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করে বললেন—ও কথা বলে আমার অপরাধ আর ঘনীভূত করবেন না। আমি যেন আপনাদের আশীর্বাদভিক্ষা পাই, এইটুকুই আমার আকাঙ্ক্ষা। এক্ষণে আমাকে নন্দিগ্রাম যাত্রার অনুমতি দান করুন।

ভরত রাজবেশ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর চীরবসন পরিধান করে পদব্রজে অযোধ্যার রাজপথ ধরে নন্দিগ্রামের দিকে অগ্রসর হলেন। সাশ্রুনয়নে সমবেত জনগণ সেই দৃশ্য অবলোকন করতে লাগলেন।

সেই দিন হতে সন্ন্যাসী-রাজা ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে অযোধ্যার রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন এবং নন্দিগ্রামের পর্ণকুটিরে সন্ন্যাসীর জীবন-যাত্রা আরম্ভ করলেন।

চিত্রকূট পর্বত পরিত্যাগ করে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দক্ষিণাবর্ত অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কয়েকটি বন ও উপবন পার হয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন মহামুনি অত্রির আশ্রম উপবনে।

অত্রি মুনি অতি বৃদ্ধ। তাঁকে প্রণাম করে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ আপন আপন পরিচয় দান করলেন। অত্রি মুনি পরম আপ্যায়নে রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করলেন, তারপর কুটিরাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে আহ্বান করলেন—অনসূয়া।

অনসূয়া ধীর পদক্ষেপে কুটিরাভ্যন্তর হতে নির্গত হলেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ বিস্মিত নয়নে সেই বর্ষীয়সী তপস্বিনীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে অবলোকন করতে

লাগলেন। আজানুলম্বিত শ্বেতশুভ্র কেশগুচ্ছ। মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের বলিরেখা। চোখ দুটি পবিত্রতায় দীপ্তিময়ী। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধাভক্তিতে মস্তক নত হয়ে আসে। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ একে একে প্রণাম করলেন। অত্রি মুনি রামকে বললেন—ইনি আমার পত্নী। সর্বসাধারণের নিকট ইনি সতী অনসূয়া নামে পরিচিতা।

মৃদু হাস্যে উত্তরদান করলেন—বালক-বালিকাদের নিকট আমাকে লজ্জা দাও কেন ?

অত্রি মুনি স্মিতহাস্যে প্রত্যুত্তর করলেন—তোমার গভীর তপস্যায় তুমি যে অসাধ্য সাধন করেছ, তা কেবল তোমার নয়, সমগ্র নারীজাতির উজ্জ্বল সম্মান। যখন এই অঞ্চল বিভীষিকাময় খরায় মরুভূমির আকার ধারণ করেছিল, যখন সমস্ত তপোবন-বাসী মৃত্যুর কবলে নিষ্পেষিত, তখন তুমি তোমার দীর্ঘ তপস্যার বলে বৃষ্টি আনয়ন কর। জাহ্নবীর জলরাশি সংগ্রহ করে পুনরায় সমস্ত শ্রীহীন ভূমিক্ষেত্রকে সুজলা-সুফলা করে তোল। তোমার এই পরিচিতি এদের কাছে প্রকাশ না করলে আমার অপরাধ হবে অনসূয়া।

সতী অনসূয়া নীরব।

অত্রি মুনি বললেন—সীতাও তোমার ন্যায় পতিকে আরাধ্য দেবতারূপে গ্রহণ করে স্বামীসহ গভীর অরণ্যে গমন করেছেন। তুমি এঁকে যথাযথ আপ্যায়ন কর।

—এসো মা। সীতাকে অভ্যর্থনা করে সতী অনসূয়া কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সতী অনসূয়া সীতার মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—তুমি রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, সমস্ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছ, এতে আশীর্বাদ করছি তোমার জীবনে কল্যাণ হবে। পতি দুশ্চরিত্র হোক, কল্যাণময় হোক, স্বামীর সেবাই পত্নীর পরম এবং প্রধান কর্তব্য।

সীতা মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—আমার স্বামী যদি চরিত্রহীন, মদ্যপ, স্বেচ্ছাচারী হতেন, তবুও তাঁকে সেবা করতাম। আমার সেবার মাধ্যমে তাঁকে আমি কল্যাণময়-রূপে রূপান্তরিত করতাম। আমার সেবায় তিনি মঙ্গলময় হয়ে উঠতেন, প্রজাবৎসল রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হতেন, কিন্তু আমার স্বামীর পক্ষে সে ধরনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি জিতেন্দ্রিয়। একমাত্র আমি তাঁর পত্নী, সখী। পৃথিবীর সমগ্র নারীজাতিকে তিনি মাতৃসম্বোধন করেন। এইরূপ চরিত্রের স্বামীর সঙ্গে বনবাস কেন, নরকেও গমন করতে আমি প্রস্তুত। তাঁর উপস্থিতিতেই আমার মনে হয়, আমি স্বর্গবাস করছি।

সীতা তারপর ধীরভাবে তার স্বয়ম্বর সভার বিবরণ ব্যক্ত করলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে সতী অনসূয়া আনন্দিতা হয়ে সীতাকে আলিঙ্গন করে বললেন, ধন্য তুমি। ধন্য তোমার স্বামী। তোমাকে আমি বর দেব। তোমার প্রিয় কার্য কি করব বল ?

সীতা মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন—তার সবই তো আপনি করেছেন।

সতী অনসূয়া অধিকতর প্রীত হয়ে বললেন—সীতা, এই দিব্য বরমাল্য বস্ত্র আভরণ অঙ্গরাগ ও মহার্ঘ গন্ধানুলেপন তোমাকে দিচ্ছি। এ সমস্ত ধারণ করে স্বামীকে শ্রীমণ্ডিত কর। লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুকে করেন। এই সকল দ্রব্য তোমারই যোগ্য। নিত্য ব্যবহারেও ম্লান হয় না।

সীতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত দান গ্রহণ করলেন। অতঃপর সীতা ধীরকণ্ঠে আপন জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। সতী অনসূয়া গভীর আনন্দে বললেন—তোমার জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত শ্রবণ করে আমি এত আনন্দিত যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে অক্ষম।

ক্ষণিক নীরব থেকে সতী অনসূয়া পুনরায় বললেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ঋষি কুমারগণ কলসপূর্ণ জল সংগ্রহ করে সিক্তবসনে আপন আপন গৃহাভিমুখে চলেছে। পক্ষী কলরব করতে করতে আপন নীড়ে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। তুমি এই দিব্য আভরণ আমার সম্মুখে পরিধান করে স্বামীর কক্ষে গমন করে রাত্রিযাপন কর। অনসূয়ার পর্ণকুটিরে তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি মধুময় হয়ে উঠুক।

সলজ্জ ভঙ্গীতে সীতা সমস্ত আভরণ পরিধান করলেন, তারপর ধীর-কম্পিত পদে রামের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

সুরকন্যার ন্যায় রূপবতী সীতা বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে যখন রামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হলেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র।

বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীরামচন্দ্র, তারপর ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে অর্গলদ্বার বন্ধ করে দিলেন।

পরদিন প্রভাতে অত্রি-অনসূয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করে দক্ষিণাঞ্চলের পথে অগ্রসর হলেন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ। দক্ষিণাবর্তের উত্তরপ্রান্তে গভীর অরণ্য বেষ্টিত দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্য পর্বতমালা পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত এবং ভৌগোলিকভাবে ভরতকে উত্তরাঞ্চল থেকে বিছিন্ন করছে।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বললেন—বর্তমানে আমরা দণ্ডকারণ্যের প্রান্তদেশে উপনীত। আমাদের এই গভীর অরণ্য ও পর্বতাঞ্চল অতিক্রম করে আরও দক্ষিণদেশে যাত্রা করতে হবে। দণ্ডকারণ্যের পর্বতমালার নাম বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। এই রাজ্যে অনার্য জাতি বাস করেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কাদ্বীপ অবস্থিত এবং সেখানেই পৌলস্ত্যবংশজাত মহাবীর রাবণের রাজত্ব। রাবণ মহাজ্ঞানী। বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতিতে, যুদ্ধশাস্ত্রে এমন পারদর্শী যে সাধারণ মানুষের ধারণা, তাঁর দশমুণ্ড বর্তমান এবং বিংশতি হস্তদ্বারা দশদিক পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এত তীক্ষ্নবুদ্ধিসপন্ন যে একই মুণ্ডতে দশমুণ্ডের কাজ করে থাকেন।

শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করতে করতে তিনজনে দন্ডকারণ্যের গভীর অরণ্যপথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। শ্রীরাম লক্ষ্য করলেন বনের মধ্যে পায়ে চলা হাঁটাপথের চিহ্নও কোথাও নাই। সমস্ত অঞ্চল গভীর অরণ্যে বেষ্টিত।

শ্রীরাম চিন্তিত হয়ে বললেন—এ দিকে কোন জনপদ নাই। গভীর অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলে আমরা প্রবেশ করেছি। একমাত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ব্যতিরেকে পূর্ব পশ্চিম স্থিরীকৃত করা সম্ভব নয়। অতএব আমাদের খুব সাবধানে পথ চলতে হবে, পথের বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি ঘটলে আমরা অরণ্যে সম্পূর্ণভাবে পথভ্রষ্ট হব এবং কোনদিন আর এই অরণ্য হতে নির্গত হতে পারব না।

অকস্মাৎ এক বিকট চিৎকারে তিনজনেই ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এক ভয়ংকর জান্তব চিৎকার।

শ্রীরামচন্দ্র সর্বাগ্রে। তাঁর পশ্চাতে সীতা এবং সর্ব পশ্চাতে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ প্রস্তুত করে অচেনা অদেখা শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

অরণ্যের লতাগুল্ম ভেদ করে অচিরেই সম্মুখীন হলেন এক বিরাটকায় পুরুষ। বিভিন্ন প্রকার বর্মে আচ্ছাদিত তাঁর দেহ এবং বর্মের জন্যেই তাঁকে কিম্ভূতকিমাকার লাগছে।

সেই বিরাটকায় পুরুষ হুংকার করে প্রশ্ন করলেন—তোমরা কে? সন্ন্যাসীর বেশ অথচ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। পরনারীও সংগে বর্তমান দেখছি। তোমরা এ স্থানে কি চাও?

আপন পরিচয় জ্ঞাপন করে শ্রীরাম প্রশ্ন করলেন—আপনি কে?

- আমি বিরাধরাজ। এই অঞ্চলের প্রধান।

বিরাধরাজ কথা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই অকস্মাৎ ক্ষিপ্রগতিতে সীতাকে অপহরণ করে নিজ বাহুমূলে বেষ্টন করে বললেন—প্রতি রাত্রে আমার একটি নূতন নারীসংগ অত্যাবশ্যক। আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সুরকন্যা সম এক রমণী আমার করায়ত্ত। তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ কর, কারণ আমি নরমাংস ভোজন করে থাকি। তোমাদের ন্যায় সুকোমলকান্তি অবলোকন করে আমার লোভ হচ্ছে, এর পর আর হয়ত আমি লোভ সম্বরণ করতে পারব না।

ধনুতে শর যোজনা করে শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললেন—তুমি পরনারী হরণ করেছ, তোমার মৃত্যু আসন্ন। মুহূর্তমধ্যে শ্রীরাম তীক্ষ্ম শরক্ষেপণ করলেন।

তীক্ষ্ম শর বিরাধের বর্মে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিক্ষিপ্ত ভাবে রামের নিকটেই ফিরে এল। বিরাধের বর্মভেদ হল না।

উচ্চকণ্ঠে বিরাধ হাস্য করে বললেন—এ বর্ম মহারাজ রাবণ তৈরী করে আমাকে দান করেছেন। এ বর্ম ভেদ করার সাধ্য অযোধ্যার রাজপুত্র বা ভারতবর্ষের কোন রাজারই নাই। তোমরা এখন বিদায় নাও, না হলে তোমাদের আমি বধ করব।

বিরাধের বাহুমধ্যে ভীতা, সংকুচিতা, শংকিতা সীতাদেবী বেতসী লতার ন্যায় কম্পিতা এবং ক্রন্দনরতা।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে মল্লযুদ্ধের প্রয়োজন। ওই বিরাটকায় বর্ম আবরণ নিয়ে ও বেশিক্ষণ যুদ্ধ করতে পারবে না। চল আমরা ওকে সুযোগ দেবার পূর্বেই ওর উপর আক্রমণ করি।

বিদ্যুৎবেগে দুই ভ্রাতা বিরাধকে আক্রমণ করলেন। বিরাধ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীরাম দক্ষিণহস্ত, এবং লক্ষ্মণ বিরাধের বাম হস্ত মুহূর্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

সীতাদেবী মুক্ত হয়ে এক বৃক্ষতলে জ্ঞানলুপ্তা হয়ে, ভূপতিতা হলেন।

যন্ত্রণায় কাতর চিৎকার করতে করতে বিরাধ মাটিতে পড়ে গেলেন আর সেই মুহূর্তে রাম তাঁর গলায় পদক্ষেপণ করে চাপ দিলেন। বিরাধের কণ্ঠে বর্ম আচ্ছাদন ছিল না। রামের পদপেষণে ক্রমশঃ তাঁর শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে কাতরোক্তি করলেন—আমাকে তোমরা মুক্তি দাও।

—না। বজ্রগম্ভীর স্বরে শ্রীরাম উত্তরদান করলেন—তুমি পরনারী হরণ করেছ অসৎ উদ্দেশে। তোমার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। শ্রীরামের বলিষ্ঠ পদপেষণে বিরাধ অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বললেন—এসো ভাই, আমরা মাটি খনন করে একটি গর্ত করি, তারপর এই বিরাধরাজকে সমাধিস্থ করে লোকালয়ের অন্বেষণ করব। এই মৃতদেহ এই ভাবে রক্ষিত হলে কাক শকুনে ভক্ষণ করবে। শত হোক উনি এই অঞ্চলের প্রধান ছিলেন।

দুই ভ্রাতা বিরাধরাজকে সমাধিস্থ করে, সীতার নিকটে উপস্থিত হলেন। সীতার ভয় তখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। বেতসী লতার ন্যায় থরথর কম্পিতা সীতাদেবী শ্রীরামের অঙ্কে আপন মস্তক স্থাপন করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—আর্য, আমাকে এই অরণ্যাঞ্চল থেকে কোন লোকালয়ে নিয়ে চলুন।

—তুমি পদব্রজে যাত্রা করতে পারবে, না তোমাকে অঙ্কে ধারণ করব?

লজ্জিতা সীতাদেবী দণ্ডায়মান হয়ে বললেন—না, না আমি পদব্রজেই যাত্রা করতে পারব।

তিনজনে লোকালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দুপাশে সুউচ্চ গিরিমালা, মধ্যে নিম্নদেশে সংকীর্ণ গিরিপথ। দুপাশের উচ্চ তৃণ গিরিমালা প্রকৃতির জঙ্ঘাদেশের সঙ্গে তুলনীয়। প্রকৃতি যেন অলস ভঙ্গিতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে শয়ন করে মহাকাশের সঙ্গে রতিসম্ভোগে বিবশ বিহ্বলা।

সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে তিনজনে পদব্রজে বহুদূর গেলেন। একসময় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্য করলেন গিরিপথের পার্শ্বে এক ঝরনাধারা এবং সেস্থানে মনুষ্য পদচিহ্ন।

—এখন আমরা লোকালয়ের নিকটে এসেছি।

শ্রীরামের বাক্যে লক্ষ্মণ এবং সীতা উভয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় বললেন—এই ঝরনাধারা হতে লোকালয়ের জনগণ পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকেন। এই দেখ পদচিহ্ন। এই পদচিহ্ন অনুসরণ করলেই আমরা কোন লোকালয়ে উপস্থিত হব।

সত্যই অল্পক্ষণ পরে তাঁরা এক মনোরম তপোবনের প্রান্তে উপস্থিত হলেন। এক ঋষি কুমারকে প্রশ্ন করে রাম জ্ঞাত হলেন এই আশ্রম ঋষি শরভঙ্গের।

—আমরা মহর্ষি শরভঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। শ্রীরাম বললেন।

—আপনাদের পরিচয় ?

নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—যদি দয়া করে সত্বর সংবাদ প্রদান কর বাধিত হব।

ঋষিবালক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করার অল্পক্ষণ পরেই শরভঙ্গ ও বৈখানস ঋষি উপস্থিত হয়ে বললেন—সুস্বাগতম। আপনাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। আমাদেরও আপনাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ পথশ্রমে আপনারা ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন। আগামীকল্য আলোচনা হবে।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ তিনজনে ঋষিদ্বয়ের পশ্চাতে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের জন্য নির্ধারিত কুটিরে বিশ্রামের নিমিত্ত গমন করলেন।

সেই রাত্রেই অকস্মাৎ ঋষি শরভঙ্গ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

ঋষির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল প্রভৃতি বহু ঋষি সমবেত ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাম বিস্মিত হয়ে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। বৈখানস বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—মহাবীর রাম। সূর্যের ন্যায় তুমি আমাদের সম্মুখে উদয় হয়েছ। তোমার নিকট আমাদের কিছু নিবেদন আছে।

—নির্দ্বিধায় এবং নির্ভয়ে আপনারা বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারেন।

বৈখানস ধীরকণ্ঠে বললেন—তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান। তোমার বীরত্ব এবং যশ ত্রিলোকখ্যাত। আমরা প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে যা ব্যক্ত করছি, তার জন্য ক্ষমা কর। যে রাজা প্রজারক্ষা করেন না, অথচ প্রজাদের নিকট থেকে নিয়মিত করভাগ নেন, তাঁর মহা অধর্ম হয়। যিনি প্রজাগণকে নিজপ্রাণের তুল্য বা প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য দেখেন, তিনি চিরস্থায়ী কীর্তি ও স্বর্গ লাভ করেন। প্রজার করভাগ যেমন রাজার প্রাপ্য, প্রজাগণের শান্তি, স্বস্তি ও পুণ্যলাভের চতুর্ভাগও রাজার প্রাপ্য।

এই অরণ্যে বহু ঋষি আছেন এবং জনপদ আছে। বহু বাণপ্রস্থ অবলম্বনকারী ব্যক্তিও এখানে বাস করেন। এই সব নিরীহ প্রজাগণ রাবণের চর অনুচরের হস্তে নিরন্তর অত্যাচারিত হচ্ছেন। পম্পা ও মন্দাকিনী তীরে এবং চিত্রকূটে রাবণপ্রেরিত

দুরাত্মাগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন করছে। বহু ব্রাহ্মণ নিহত হচ্ছেন। আজ আমরা অসহনীয় অবস্থায় উপনীত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তুমি আমাদের রক্ষা কর।

রাম স্থির মস্তিস্কে সকলের কথা শুনলেন, তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন—এ কথা যদিও সত্য যে আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস গ্রহণ করেছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার অপর একটি ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা আছে। আমি সমগ্র ভারত-বর্ষে এক অখন্ড শান্তিপূর্ণ রাজ্য স্থাপন করব যে রাজ্যে কোন প্রজার দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য বিরাজ করবে না। সকলেই নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে আপন আপন জীবিকা অনুসারে বসবাস করতে পারবেন। আমার রাজত্ব বিস্তৃত হবে আসমুদ্রহিমাচল। আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদান করুন, আপনাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমি বহন করব। আমিও জ্ঞাত আছি, রাবণের চর অনুচরেরা নিয়মিত ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে অশান্তির সৃষ্টি করছে। শুধু দন্ডকারণ্যে নয়, উত্তর ভারতেও বহু স্থানে ওরা নিয়মিত অত্যাচার ও ব্যভিচার করে চলেছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে মারীচ ও সুবাহু উদ্যত হয়েছিল, আমি সুবাহুকে বধ করেছি, এবং মারীচ আহত হয়ে পলায়ন করেছে।

আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি যতদিন বর্তমান থাকব, ততদিন আপনাদের কেউ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

—সাধু সাধু—সকলে একত্রে শ্রীরামের জয়গান করে উঠলেন।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করলেন—এই অঞ্চলে অবাসযোগ্য একটি তপোবনের সন্ধান দিতে পারেন, যে স্থানে আমরা বসবাস করতে পারি?

বৈখানস উত্তর দিলেন—এই তপোবনের অদূরে সুতীক্ষ্ন ঋষির তপোবন বিদ্যমান। সেই তপোবন অতি মনোরম। আপনারা পরম আরামে সেই তপোবনে দিনাতিপাত করে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।

হৃষ্ট মনে শ্রীরাম সকলকে বিদায় দান করে, সুতীক্ষ্ন ঋষির আশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করলেন সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে।

কয়েকটি বন উপবন অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা সুতীক্ষ্নের আশ্রম উপবনে উপস্থিত হলেন। অতি মনোরম উপবন। চারদিকে পুষ্পবৃক্ষ ও লতাগুল্ম। তারই মধ্যে মৃগশিশুরা নির্ভয়ে বিচরণ করছে। অপরিচিত পদশব্দে তারা ভীত সন্ত্রস্ত। ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। সীতা বালিকার ন্যায় মৃগশিশুদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে উঠলেন।

শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্যে সীতার চাপল্য লক্ষ্য করলেন, তারপর লক্ষ্মণের সঙ্গে সুতীক্ষ্ন মুনির সাক্ষাৎ করার প্রয়াসে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করলেন।

রামচন্দ্রের আগমনবার্তা শ্রবণ করে সুতীক্ষ্ন মুনি তৎক্ষণাৎ আশ্রমকক্ষ হতে নির্গত হয়ে রামকে আলিঙ্গন করলেন।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মুনিকে প্রণাম করলেন। প্রাথমিক আপ্যায়নের পর সুতীক্ষ্ণ মুনি বললেন—তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে চিত্রকূট পর্বতে বাস করছ এ সংবাদ আমি শ্রবণ করেছি। তুমি যখন এই দুর্গম দণ্ডকারণ্যে এসেছ, তখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বিভিন্ন ঋষিমুখে রাবণের চর অনুচরদের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করেছ। তোমার বীরত্বকে রাবণ ভয় করে। তুমি এ স্থানে বাস করছ শুনলে এ অঞ্চলে তার অনুচরবর্গকে সাবধান করে দেবে এবং এ অঞ্চলের মানুষ নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবে।

রাম বিনতচিত্তে উত্তরদান করলেন—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ, আমি ঋষিদের আশ্বস্ত করে বলেছি, আমি যথাসাধ্য তাঁদের রক্ষা করব।

—সাধু, সাধু—সুতীক্ষ্ণদেব আশীর্বাদ ভঙ্গীতে বললেন—ইক্ষ্বাকুকুলগৌরব শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য উত্তরই তুমি দিয়েছ বৎস। আমার আশ্রম অতি প্রশস্ত ও মনোরম। যতদিন ইচ্ছা তোমরা এ স্থানে বাস করতে পার।'

শ্রীরামচন্দ্র বিনীতভাবে উত্তরদান করলেন—মহর্ষি, ক্ষমা করবেন। আমরা এ স্থানে বাস করতে পারব না।

চিন্তিতভাবে ঋষি সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন—কেন?

—আপনার আশ্রম তপোবন, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত। এ স্থানে মৃগশিশুরা নির্ভয়ে খেলা করে। আমাদের রক্তে ক্ষত্রিয়-সুলভ ইচ্ছা প্রবাহিত। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন মৃগশিশুকে আমি খেলার ছলে বধ করতে পারি, তাতে আপনিও ব্যথিত হবেন, আমারও পাপ বৃদ্ধি হবে।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ ধীরকণ্ঠে মন্তব্য করলেন—এরূপ ধীমান, ন্যায়বান, বীর ক্ষত্রিয়পুত্র আমি কখনও দেখি নি। বেশ, তোমরা আজ রাত্রে আমার আশ্রমে বিশ্রাম করে, তোমাদের সুবিধা অনুসারে অন্য আশ্রমে বসতি স্থাপন কর।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ ঋষিকে প্রণাম করলেন।

পরদিন প্রভাতে পদ্মগন্ধী জলে স্নান করে, ফলমূল আহার করে, শ্রীরামচন্দ্র বললেন—এ স্থানে কোথায় অগস্ত্যমুনির আশ্রম আছে? আমি একবার সেই আশ্রম পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক।

সুতীক্ষ্ণ ঋষি পথনির্দেশ দিয়ে বললেন—ওই যে দক্ষিণের পর্বতমালা। ওই পর্বতের দক্ষিণে অগস্ত্যমুনির আশ্রম। এখন ওই স্থানে অগস্ত্যমুনির ভ্রাতা বাস করেন। তুমি জ্ঞাত আছ কি না জানি না, বাতাপি এবং ইল্বল নামে রাবণের দুই অনুচরকে বধ করে অগস্ত্যমুনি প্রথম ঋষিদের বসতি স্থাপিত করেন।

—তাহলে অনুমতি দান করুন। রৌদ্র প্রখর হবার পূর্বেই আমরা যাত্রা করি।

—তোমাদের মঙ্গল হোক।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ অগস্ত্যমুনির আশ্রমাভিমুখে

যাত্রা করলেন। পথের মধ্যে তিনজনে নানারূপ কথোপকথন করছিলেন, এক সময়ে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন--আর্য, আমার একটি নিবেদন আছে।

—নিবেদন কর। শ্রীরাম উত্তরদান করলেন।

সীতাদেবী বললেন—মিথ্যাকথন, পরদারগমন ও অকারণে ক্রোধ ও হিংস্রতা এই তিন কামজ ব্যসন থেকে লোকে অধর্মগ্রস্ত হয়। রাঘব, তোমার প্রথম দুই দোষ পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছি তৃতীয় কারণে। তুমি মুনি ঋষিদের নিরাপদে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তার অর্থ তুমি অবিরাম যুদ্ধ করবে, হিংসার আশ্রয় নেবে এবং হিংস্র হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি তোমার পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হয়েছ, চর্তুদশবর্ষ অহিংসভাবে ফলমূল আহার করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করবে।

—শ্রীরাম ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে রইলেন, তারপর সীতাকে বললেন—এসো, এই বৃক্ষতলে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করি এবং তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করি।

তিনজনে এক বটবৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করলেন। সীতা মৃদু হাস্যে রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। শ্রীরাম মৃদু প্রশ্ন করলেন—'অহিংসা' শব্দের সংজ্ঞা কি?

—যিনি হিংসার আশ্রয় নেন না—

—না। এ ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। এ ব্যাখ্যা দুর্বলের।

রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করে সীতাদেবী মন্তব্য করলেন—'সবলের' ব্যাখ্যা কি?

—শুধু সবল নয়, এ ব্যাখ্যা সকলের।

—আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমরা ধন্য হই। সীতাদেবী হাসির হিল্লোল তুলে বললেন।

—তুমি বিদ্রূপ করছ?

—না, না, আপনাকে বিদ্রূপ করার সাহস কোথায়? আমরা আপনার নিকট হতে প্রকৃত অহিংসা ধর্মের ব্যাখ্যা অবগত হতে চাই—সভয়ে উক্তি করলেন সীতাদেবী।

শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—ব্যাখ্যার পূর্বে আমি একটি দৃষ্টান্ত দান করি। তোমাকে যখন বিরাধরাজ অপহরণ করে নিয়ে পলায়ন করছিল, তখন যদি আমরা অহিংসা পথ অবলম্বন করতাম, তাহলে তোমার কি অবস্থা হত?

এ প্রশ্নের উত্তরদান করতে পারলেন না সীতাদেবী। নিঃশব্দে নতমুখে উপবিষ্টা রইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ধীরভাবে বলতে লাগলেন—অহেতুক হিংসা প্রকাশ করা পাপ, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় নিলে পাপ হয় না, তাকে হিংসা বলে না। আমি অকারণে বিনাদোষে রাবণের একটি অনুচরকেও হত্যা করিনি। তারা নিরীহ প্রজাগণের উপর, মুনি ঋষিগণের উপর অকারণে অত্যাচার করেছে, এই অত্যাচার বন্ধ

না করে আমি যদি অহিংসভাবে দিনাতিপাত করি, তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক আমাকে বলবে ভীরু কাপুরুষ। আমি যদি অকারণে বিনাদোষে কোন মানুষকে বধ করতাম, তাহলে আমাকে হিংস্র বলবার অধিকার তোমার ছিল।

. আর্যে, যে ক্ষত্রিয়ের রাজত্বে 'আর্ত' বর্তমান, সে ক্ষত্রিয় ব্যর্থ ক্ষত্রিয়। আর্তভাবে কেউ কোন কথা উচ্চারণ করবে না এবং যদি কেউ আর্তভাবে সাহায্য ভিক্ষা করে, তাকে সাহায্য করাই হল ক্ষাত্রধর্ম। আমি ঋষিগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি রাবণের অনুচরগণ অথবা কোন দুরাত্মা যদি ঋষিগণ অথবা সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপর অকারণ উৎপীড়ন করে, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে বধ করে অথবা বিতাড়িত করে শান্তি স্থাপন করব। আমি ঋষিগণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি তাঁদের রক্ষা করবই। তার জন্য যদি তোমাকে বা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করতে হয়, আমি প্রস্তুত।

রামের গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ শ্রবণে, সীতার হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠল এবং সভয়ে উত্তর দিলেন—রাঘব, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে বাধা দেব না, তুমিও আমাদের করবে না প্রতিশ্রুতি দাও।

সহাস্যে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন—তোমরা কেবল আমার আশ্রিত নও, আমার প্রাণসম প্রিয়। আমি আত্মত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তোমাদের ত্যাগ করতে পারি না।

লক্ষ্মণ এতক্ষণে কথা বলল—জ্যেষ্ঠ। আপনাদের আলোচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করলাম। এখন আমাদের পুনরায় যাত্রা করতে হবে। এ সময়ে যদি যাত্রারম্ভ না করা যায় তাহলে পঞ্চবটী তপোবনে সন্ধ্যার পূর্বে কিছুতেই পৌঁছাতে পারব না।

– লক্ষ্মণ যথার্থ কথা বলেছে। চল, এবার আমরা যাত্রারম্ভ করি।

সীতাদেবী গাত্রোত্থান করলেন। তিনজনে পুনরায় পঞ্চবটী বনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সম্মুখে শ্রীরাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ।

বনপথ অতিক্রম করে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে তিনজনে সমতল তৃণভূমির মধ্যে প্রবেশ করলেন। তৃণাচ্ছাদিত প্রস্তরভূমির দক্ষিণভাগে পঞ্চবটী তপোবন। তপোবনের দক্ষিণে পুণ্যতোয়া গোদাবরী প্রবাহিত। গোদাবরীকে প্রণাম করে শ্রীরাম বললেন—উত্তর ভারতে জাহ্নবী যমুনা যেরূপ পূজনীয়া, দক্ষিণ ভারতে তেমনি গোদাবরী পূজনীয়া। তোমরা প্রণাম কর।

তিনজনে দূর হতে গোদাবরীকে প্রণাম করলেন এবং তৃণাচ্ছাদিত পথ ধরে পঞ্চবটীর দিকে যাত্রা করলেন।

তৃণভূমির মধ্যস্থানে যখন রাম সীতা-লক্ষ্মণ উপস্থিত, তখন, আকাশ হতে এক বিরাট পক্ষীসদৃশ পুষ্পকরথ তৃণভূমিতে অবতরণ করল। তিনজনেই সেই দিকে বিস্মিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলেন। শ্রীরাম দেখলেন পক্ষী-পুষ্পকরথের ডানা দুটি

শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং একটি ছোট দ্বার উদ্ঘাটিত হল। সেই দ্বারের মধ্য থেকে উপস্থিত হলেন এক বর্ষীয়ান রাজপুরুষ।

শ্রীরাম বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে শত্রুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করলেন।

রাজপুরুষ তাঁর নিজের হস্ত উত্তোলিত করে, রামকে বাণনিক্ষেপে নিষেধ করলেন এবং অচিরেই রাজপুরুষ সন্নিকটবর্তী হলেন।

রাম তখনও সেই অপরিচিত রাজপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছেন।

রাজপুরুষ আর বিলম্ব না করে আপন পরিচয় দান করলেন—আমার নাম জটায়ু। আমি তোমার পিতার বয়স্য। আমি তোমাদের আকাশপথে বিচরণ করতে করতে লক্ষ্য করেছি। তোমরা এক্ষণে কোথায় চলেছ?

সসম্মান অভিবাদন করে রাম বললেন—আমরা স্থির করেছি বর্তমানে আমরা পঞ্চবটী বনে বাস করব।

—অতি উত্তম কথা। আমি মাঝে মধ্যে সংবাদ নিয়ে যাব এবং প্রয়োজনে সাহায্য করব।

—আপনার বদান্যতায় আমরা ধন্য। বর্তমানে কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

—উত্তম কথা। তোমরা যাত্রা কর কারণ এখনই যদি যাত্রা না কর, তাহলে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

জটায়ু কথাগুলি ব্যক্ত করে বিদায় নিলেন এবং রাম-সীতা-লক্ষ্মণ পঞ্চবটী তপোবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ পঞ্চবটীতে পেঁছে গোদাবরী নদীর সন্নিকটে একটি অতি মনোরম স্থান চিহ্নিত করে, পর্ণকুটির নির্মাণ করার প্রস্তাব করলেন।

স্থানটি সমতল, চতুর্দিক পুষ্পবৃক্ষবেষ্টিত, অধিকাংশই সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ। অদূরে একটি মনোরম সরোবর। সরোবর তীরে ময়ূর-ময়ূরী, হংস-হংসী, মৃগ-মৃগী মনের আনন্দে বিচরণ করছে। পুষ্পসৌগন্ধে সমগ্র স্থান সুরভিত।

রাম, লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন—লক্ষ্মণ, এই স্থানে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বনবাসের শেষ চার বৎসর যাপন করব।

সীতা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের বনবাস জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। আমি প্রতিদিন গণনা করে রেখেছি, আর মাত্র চার বৎসরের মধ্যে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করব। ভারতবর্ষব্যাপী এক অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করব। আসমুদ্রহিমাচল প্রত্যেক মানুষই

বলবে আমি ভারতবাসী। প্রত্যেকের দুঃখে প্রত্যেকে সাহায্য করবে, প্রত্যেকের সুখে প্রত্যেকে আনন্দিত হয়ে উঠবে।

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা একত্রিত হয়ে মাটি, বড় বড় বাঁশ, শমীশাখা, কুশ, কাশ, মৃত্তিকা প্রভৃতি দিয়ে এক বিরাট পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। সম্মুখের কক্ষটি বড়। সম্মুখের কক্ষ লক্ষ্মণের জন্য, পশ্চাতের কক্ষ রাম-সীতার। উভয় কক্ষের মধ্যে একমাত্র দ্বারসংযোগ। এই দ্বার ব্যতিরেকে রাম, লক্ষ্মণের কক্ষে কয়েকটি বাতায়ন সৃষ্টি করলেন। কোনটি উন্মুক্ত করলে পুণ্যসলিলা গোদাবরী দর্শন কর যায়, কোনটি উন্মুক্ত করলে বনের পশুপক্ষীদের নির্ভয় নিত্য চোখে পড়ে। রাম লক্ষ্মণ পর্ণকুটির নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে গোদাবরীর জলে স্নান এবং তৎপরে পূজা-অর্চনা সমাপন করে গৃহপ্রবেশ করলেন। সীতা আপন শিল্পকলাবিদ্যায় পর্ণশালার অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত সুচারুরূপে সুসজ্জিত করলেন। রাম-লক্ষ্মণ যখন বনে মৃগয়ার জন্য প্রবেশ করতেন, তখন সীতাদেবী বাতায়ন পার্শ্বে উপবিষ্টা হয়ে শিখীসহ শিখিনীর নৃত্য পরিদর্শন করে কালাতিপাত করতেন।

একদিন হেমন্তকালের এক প্রভাতে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করে, প্রাত্যহিক পানীয় জল-কলস পূর্ণ করে পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করলেন। লক্ষ্মণ জলপূর্ণ কলস রন্ধনশালার নিকট রক্ষিত করে, কুটিরের সম্মুখে বসে রামের সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন। সীতাদেবী রন্ধনশালায় দুই ভ্রাতার জন্য প্রভাতিক আহারের ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় সালঙ্কারা অতি সুন্দরী এক রমণী তথায় উপস্থিত হলেন।

রমণী শ্রীরামের নিকটে এসে দুই চক্ষে কটাক্ষ হিল্লোল তুলে সুমিষ্ট ও সুচতুর কণ্ঠে বললেন—পূর্বে আমার পরিচয় দান করা কর্তব্য। আমার নাম শূর্পনখা। নিবাস স্বর্ণলঙ্কায়। আমার ভ্রাতা মহাবীর রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, খর ও দূষণ। মহাবীর রাবণ লঙ্কার রাজা, খর ও দূষণ অদূরেই রাজত্ব করেন। আমি তোমাদের অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি। কিন্তু আজ হেমন্তকালের প্রভাতে আপন কাম প্রেরণাকে দমন করতে অপারগ হয়ে তোমাদের শরণার্থী হয়েছি।

সহাস্যে রাম উত্তরদান করলেন—আমরা কি প্রকারে সাহায্য করতে পারি?

শ্রীরামের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, শূর্পনখা বললেন—তুমি আমার কামজ উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করতে পার। আমি বহু পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কিন্তু তোমার ন্যায় কান্তিমান সুপুরুষ কখনও গোচরীভূত হয় নাই। তুমি আমাকে বিবাহ কর, তারপর দুজনে লঙ্কায় যাত্রা করে সুখে সংসার করব।

রাম কৌতুকের ভঙ্গীতে উত্তরদান করলেন—আমি বিবাহিত। সঙ্গে আমার ভার্যা বর্তমান। এ অবস্থায় তোমাকে কিভাবে বিবাহ করি?

শূর্পনখা লজ্জাহীন কণ্ঠে বললেন—এ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। তুমি

অনুমতি দান করলে আমি এই মুহূর্তে তোমার পত্নীকে বধ করে, আমাদের পথ নিষ্কন্টক করি।

—না। আমি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। তুমি বাসনা পরিত্যাগ করে বিদায় নাও।

—না। রাবণরাজ ভগ্নী শূর্পনখার বাসনা কখনই বিফলে যায় নি। আমার ইচ্ছা পূরণ না করে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব না।

রাম সকৌতুকে বললেন—তাহলে এক কাজ কর। আমার অনুজ লক্ষ্মণকে প্রস্তাব দান করে, তার অনুমতি গ্রহণ করে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পার। লক্ষ্মণ যদি সম্মত হয় আমি বাধা দেব না।

শূর্পনখা লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন লক্ষ্মণও অতি সুপুরুষ এবং বলবান। শূর্পনখার ক্ষণিকের জন্য মনে হল, লক্ষ্মণ বোধহয় শ্রীরাম অপেক্ষাও অধিক সুন্দর। শূর্পনখা লক্ষ্মণের সম্মুখীন হয়ে নির্লজ্জভাবে একইভাবে কাম নিবেদন করলেন।

লক্ষ্মণ চিরকালই উগ্র স্বভাবের। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে এইরূপ নির্লজ্জ প্রস্তাব শ্রবণ করে লক্ষ্মণের মন লজ্জায় ঘৃণায় এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। ক্ষণিকের মধ্যে রামকে বিমূঢ় করে লক্ষ্মণ খড়্গ দ্বারা শূর্পনখার নাসিকার অগ্রভাগ এবং কর্ণদ্বয় কর্তন করে বললেন—এই যন্ত্রণায় তোমার কামজ উন্মাদনা প্রশমিত হবে।

অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে শূর্পনখা ক্রন্দন করতে করতে বললেন—আমি শূর্পনখা, লংকাপতি রাবণের ভগ্নী। আমি এর প্রতিশোধ যে ভাবে হোক গ্রহণ করব। এ অপমান আমি জীবনেও বিস্মৃত হব না।

শূর্পনখা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করতে করতে স্থান ত্যাগ করলেন। রাম লক্ষ্মণকে বললেন—এ তুমি কী করলে? নারীকে আঘাত করলে?

—যে নারী কুপ্রস্তাব নিয়ে আসে, সে নারীকে হত্যা করলেও পাপ হয় না।

—এ তোমার ভ্রান্ত ধারণা। কোন অবস্থাতেই নারী নির্যাতনের অধিকার পুরুষের নেই। এই সামান্য কৌতুকে এতবড় শাস্তি দেওয়া তোমার অপরাধ হয়েছে।

—আমাকে মার্জনা করুন। আর কোনদিন এরূপ অন্যায় কর্ম সাধিত হবে না।

সীতাদেবী প্রাভাতিক আহারের জন্য দুই ভ্রাতাকে আহ্বান করতে এসেছিলেন, কিন্তু সমস্ত দৃশ্য অবলোকন করে প্রস্তরবৎ নিশ্চলরূপে দণ্ডায়মানা হয়ে রইলেন দ্বারের সম্মুখে।

চৌদ্দ

পঞ্চবটীর অদূরে জনস্থানে রাবণের মাতৃস্বসা-পুত্র খর ও দূষণ উপনিবেশ তৈরী করে বসবাস করছিলেন। তাঁদের শক্তির নিকট স্থানীয় রাজন্যবর্গ পরাজিত হয়ে, সে স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁরা বাধা দিতে এসেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং যাঁরা খর ও দূষণকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁরা দাসের ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রক্তাপ্লুত অবস্থায় শূর্পনখা খর ও দূষণের রাজসভায় প্রবেশ করে, ভূপতিতা হয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন।

খর সিংহাসন থেকে অবতরণ করে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—ভগ্নী, তোমার এ অবস্থা কে করেছে?

ভূমিতলে উপবিষ্ট হয়ে সক্রন্দনে শূর্পনখা বললেন—অদূরে গোদাবরী তীরে এক আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাস করে। আমি লক্ষ্মণের নিকট কামজ প্রস্তাব উত্থাপন করাতে, লক্ষ্মণ আমার এই অবস্থা করেছে। আমি রাম-সীতা-লক্ষ্মণের রুধির পান করব, তবে আমার তৃপ্তিসাধন হবে।

খর ও দূষণের আদেশে পাঁচ হাজার সৈন্য সেই মুহূর্তে পঞ্চবটীর উদ্দেশে যাত্রা করল।

পঞ্চবটীর পর্ণশালা থেকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ বনান্তরালের উচ্চস্থান থেকে লক্ষ্য করলেন বহু সৈন্য তাদের পর্ণশালার দিকে ছুটে আসছে।

রাম লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বললেন—লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে পর্বতের গুহামধ্যে আত্মগোপন কর। আমি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।

লক্ষ্মণ রামের আদেশ পালন করলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যখন গুহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র পর্ণশালার অদূরে এক উচ্চস্থানে উঠে শত্রুদের লক্ষ্য করলেন। রাম লক্ষ্য করে দেখলেন, সৈন্যদলের সম্মুখভাগে রক্তাক্ত শূর্পনখা।

রাম বুঝতে পারলেন, শূর্পনখাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্য প্রত্যাবর্তন করেছে। শূর্পনখা দূর হতে রামকে দেখিয়ে কিছু বললেন।

আগন্তুক সৈন্যগণ রামকে লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ শুরু করল। শ্রীরাম মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত শরগুলি খন্ডন করে, বিদ্যুৎবেগে প্রতিক্ষেপণ আরম্ভ করলেন। শ্রীরাম এত দ্রুত তীরক্ষেপণ শুরু করলেন যে বিপরীত দিক থেকে সৈন্যগণ তীর সংযোজন করার

পূর্বেই নিহত হয়ে ভূতলশায়ী হল। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত সৈন্য নিহত হয়ে গেল। কেবলমাত্র শূর্পনখা জীবিতা। শূর্পনখা নারী বলে, তাকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দিয়ে শ্রীরাম বললেন—শূর্পনখা! তুমি নারী বলে তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি তোমার রাজ্যে গমন করে সকলকে এ-সংবাদ জ্ঞাত কর।

শূর্পনখা সভয়ে পলায়ন করলেন এবং জনস্থানে উপস্থিত হয়ে খরকে সংবাদ দিলেন—রামের নিকট সমস্ত সৈন্য পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, এমন কি দূষণও পরাস্ত ও নিহত।

দূষণ প্রভৃতির নিধনসংবাদ শ্রবণ করে খর আরও দ্বাদশ সেনাপতিকে সসৈন্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু একজনও প্রত্যাগমন করল না। কেবল খর ও সেনাপতি ত্রিশিরা জীবিত রইলেন।

খর যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে ত্রিশিরা বললেন—আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, রামকে নিধন করব। যদি রামের মৃত্যু ঘটে, আপনি হৃষ্টচিত্তে জনস্থানে ফিরে আসবেন, আর যদি আমার মৃত্যু ঘটে, আপনি স্বয়ং যুদ্ধ করবেন, কেউ আপনাকে নিষেধ করছে না, কিন্তু আমাকে একবার রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করুন। তিনি কত বড় বীর আমার একবার দেখবার সাধ হয়েছে।

—বেশ। তাই কর।

খরের অনুমতি লাভ করে ত্রিশিরা উজ্জ্বল রথে চড়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রাম অনুভব কবলেন, ত্রিশিরার শরগুলি অত্যন্ত পুরাতন এবং এর আঘাতে কোন মানুষের মৃত্যু হয় না, তা ছাড়া ওর নিশানাও অত্যন্ত অপটু। দশ-বারোটি বাণ ক্ষেপণ করলে একটি হয়ত সেই লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঘাত করে। রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ শরে ত্রিশিরার রথের অশ্বকে বধ করলেন, চাকাগুলি বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, ফলে ত্রিশিরার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল এবং ত্রিশিরা বিস্মিত, বিমূঢ় ও ভীত হয়ে পড়লেন।

রামচন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। সুতীক্ষ্ণ শরে ত্রিশিরার শিরচ্ছেদন করে দিলেন।

দূষণ ও ত্রিশিরার মৃত্যুতে খর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি নারাচ প্রভৃতি বহু তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে রামকে আক্রমণ করলেন। রাম পর্বতের এমন স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, যে স্থানে খরের শরগুলি পৌঁছয় না। সমস্ত শর যখন নিঃশেষ হয়ে গেল তখন রাম একটি শরে খরের সারথিকে বধ করলেন। খর গদাহস্তে লম্ফ দিয়ে ভূমিতে নামলেন এবং রামের দিকে দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগলেন।

খর নিকটস্থ হতেই শ্রীরাম বললেন—যে নৃশংস পাপী লোককে ক্লেশ দেয় সে ত্রিলোকের অধীশ্বর হলেও রক্ষা পায় না। মহারাজ খর! দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণকে হত্যা করে তোমার কি লাভ হয়েছে? নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার

করেছ বলে আজ তোমার মৃত্যু আসন্ন। তোমাকে আমি বধ করবই, কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

উত্তরে খর বললেন--নীচ ক্ষত্রিয়েরাই কেবল গর্ব আস্ফালন করে। আর সময় নাই। সূর্য অস্তাচলগামী। আজ তোমাকে বধ করে আমার চৌদ্দ হাজার সৈনিকের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেব।

এই কথা বলার সঙ্গে সংগে খর গদা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎবেগে রামের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। রামও প্রস্তুত ছিলেন। লৌহ নির্মিত শরক্ষেপণ করে গদাটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে খর একটি শাল বৃক্ষ উৎপাটিত করে রামের প্রতি ধাবিত হলেন। রাম প্রথমে শরক্ষেপণ করে শাল বৃক্ষটিকে খন্ড-বিখন্ড করে দিলেন, তার পর এক মহার্ঘ শর নিক্ষেপ করলেন খরের বক্ষ লক্ষ্য করে। নিমেষের মধ্যে খরের বক্ষভেদ হয়ে গেল। প্রজাগণ হর্ষে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগল। শূর্পনখা আতঙ্কিতা ও ভীতা হয়ে পলায়ন করলেন।

রাবণ আপন সভাকক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন নূতন সংবাদ আছে ?

বিভীষণ বললেন—না মহারাজ, রাজ্য আপনার অত্যন্ত সুচারুরূপে চলছে কেবল—

রাবণ অনুধাবন করলেন, বিভীষণ সমস্ত কথাই ব্যংগচ্ছলে বলছেন। সেইজন রুষ্টভাবে প্রশ্ন করলেন—কেবল কি ?

—সে বার্তা অকম্পন এবং শূর্পনখা বিস্তারিত ভাবে আপনার নিকট বর্ণন করবার জন্যেই রাজসভার বিশ্রামকক্ষে অপেক্ষা করছেন।

--তাদের শীঘ্রই সভাকক্ষে আনয়ন কর।

বিভীষণের নির্দেশে জনৈক প্রতিহারী অকম্পন এবং শূর্পনখাকে রাজসভায় উপস্থাপিত করলেন।

রাবণ শূর্পনখার মুখমন্ডলের ক্ষতস্থান দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন---ভগ্নী! তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ? আমি তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করব।

—মহারাজ, যতক্ষণ না আমি তাদের উষ্ণ রুধির পান করতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি পাব না।

রাবণ উষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন---কিন্তু শত্রুর নাম-ঠিকানা না বললে, তাকে বা তাদের শাস্তি দেব কি করে ?

আমাদের সেই শত্রু অযোধ্যার রঘুপতি রাম। সংগে ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং পত্নী

সাতা। আমি রাম-লক্ষ্মণকে কাম নিবেদন করি। কিন্তু ওরা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আমার সংগে কৌতুক করতে লাগল। আমার ভীষণ ক্রোধ হল। এমন সময় সীতা ফলাহারের থালিকা হাতে দ্বারের নিকটে উপনীতা হল। তা অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমি ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আর তখনই লক্ষ্মণ খড়গাঘাতে আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করে দিল।

রাবণ ক্রোধে উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন, তিনি শূর্পনখাকে বললেন—তোমার পরিচয় সম্যকরূপে বনচারী ক্ষত্রিয়দের দান করেছিলে ?

-হ্যাঁ করেছিলাম। কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ সকলের নামই উচ্চারণ করেছিলাম এবং সাবধান করে বলেছিলাম, এঁরা তোমাদের হত্যা করবেন।

-তারপর ? রাবণের উৎসুক প্রশ্ন।

—তোমাদের কথায় কোনরূপ ভীত হল বলে আমার প্রত্যয় হল না। আমি খর ও দূষণকে সংবাদ দান করি। তাঁরা প্রতিশোধের জন্য জনস্থান হতে পঞ্চবটী আক্রমণ করেন, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণের কাছে এত আধুনিক অস্ত্র আছে, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র আছে যে খর, দূষণ, ত্রিশিরা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং জনস্থানে আমাদের জ্ঞাতিকুলের একজন পুরুষও জীবিত নাই, কেবল স্ত্রীলোকের ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস চারদিকে শোনা যাচ্ছে। রাম-লক্ষ্মণ রাজ্য জয় করে সেখানে পূর্বেকার রাজাকে সিংহাসন দান করেছেন। তিনি পৌলস্ত্যবংশজাত নারীদের বলেছেন, নারী অবধ্য, তাই আমরা বধ করলাম না। তোমরা ইচ্ছা করলে জনস্থানে স্বাভাবিক এবং সুন্দর জীবন-যাপন করতে পার, অন্যথায় লঙ্কায় প্রত্যাগমন করতে পার।

শূর্পনখা থামলেন। রাবণ কিছুক্ষণ পদচারণা করে বললেন—পূর্বে তুমি চিকিৎসার ব্যবস্থা কর এবং বিশ্রাম কর। আমি এর যথাযথ বিহিত করব।

অতঃপর রাবণ বিভীষণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—তোমার কি মনে হয় বিভীষণ ? শূর্পনখা কি সমস্ত ঘটনা সত্য বলছে ?

—আগে আমরা অকম্পনের কথা শ্রবণ করি, তারপর বিচার করা যাবে। বিভীষণ উক্তি করলেন।

—অতি উত্তম কথা। প্রতিহারীকে আহ্বান করে রাবণ অকম্পনকে রাজসভায় আনয়ন করার আদেশ দিলেন। অকম্পন কম্পিত পদে, ক্ষতবিক্ষত দেহে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে রাবণকে, তারপরে অন্যান্য অমাত্যবর্গকে অভিবাদন জানিয়ে নির্বাক ভাবে দণ্ডায়মান রইলেন।

রাবণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—কি ঘটেছে সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে বর্ণনা কর।

অকম্পন কম্পিত হৃদয়ে ব্যক্ত করলেন—প্রথমে শূর্পনখার সঙ্গে কি ঘটেছে, তা তিনি জানেন না, তবে খর ও দূষণের আদেশে আমরা রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাই। এ ধরনের উন্নতমানের যোদ্ধা আমি জীবনে দেখি নি। আমাদের

সকল যোদ্ধাকে একা রাম বধ করে জনস্থান জয় করে নেন। আমি ও শূর্পনখাদেবী কোনক্রমে পলায়ন কবতে পেরেছি।

রাবণ চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ পদচারণা করলেন, তারপর অকম্পনকে নির্দেশ দিলেন—আপন গৃহে বিশ্রাম লাভ কর। যে কোন মুহূর্তে পুনর্বার তোমাকে আহ্বান করতে পারি।

—আপনার আদেশ পালনই তো আমার কর্তব্য। অকম্পন প্রথমে রাজাকে পরে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে রাজসভা পরিত্যাগ করলেন।

রাবণ পদচারণা করতে করতে বিভীষণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—বিভীষণ তোমার অভিমত কী?

—এ কথার উত্তর দান অতীব কষ্টসাধ্য, কারণ স্বেচ্ছাচারী শূর্পনখার কামজ প্রতিবেদন অপরাধযোগ্য কর্ম নয়, যার জন্য তার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করতে হবে। এর জন্যে রাম-লক্ষ্মণের শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন। শূর্পনখা আরও একটি দুরূহ কর্ম অত্যন্ত সহজ ভাবে পালন করেছে। আপনি রাম-লক্ষ্মণকে ভারতময় অন্বেষণ করে বেড়িয়েছেন, কারণ আপনি জানেন অযোধ্যার রাজপুত্রদের পরাজিত করতে পারলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারত আপনার করতলগত হবে।

—হুঁ। সত্য কথাই বলেছ, তবে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা বালীকেও আমার ভয়। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছি। সন্ধিতে আছে, আমি কোনদিন কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করব না, বালীরাজাও কোনদিন আমার রাজ্য আক্রমণ করবেন না।

ধীর নম্রস্বরে বিভীষণ বললেন—তবে আপনি বৃথা চিন্তা করছেন, ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে সিংহল দ্বীপে পেঁছিতে গেলে পূর্বে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করতে হয়। যে বীর বালী, আপনার ন্যায় মহাবলীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, তিনি অনায়াসে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মত দুই তাপস বালককে অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন।

বিভীষণের কথায় রাবণ ক্ষণিক স্বস্তি পেলেন। পরক্ষণেই চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—না বিভীষণ, তুমি যত সহজে সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করছ, ঘটনা পরম্পরা তার চেয়ে অনেকগুণ নিকট কঠিন এবং জটিল। আমি আর্যাবর্তের নৃপতিগণের নিকট শ্রবণ করেছি শ্রীরাম অত্যাধিক বলবান এবং আধুনিক যুদ্ধে অসাধারণ পটু। তিনি প্রচন্ড হরধনু ভঙ্গ করে অনির্বচনীয় সুন্দরী রূপসী সীতাদেবীকে ভার্যারূপে লাভ করেছেন। বিবাহ পূর্বে তিনি তাড়কা ও সুবাহুকে বধ করেন এবং মারীচকে ভয়ঙ্কররূপে আহত করেন। মারীচের মত বীরও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে নি। তাঁকে সহজে আমি বা বালী পরাস্ত করতে পারব বলে বিশ্বাস হয় না।

বিভীষণের মনে ক্ষণিকের জন্য আনন্দপ্রবাহ হিল্লোলিত হয়ে গেল। রাবণ পরাস্ত হলে লঙ্কার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনিই হবেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ হলে, তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন অথবা গোপনে শত্রুপক্ষে যোগদান করবেন। যে ভাবেই হোক লঙ্কার রত্নসিংহাসন তাঁর চাই-ই।

রাবণ পদচারণা করতে করতে একসময় প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন—আমার পুষ্পক রথের সারথিকে প্রস্তুত হতে বল। আমি এই মুহূর্তে আর্যাবর্ত পরিদর্শনে যাত্রা করব।

বিভীষণ রাবণকে সাবধান করে বললেন—মহারাজ, আপনি সর্বপ্রকার আয়ুধ সংগ্রহ করে যাত্রা করুন। লোকমুখে শুনেছি শ্রীরাম মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা। আপনি একা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, সেইজন্য মহার্ঘ আয়ুধ আপনার একান্ত প্রয়োজন।

—বিভীষণ, সত্যই তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। মায়াসমর ও সম্মুখ সমরের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই আমি জনস্থানে যাব। প্রথমে আমি যুদ্ধ করব না, তবে শ্রীরাম আক্রমণ করলে তাঁরও নিস্তার থাকবে না।

প্রতিহারী কক্ষে প্রবেশ করে রাবণকে অভিবাদন করে জ্ঞাত করলেন—মহারাজ, পুষ্পকরথ প্রস্তুত।

—সমস্ত প্রকার আয়ুধ পুষ্পকরথে সংগৃহীত হয়েছে?

প্রতিহারী মস্তক হেলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল। রাবণ বিভীষণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—বিভীষণ, আমার অবর্তমানে তুমি এ রাজ্য পরিচালনা কর।

বিভীষণ পুলকিত।

রাবণ পুনরায় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—লোকে বলে আমি নাকি দশমুণ্ডধারী। দশদিকে আমার দৃষ্টি এত তীক্ষ্ন যে আমাকে প্রবঞ্চনা করে কেউ নিস্তার পায় না। তুমি যদি আমার সঙ্গে কোনরূপ ছলনা করে আমাকে রাজ্যচ্যুত করে সিংহাসন লাভের আশা করে থাক, তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

বিভীষণ মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন—সে কথা আপনার চেয়েও আমি অনেক গুণ অধিক জানি। আপনি নিশ্চিন্তে জনস্থানে যাত্রা করুন এবং নিরাপদে প্রত্যাগমন করে রাজত্বও করবেন।

বিভীষণ প্রণাম করলেন। রাবণ সকলকে আশীর্বাদ করে জনস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে রাবণের পুষ্পকরথ মাটি স্পর্শ করল। এ স্থান থেকে মারীচ-আশ্রম খুব নিকটেই। রাবণ পদব্রজেই মারীচের নিকটে উপস্থিত হলেন। মণি-মুক্তা-স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত পুষ্পকরথ সারথির তত্ত্বাবধানে সেই স্থানেই রইল।

মারীচ-আশ্রমে উপস্থিত হয়ে রাবণ মারীচকে আহ্বান করলেন। মারীচ কক্ষাভ্যন্তর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাবণকে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—এ কি, মহারাজ! আপনি এত শীঘ্র আবার আর্যাবর্তে পদার্পণ করলেন কেন?

—কক্ষের অভ্যন্তরে চল, পরামর্শের প্রয়োজন আছে।

মারীচ সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনায় রাবণকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করলেন। রাবণ একটি স্বর্ণবেদীর উপর উপবেশন করে, চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—এস্থান হতে জনস্থান কত দূরে?

—পঞ্চম ক্রোশ পথ।

—সেস্থানে আমার নির্দেশে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং আমার রাজ্য হতে চৌদ্দ সহস্র প্রজাকে এই উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেছিলাম।

মারীচের পরিচারিকা মহারাজের সম্মুখে আহারাদির জন্য ভোজ্য বস্তু পরিবেশন করল এবং মহারাজের পরিচর্যা আরম্ভ করল।

রাবণ এক পাত্র শীতল পানীয় এক নিঃশ্বাসে পান করে একটু স্থির হয়ে বললেন—লঙ্কায় যে ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভারত ভূখণ্ডে তাদের বসতি স্থাপন না করে দিলে অচিরেই লঙ্কার অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পতন ঘটবে।

মারীচ সম্মতি প্রকাশ করে উত্তর দিলেন—আপনার দূরদৃষ্টি অসাধারণ।

—আমি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারি নি, তার কারণ মহাবলী বালীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর আমাদের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত এইরূপ—আমরা দুজনে সখ্যতার সম্পর্ক রাখব এবং উভয়ে কেউ কারও রাজ্য আক্রমণ করব না অথবা উপনিবেশ স্থাপন করব না। আর্যাবর্তে কোন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি নেই, বিশেষ করে বিধ্যারণ্য অঞ্চলে। সেইজন্যে আমি এই সব স্থানে উপনিবেশ সৃষ্টি করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। জনস্থানের অদূরে অযোধ্যাধিপতি দশরথ তনয় শ্রীরাম তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতাকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে বাস করছেন। শুনেছি রাম মহাবিক্রমশালী বীর। তিনি একাই তিন দণ্ডের মধ্যে খর, দূষণ ও ত্রিশিরার ন্যায় বীরগণকে এবং চৌদ্দ সহস্র সৈন্যকে নিহত করে ধ্বংস করেন।

মারীচ সভয়ে উত্তর দিলেন—রাম-লক্ষ্মণ এত বড় বীর যোদ্ধা, আমি জীবনে দেখি নি। আমি আর সুবাহু যখন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পণ্ড করছিলাম, তখন রামের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। তাড়কা নিধনও আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ধনুকে তীর যোজনা থেকে ক্ষেপণ পর্যন্ত এত দ্রুত লয়ে ঘটে যাচ্ছিল যে আমার ন্যায় জাদুবিদ্যা পারদর্শীকেও বিস্মিত হতে হয়। আমাকে মৃত বিবেচনা করে, তাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যান।

রাবণ সামান্য আহার গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—তুমি জাদুবিদ্যায় পারদর্শী বলেই তোমার সঙ্গে যুক্তি করতে এসেছি।

—আপনি আজ্ঞা করুন। প্রাণ থাকতে আমি তা পালন করব।

—আমি সীতাকে হরণ করতে চাই—

অবাক বিস্ময়ে মারীচ রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—আপনি ধর্মজ্ঞ, জ্ঞানী, ন্যায়াধীশ রাজা রাবণ। আপনি নারীহরণ করবেন?

—হ্যাঁ মারীচ। নারীহরণ করা ব্যতিরেকে এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

—আপনি সব কথা সুস্থ মস্তিষ্কে বলছেন মহারাজ!

—হ্যাঁ মারীচ! আমি বীর, তাই বীরের কর্মক্ষমতা এবং বীরত্বের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। যে রাম তিন দণ্ডে চৌদ্দ সহস্র সৈন্য এবং তিন বীরকে নিহত করতে পারেন, তাঁকে সামান্য চিন্তা করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রাবণ কক্ষমধ্যে পদচারণা করতে করতে বললেন—বিন্ধ্যারণ্যে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয় হওয়া প্রায় অসম্ভব, সেইজন্য আমি সীতাকে লঙ্কায় হরণ করে নিয়ে যাব।

—তাতে কী লাভ হবে?

—লাভ হবে দুই প্রকারের। শুনেছি রাম সীতাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন। সীতাহরণ করলে সীতার শোকে রাম দেহত্যাগ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আমি যে সীতাকে লঙ্কায় হরণ করে নিয়ে গিয়েছি, তার চিহ্ন পথে পথে ছড়িয়ে দিয়ে যাব। সেই চিহ্ন অনুসরণ করে রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। একবার তাদের লঙ্কায় নিয়ে যেতে পারলে, হয় সারাজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করব, অথবা হত্যা করে নিষ্কণ্টক হব।

মারীচ রাবণের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন—আপনার চাতুর্য অসাধারণ! রাম-লক্ষ্মণকে ভারতের মানুষ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে। আর্যাবর্তের এবং দক্ষিণাবর্তের সব নৃপতি রামকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে লঙ্কায় অবরুদ্ধ করতে পারলে ভারতের কোন রাজন্যবর্গও জ্ঞাত হবেন না রাম-লক্ষ্মণের বিষয়। তখন অনায়াসে তাঁদের বধ করে অথবা বন্দী করে আপনি নির্দ্বিধায় রাজ্য বিস্তারণ করতে পারবেন। অসাধারণ আপনার পরিকল্পনা!

—এই পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য তোমার সাহায্য প্রয়োজন। রাবণ মারীচকে কথাগুলি বললেন।

—আদেশ করুন।

—তোমার মায়াবল আমার প্রয়োজন। তোমার অসাধারণ জাদুবিদ্যায় নিজেকে কাঁট স্বর্ণমৃগে রূপান্তরিত করবে। সীতাদেবী সেই স্বর্ণমৃগ অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে উঠবেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে অনুরোধ করবেন স্বর্ণমৃগ ধরে আনতে। ওঁরা

দুজনে তোমাকে ধরার জন্যে তোমার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং সেই সুযোগে আমি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতাকে অপহরণ করে পুষ্পকরথে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করব। আমার রথ যখন তুমি আকাশে লক্ষ্য করবে, তখনই তুমি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে আপন মূর্তি ধারণ করবে। রাম-লক্ষ্মণ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না এবং দ্রুত আশ্রমকুটিরে প্রত্যাবর্তন করবেন। ততক্ষণে আমি ওঁদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে পেঁছিব।

—কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ আমাকে দেখতে পেলেই হত্যা করবেন।

—তুমি মায়াজাল সৃষ্টি করে বহুদূরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করবে। সেই অরণ্যে রাম-লক্ষ্মণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। আশ্রমে ফিরে আসতে অনেক দেরি হবে এবং সেই সুযোগে আমার কর্তব্য আমি সম্পাদন করতে পারব ।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আশ্রমপ্রাঙ্গণে পদচারণা করতে করতে গল্প করছিলেন। অধিকাংশ সময়ে ভরতের মহান চরিত্রের কথাই বলছিলেন শ্রীরাম। ভরত অনায়াসে অযোধ্যার রাজ্যসুখ ভোগ করতে পারেন, কিন্তু তা না করে, তিনি রাজ্যের সমস্ত বিলাসবহুল পরিবেশের মধ্যেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি রাজত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করছেন, কিন্তু রাজভাণ্ডারের কোন মহার্ঘ বস্তুই তাঁর ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। তিনি এক আশ্চর্য সংযত চরিত্রের মানুষ। তাঁর চরিত্র রাম-চরিত্র হতেও মহান।

—এই মহান চরিত্র কী করে কৈকেয়ীর মত হীনমনা নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করল।

লক্ষ্মণের এই উক্তিতে রাম ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—লক্ষ্মণ, তুমি মধ্যমা মাতার নিন্দা কর না! তিনি অতি সরলা। ক্রূরমতি, কুটদৃষ্টিসম্পন্না দাসী মন্থরার পরামর্শেই রানী কৈকেয়ী অনুরূপ বর প্রার্থনা করেছেন। পূর্বাপর কিছুই চিন্তা করেন নি। কিন্তু আমাকে বনে প্রেরণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমরা অরণ্যচারী না হলে কখনই সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক অখণ্ড রাজত্ব গড়ে তুলতে পারতাম না।

রামের কথায় বাধা দান করে সীতাদেবী সহর্ষে, উল্লসিত কণ্ঠে, নৃত্যের ভঙ্গিমায় করতালি দিয়ে বললেন—আর্য, দেখ দেখ, কি আশ্চর্য!

রাম-লক্ষ্মণ দুজনেই বিস্মিত নয়নে অবলোকন করলেন, অদূরে একটি স্বর্ণমৃগ নৃত্য করে বৃক্ষের লতাপাতা ভক্ষণ করছে।

রাম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে বললেন—স্বর্ণমৃগ? আমার মনে হয় এ কোন জাদুবিদ্যার ছলনা।

—আর্য! আমার ওই স্বর্ণমৃগটি চাই—সীতার কণ্ঠস্বরে বালিকাসুলভ চপলতা।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নেই। সীতার উত্তর—আমি স্বর্ণমৃগ না পেলে আহার ত্যাগ করব।

নিরুপায় রাম স্বর্ণমৃগের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মৃগটি যেস্থানে অবস্থান করছে, সেস্থানে শরবিদ্ধ করা অতীব কঠিন কর্ম। তাকে জীবন্ত ধরতে হলে, তার চঞ্চল পদযুগলে, বিশেষ করে সম্মুখের পদযুগলে শরাঘাত করতে হবে। আহত অবস্থায় মৃগটিকে বন্দী করতে পারলে পরে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা যাবে।

রাম লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন—লক্ষ্মণ, আমি ওই মরীচিকাসম স্বর্ণমৃগকে অনুসরণ করছি, তুমি সীতাকে কুটিরাভ্যন্তরে লক্ষ্য রাখ। কোন অবস্থাতেই তুমি সীতাকে পরিত্যাগ করে যাবে না।

রাম স্বর্ণমৃগকে অনুসরণ করলেন। ক্ষণিকের মধ্যে মৃগশিশু পলায়ন করে, পরক্ষণেই পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। রাম কিছুতেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পারেন না। এই ভাবে মৃগশিশুকে অনুসরণ করতে করতে তপোবন থেকে বহুদূরে চলে যান।

মুহূর্তের জন্য মৃগশিশু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করল আর সেই মুহূর্তে রামের অব্যর্থ লক্ষ্যে মৃগের সম্মুখ পদ শরবিদ্ধ হল। অসহ্য যন্ত্রণায় মৃগশিশু সেস্থানেই পড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগল। রাম বিস্মিত হয়ে পুনর্বার শরক্ষেপণ করলেন এবং পশ্চাতের পদে আঘাত লাগল। মৃগশিশু জড়বৎ সেখানেই পড়ে রইল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল—ভাই লক্ষ্মণ! শীঘ্র এসে আমায় বাঁচাও। মারীচ আমাকে বধ করার উদ্দেশে অস্ত্র ক্ষেপণ করেছে, আর সেই শর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে—

রাম বিস্মিত হয়ে দেখলেন, মৃগশিশুর পরিবর্তে আহত মারীচ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

রাম পুনরায় শরযোজনা করলেন। মারীচের হৃদপিন্ড লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ করলেন আর সেই শরে মারীচ দেহত্যাগ করলেন। দেহত্যাগ করার পূর্বে মারীচ পুনরায় রামের কন্ঠস্বর অনুকরণ করে চিৎকার করলেন—ভাই লক্ষ্মণ! এখনও সময় আছে, শীঘ্র এসে আমাকে বাঁচাও। মারীচ আমাকে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে।

মারীচের কন্ঠস্বর পর্ণকুটিরে সীতার কর্ণে প্রবেশ করল। তিনি ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—লক্ষ্মণ, শীঘ্র যাও, দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠ বিপদে পড়েছেন।

—না দেবি! এ কোন জাদুকন্ঠী জ্যেষ্ঠর কন্ঠস্বর অনুকরণ করে আমাদের প্রতারিত করছে। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করে জ্যেষ্ঠর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না।

সীতার স্বাভাবিক বোধশক্তি লুপ্ত হল। তিনি কঠিন কঠোর স্বরে লক্ষ্মণকে বললেন—তোমার মনের অভিপ্রায় এখন আমি স্পষ্ট অনুভব করছি। তুমি ভরতের

অনুচর হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের সহায় হয়ে বনে এসেছ। ভরত রাজ্যসুখ ভোগ করবে, আর তুমি রামের অবর্তমানে আমাকে ভোগ করবে। তা হবে না। রামের যদি কোন বিপদ ঘটে, আমি গোদাবরী জলে, অথবা বিষপানে আত্মহত্যা করব। তোমার মত হীনচরিত্রের মানুষের অঙ্কশায়িনী হব না।

—স্তব্ধ হন! লক্ষ্মণ আকুল আবেগময় কণ্ঠে উত্তর দিলেন—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! এক স্ত্রীর বুদ্ধিতে রাম রাজ্যহারা হয়েছেন, আর এক স্ত্রীর বুদ্ধিতে তিনি ভ্রাতৃহারা হবেন। বেশ, আপনার যখন সন্দেহ হচ্ছে, আমি রামানুসন্ধানে যাত্রা করছি। আপনি সাবধানে থাকবেন।

লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম করে পর্ণকুটির ত্যাগ করে বনমধ্যে প্রবেশ করলেন আর সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ-পর্যটকরূপধারী রাবণ কুটিরদ্বারে উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন—কুটিরে কে আছেন? দ্বারে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ।

সীতা কুটিরাভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে ব্রাহ্মণরূপী রাবণকে দেখে আসন পেতে অভ্যর্থনা করলেন। রাবণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলিত রূপে সৃষ্ট কে মা তুমি? একাকিনী এই বিজন বনে বাস করছ?

সীতা আপন পরিচয় দান করলেন।

রাবণ মৃদু হাস্যে বললেন—তোমার ন্যায় অপরূপা সুন্দরীর রাজ্যহারা রামের সহধর্মিনী হয়ে জীবনযাপন করার কোন অর্থ হয় না। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি লঙ্কার রাজা রাবণ। আমি বহু দেশ থেকে মহিষী সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তোমার ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরী আমি জীবনে দর্শন করি নি। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হবে। সারাজীবন সুখে সম্ভোগে দিনাতিপাত করতে পারবে।

সীতা ভয়ে বিবর্ণা হয়ে গেলেন। চিৎকার করে রাম-লক্ষ্মণকে আহ্বান করলেন কিন্তু কণ্ঠ হতে কোন স্বর নির্গত হল না। রাবণ আর সময় নষ্ট না করে বাম হস্তে সীতার কেশ আকর্ষণ করে দক্ষিণ হস্তে দুই উরুর পশ্চাৎভাগ উত্তোলিত করে মুহূর্তের মধ্যে সীতাকে অদূরে রক্ষিত বিমানে আরোহণ করিয়ে বিদ্যুৎবেগে পুষ্পকরথ চালনা করলেন।

সীতা আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন—হা রাম, কোথা রাম, আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার কর। রাম-লক্ষ্মণ তোমরা কোথা আছ। আমাকে ত্রাণ কর। লক্ষ্মণ, তোমাকে তিরস্কার করে আমি অপরাধ করেছি। এক্ষণে অনুভব করছি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তোমরা কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

পনেরো

রাবণ সীতাকে হরণ করে যখন পুষ্পকরথে লঙ্কা অভিমুখে চলেছিলেন, তখন জটায়ু দূর হতে রাবণের বিমান দেখতে পান। জটায়ুর বিমান অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তিনি নিজেই সেটি চালনা করেন। জটায়ু দেখলেন, রাবণ সীতাকে হরণ করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। জটায়ুর পক্ষীবিমান রাবণের বিমানসম্মুখে এসে পথরুদ্ধ করে আকাশপথে ঘুরতে লাগল। রাবণ সারথিকে নির্দেশ দিলেন পুষ্পকরথ নীচের দিক নিয়ে যাবার জন্যে।

রাবণের পুষ্পকরথ নীচের দিকে নামল, জটায়ুর রথও নিম্নমুখী হল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নি, তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ কেন?

জটায়ু বিপরীত প্রশ্ন করলেন—তুমিই বা কেন নিরপরাধা সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছ?

—রাম আমার জনস্থানের প্রজাগণকে, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনা কারণে হত্যা করেছে।

—না। তারা নিরীহ ব্রাহ্মণ। ও প্রজাগণের উপর বিনা কারণে অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে। সেইজন্য শ্রীরাম ওদের হত্যা করেছে।

—আমি সীতাহরণ করলে সীতার শোকে রামের মৃত্যু হবে, অথবা রাম লঙ্কায় উপস্থিত হলে সেখানে বন্দীশালায় বন্দী করে হত্যা করব।

—আমি দশরথের বয়স্য। আমি জীবিত থাকতে সীতাহরণ সম্ভব হবে না।

—দেখা যাক, বৃদ্ধ জটায়ু কত শক্তি ধারণ করেন।

রাবণ ও জটায়ুর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাবণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে জটায়ুর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে, তাঁর পক্ষীবিমানের ডানা খণ্ডবিখণ্ড করে সীতাকে পুনরায় পুষ্পকরথে তুলে দক্ষিণাপথের আকাশে উড্ডীন হলেন।

সীতা গোপনে কেশকরবীগুচ্ছ, অলঙ্কার, আভরণ একটির পর একটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ওই নিদর্শন যদি রাম-লক্ষ্মণের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তাঁরা দিক অনুসরণ করতে পারবেন।

কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য অতিক্রম করে রাবণের রথ সাগর পার হয়ে লঙ্কায় অবতরণ করল।

রাবণ সীতাকে এক অপরূপ রত্নখচিত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়ে বললেন—আমার

ঐশ্বর্য দেখতে পাচ্ছ ? আমাকে বিবাহ করলে এ সমস্ত রত্নভাণ্ডার তোমারই হবে একটা উপদেশ শ্রবণ কর, যৌবন ক্ষণস্থায়ী। যতদিন যৌবন বর্তমান রয়েছে ততদিন তুমি আমার সঙ্গে সুখ ও সম্ভোগ লাভ করে জীবনকে ধন্য কর।

ঘৃণার সঙ্গে সীতা উত্তর দিলেন—ধিক তোমাকে! তুমি বীর বলে নিজের গর্ব কর! এটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাকে হরণ করে এনেছ এই পাপের শাস্তি আমার পূজনীয় স্বামী তোমাকে অতি অবশ্য দেবেন। যিনি একা চৌদ্দ সহস্র সৈনিক এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরার মত বীরগণকে পরাজিত করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাকে হত্যা করা এক নিমেষের কাজ।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিহারিণীদের আদেশ দিলেন—এই নারী যেন এ প্রাসাদ থেকে নির্গত হতে না পারে। কোন পুরুষ যেন এর দর্শন না পায়। আমি দ্বাদশ মাস অপেক্ষা করব, তারপর যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

রাবণ প্রাসাদ থেকে নির্গত হলেন, সীতাদেবী ভূলুণ্ঠিতা হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন—হা রাম, কোথা রাম! লক্ষ্মণকে অযথা কটু কথা বলে দূরে করে দিলাম, আর সেই অপরাধজনিত পাপে আজ আমার এই অবস্থা। হে মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ! তোমরা আবির্ভূত হয়ে আমাকে উদ্ধার কর। আমাকে বাঁচাও—

রাম মারীচবধের পর ব্যবহৃত শরগুলি সংগৃহীত করে, তূণে পূর্ণ করে আশ্রমপথে যাত্রা করতে গিয়ে পরম বিস্ময়ে থমকে গেলেন।

সম্মুখে বিষণ্নবদনে লক্ষ্মণ।

রাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন--লক্ষ্মণ, তুমি এস্থানে? তুমি এত বিষণ্ন বদনে কেন? সীতার কি কোন বিপদ হয়েছে?

—না। ম্লান কণ্ঠে লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন—তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করলেন। আপনার আর্ত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে তাঁর ধারণা হয় আপনি অত্যন্ত বিপদাপন্ন। আপনার সাহায্যার্থে বারংবার আমাকে প্রেরণ করার অনুরোধ করেন আমি আপনার আজ্ঞাবহ, তাই তাঁকে পরিত্যাগ করে আসতে অস্বীকার করি। তখন তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে বললেন—আপনার মৃত্যু ঘটলে আমি সীতাদেবীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করার অভিলাষী, সেইজন্যে শ্রীরামের বিপদের কথা শ্রবণ করেও আমি নিরাসক্ত রয়েছি। এই ধরনের কটুবাক্য শ্রবণের পর আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না সীতাদেবীকে আশ্রমকুটিরে রেখে আপনার অন্বেষণে বেরিয়েছি।

রামচন্দ্র চিন্তিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—এ তুমি কি করেছ লক্ষ্মণ? স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। সেই প্রকোপে পড়ে অর্বাচীনের ন্যায় কর্ম করে বসলে! মারীচ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে। সে বুঝতে পেরেছিল সেই কণ্ঠস্বর সীতার কর্ণে একবার প্রবেশ করলে, সীতা আমার সাহায্যার্থে তোমাকে প্রেরণ করবে

আর সেই সুযোগে সীতার বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কোন কথা নয়, শীঘ্র আশ্রমে চল।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ রামকে অনুসরণ করে আশ্রমের পথ ধরলেন। দুজনে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলেন আশ্রম শূন্য। সীতা নেই। রাম উচ্চকণ্ঠে বার বার সীতার নাম উচ্চারণ করে অন্বেষণ করলেন, বারংবার সীতার নাম বনে প্রান্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতিহত হতে লাগল।

রামচন্দ্র হাহাকার করে বলে উঠলেন—লক্ষ্মণ! সীতা অপহৃতা হয়েছে। শত্রুপক্ষ আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে সীতাকে অপহরণ করে যন্ত্রণা দিয়ে তাকে হত্যা করবে। সীতা-বিরহে কিরূপে আমি বাঁচব?

লক্ষ্মণ ম্লানকণ্ঠে উত্তর দিলেন—এ অপরাধ আমারই। তখন দেবীর কটূক্তি শ্রবণ করেও আমার কর্তব্যে অটল থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল! এখন অনুভব করছি তরলমতি স্ত্রী-বুদ্ধির প্ররোচনায় একবার মহারাজ দশরথ আপনার অনিষ্ট সাধন করেছেন, আর একবার আমি আপনার ক্ষতিসাধন করলাম।

—লক্ষ্মণ! এখন বিলাপের সময় নয়, যে ভাবে হোক সীতার সন্ধান করতে হবে। জীবিতাবস্থায় বন্দিনী থাকলে ছলে বলে কৌশলে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

রাম-লক্ষ্মণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। আশ্রমের পশুপক্ষীরা নানাপ্রকার আর্তরব করে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে বারংবার ছুটোছুটি করতে লাগল।

রাম কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে দেখলেন আশ্রমের বৃক্ষ এবং লতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশ বৃক্ষশীর্ষ দক্ষিণ দিকে নত হয়ে পড়ে আছে, রামচন্দ্র অনুধাবন করলেন—যে দস্যু সীতাকে অপহরণ করেছে, সে রথে এসেছিল এবং দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছে।

—লক্ষ্মণ! আমাদের পঞ্চবটী পরিত্যাগের সময় আসন্ন।

—কিন্তু সীতা কোন্ দিকে যাত্রা করেছেন সম্যকরূপে না জেনে যাত্রা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

—ঐ দেখ, বৃক্ষ আর লতাগুল্মেগুলি দক্ষিণ দিকে হেলে পড়ে আছে, তার অর্থ যে দস্যু সীতাকে হরণ করেছ, সে দক্ষিণাপথের দিকে অগ্রসর হয়েছে। চল, আমরা দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধান করি। পথে যেতে যেতে নিশ্চয়ই আরও অনেক চিহ্ন দেখতে পাব।

অশ্রুমোচন করে লক্ষ্মণ রামকে অনুসরণ করলেন।

আশ্রম হতে দক্ষিণাপথের দিকে চলতে চলতে পথের দুধারে সীতার পরিত্যক্ত চিহ্ন লক্ষ্য করতে লাগলেন। অনেক পথ আসার পর তাঁরা যেন কার আর্তস্বর শুনতে পেলেন। সেই স্বর অনুসরণ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দ্রুত পায়ে আর্ত জটায়ুর

সম্মুখে উপস্থিত হলেন। জটায়ুর বুক এবং মুখ হতে রুধির নির্গত হচ্ছিল। রাম জটায়ুর রক্তাক্ত শির ক্রোড়ের উপর নিয়ে অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—মহাবীর জটায়ু, আপনার এ অবস্থা কে করলে ?

—রামচন্দ্র ! আমার সব কথা বলবার সময় নেই। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তাঁকে বাধা দেবার জন্যই আমার এই দুরবস্থা। তোমরা শীঘ্র দক্ষিণাপথ অবলম্বন করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সীতাকে উদ্ধার কর।

কথাগুলি বলতে বলতেই জটায়ু মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। রাম লক্ষ্মণ জটায়ুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে পুনর্বার দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

পথের মাঝখানে মধ্যে মধ্যে সীতার কেশগুচ্ছ হতে স্খলিত পতিত পুষ্পবাশি দেখতে পেলেন রাম-লক্ষ্মণ। শ্রীরাম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—সীতাকে এই পথ দিয়েই হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই দেখ সীতার কবরীস্খলিত করবীগুচ্ছ। ওই দেখ সীতার হস্তস্খলিত মুক্তাবলয়।

দক্ষিণ দিকে বহু পথ অতিক্রম করে উভয়ে অবশেষে দনুর রাজ্যে উপস্থিত হলেন। দনু প্রথমে রাম-লক্ষ্মণকে শত্রু ভেবে আক্রমণ করলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে প্রশ্ন করলেন—হে বীর, তোমরা কে ? আমার রাজ্য আক্রমণ করেছ কি জন্য ? আমি তোমাদের প্রতি কী অন্যায় আচরণ করেছি ?

রাম ধীরকণ্ঠে বললেন—আপনি কোন অপরাধ করেন নি। আমাদের আগমনে আপনি আমাদের আক্রমণ করেন, আত্মরক্ষার্থে আমরা যুদ্ধ করি। আমার ভার্যা সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েছেন। তাঁরই অন্বেষণে আমরা পথে পথে ভ্রমণ করছি।

দনু অল্পক্ষণ চিন্তা করে বললেন—আপনি এক কাজ করুন। কিষ্কিন্ধ্যার রাজভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা করুন। সেও বালীরাজ কর্তৃক রাজ্যহারা, আপনিও ভার্যাহারা। উভয়ের মিতালীতে নিশ্চিতভাবে সীতা উদ্ধার হবে, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি।

—সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব কেন ? যদি বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে স্বয়ং রাজা বালীর সঙ্গে করব ! তাতে আমাদের কার্যসিদ্ধি সত্বর হবে। রাম যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

—না। দনুরাজ বললেন—বালীরাজ রাবণের অত্যন্ত প্রিয় সখা এবং উভয়ের মধ্যে মিতালী আছে। কেউ কারো রাজ্য আক্রমণ করবে না এবং একজনের রাজ্য যদি আক্রান্ত হয়, অন্যজন উদ্ধার করবে বলে সন্ধি করা আছে। এ অবস্থায় বালীরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলে তিনি আপনাদের বন্দী করে রাবণকে সংবাদ দান করবেন এবং আপনাদের হত্যা করবেন। তা ছাড়া বালীরাজ অত্যন্ত দাম্ভিক

দস্যুপ, অত্যাচারী রাজা। তাঁর পতনে দেশের মঙ্গল সাধিত হবে। সুগ্রীব অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়বান। তিনি রাজা হলে দেশের ও দশের মঙ্গল হবে এবং অভীষ্ট-সাধনও হবে।

দনুরাজের উপদেশে কৃতার্থ হয়ে শ্রীরাম বললেন— আপনার শুভ উপদেশ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে রইল! আমরা কোন পথে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করব দয়া করে যদি নির্দেশ দেন—

দনুরাজ যথাসাধ্য পথনির্দেশ দান করলেন এবং উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন।

দনুরাজ বললেন—যাত্রাপথে আপনি পম্পাতীরবাসিনী শবরীর আশ্রম পর্যটন করে যাবেন। শৈশবকাল হতে শবরী ইষ্টলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করছেন। শবরীর বিশ্বাস ঈশ্বরের সাধনা করা অপেক্ষা পুণ্যবান মানুষের উপাসনা অনেক গুণে শ্রেয়। পরম আরাধ্য পুরুষের দর্শনলাভের দ্বারা ইষ্টলাভ করার প্রত্যাশায় আজও তিনি জীর্ণা বৃদ্ধা বয়সেও তপস্যা করে চলেছেন।

—এই অসাধারণ রমণীর দর্শনে আমি ধন্য হব দনুরাজ। কিন্তু কে সেই অসাধারণ পুরুষ, যাঁর দর্শনলাভের জন্য শবরী সমস্ত জীবন তপস্যা করে গেলেন?

দনুরাজ গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে উত্তর দান করলেন—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

—আমার তপস্যা! শ্রীরাম বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন— আমার পরিচয় তিনি কোথা থেকে জ্ঞাত হলেন?

—লোকমুখে শ্রবণ করে। তাঁর ধারণা যিনি এইরকম বিরাট চরিত্রের মানব তিনি দেবতা অপেক্ষাও মহান। দেবতা চরিত্রের মধ্যেও কলুষতা আছে, কিন্তু রামচরিত নিষ্কলঙ্ক, অগ্নিসম উজ্জ্বল। তিনি দেবতার ঊর্ধে আপনার আসন সৃষ্টি করেছেন। আমার ইচ্ছা, শবরীকে দর্শনদান করুন। শবরীর ইষ্টলাভ হোক। শবরী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাত আছেন সুগ্রীব কোথায় অবস্থান করছেন। শবরীর নিকট হতে আপনি সুগ্রীবের সন্ধান লাভ করে আপনার অভীষ্টসাধন করতে পারবেন।

শ্রীরাম পুনরায় দনুরাজকে আলিঙ্গন করে বিদায় গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মণও দনুরাজকে আলিঙ্গন করলেন। বিদায়ের কালে দনুরাজ বললেন—আপনাদের স্বকার্য-সাধনে যাত্রা করুন। আপনাদের অভীষ্ট কার্য সাধিত হোক!

শ্রীরাম উত্তরে বললেন—আমরা যাত্রা করছি। আপনার ইষ্টলাভ হোক।

দনুরাজের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পম্পার পশ্চিম তীরে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রাম-লক্ষ্মণ উপস্থিত হওয়া মাত্র শবরী তাঁদের চরণ বন্দনা করে, পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি দিয়ে সম্মান করলেন।

শ্রীরাম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—আমি কে তুমি জানো?

—সেই শিশুকাল হতে যাঁর ধ্যান করছি, যাঁকে আমি মনের মধ্যে তিল তিল করে গড়ে তুলেছি, সেই মানবশ্রেষ্ঠ রাম দর্শনে ভ্রান্তি হবে ? তুমি আমার ইষ্টদেবতা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম—

শ্রীরাম স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—চারুভাষিণি, তোমার কোনও বিঘ্ন হয় নি তো - তোমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে ? কোপ ও আহার সংযত করতে পেরেছ ? মনে সুখ পেয়েছ ? তোমার গুরুসেবা সফল হয়েছে ?

বৃদ্ধা শবরী সঘনকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—আজ তোমাকে দেখে আমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হল। আজ আমার জন্ম সফল, গুরুসেবাও সার্থক। নরশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, আজ তোমার পূজা করে আমার পূজার ফলস্বরূপ দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ করব। তোমার সৌম্যদৃষ্টিতে আমি পূত হয়েছি, অরিন্দম তোমার প্রসাদে আমি অক্ষয়লোক লাভ করব।

শবরী আপন মনেই বলতে লাগলেন—যে সব মুনি ঋষি চিত্রকূট পর্বত পরিভ্রমণ করে এ স্থানে উপস্থিত হতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে আশীর্বাদ করে বলেন—তোমার পুণ্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ স্বয়ং তোমার এই পুণ্য আশ্রমে আসবেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে অতিথিরূপে সংবর্ধনা করবে। রামের দর্শনে তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। তাঁদের কথা আমি একান্ত মনে তোমার দর্শনলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করেছি, পম্পা নদী তীরে বিবিধ বন্য উপহার সঞ্চয় করে, তোমাকে উপহার দেব বলে রেখে দিয়েছি। তোমরা আমার আতিথ্য গ্রহণ করে, আমাকে ধন্য কর, সার্থক কর।

—নিশ্চয়ই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব। তোমার আতিথ্য গ্রহণ না করলে আমাদের নরকেও স্থান হবে না। কিন্তু দেবি, আতিথ্য গ্রহণের পূর্বে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, আশা করি তার উত্তর পাব।

মৃদু হাস্যে শবরী উত্তরদান করলেন—যে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে, সে একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে না ? কি প্রশ্ন আজ্ঞা কর ?

—এ স্থানে কোথায় রাজা সুগ্রীব বাস করেন ?

শবরী অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর ধীরকণ্ঠে বললেন—পম্পা নদী তীরের অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। সেই পর্বতে গোপনে বাস করছেন রাজভ্রাতা সুগ্রীব।

শ্রীরাম প্রফুল্ল মনে উত্তরদান করলেন—শবরী! অতিথি সৎকারের আয়োজন কর।

শবরী বনজ খাদ্য সম্ভারে দুই ভ্রাতার আহারের ব্যবস্থা করলেন। আহার গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হয়ে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্রাম করলেন। শবরী উভয়ের সেবা করে নিজের জীবন ধন্য করলেন।

বিশ্রামান্তে শ্রীরাম শবরীর মস্তকে সস্নেহ হস্ত প্রসারিত করে বললেন—দেবি! অনুমতি দাও, এবার আমরা যাত্রা করি।

শবরী কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না। শ্রীরামের পদযুগলের উপর মস্তক রেখে প্রণাম করলেন। তাঁর অশ্রুধারায় শ্রীরামের পদযুগল ধৌত হয়ে গেল।

শ্রীরামের চক্ষেও অশ্রুবিন্দু। আপন দুর্বলতাকে গোপন করার জন্যই লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করে শ্রীরাম বললেন—চল ভাই, আমারা যাত্রা করি। আমাদের কর্তব্য-কর্ম এখনও সমাপ্ত হয়নি।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ধীর পায়ে আশ্রম পরিত্যাগ করে পম্পা নদীতীরে যাত্রা করলেন। শবরী প্রণামের ভঙ্গীতেই অনড় অচল অবস্থায় প্রস্তরবৎ একই স্থানে ধ্যানমগ্না। তাঁর দেহে প্রাণ বিদ্যমান কি না যথেষ্ট সন্দেহ। হয়ত ইষ্টলাভের পরই তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

ষোল

ঋষ্যমূক পর্বতমালার মধ্যে মলয় উপত্যকা। সেই উপত্যকায়, কিষ্কিন্ধ্যার রাজভ্রাতা সুগ্রীব তাঁর মহাসচিব হনুমান এবং অন্যান্য কিছু সৈন্যদল গোপনে বাস করছেন। পর্বতমালার নিম্নদেশ থেকে পম্পা নদী প্রবাহিত। একজন সৈনিক একটি উচ্চ বৃক্ষচূড়ে উপবেশন করে দূরে লক্ষ্য রেখেছিল। সে বৃক্ষচূড় থেকে তীরবেগে নিম্নে অবতরণ করে হনুমানকে বলল—মহামতি হনুমান। দুজন বিদেশী সৈনিক শ্রেণীর নাগরিক নদীতীর ধরে এই দিকে আসছেন।

হনুমানের পাশে রাজভ্রাতা সুগ্রীব উদ্বিগ্ন হৃদয়ে এসে দাঁড়ালেন। সৈনিকের কথা শ্রবণমাত্রই হনুমান এবং সুগ্রীব সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করে দেখলেন সত্যই দুজন সন্ন্যাসীবেশধারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুবক নদীতীর পথে ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অধিবাসিগণ প্রস্তরখণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে যুদ্ধ করতেন। তাঁরা শর, বর্শা, গদা প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন না। মহারাজ বালী, মহাবিক্রমশালী এবং মল্লযুদ্ধে ও প্রস্তরখণ্ড যুদ্ধে অসাধারণ পারদর্শী। তিনি কিছু অস্ত্রবিদ্যাও রাবণের নিকট শিক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বলদর্পী এবং কামুক। তিনি প্রচণ্ড লড়াই করতে পারেন, প্রচুর আহার করেন এবং একাধিক নারীসম্ভোগ না করে তৃপ্তি পান না। বালীরাজের পশুসম ব্যবহারে প্রত্যেকেই তাঁকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাঁর অপরিমিত শক্তি ও সাহসের জন্য কেউ সামনে কোন মন্তব্য করতে সাহস পায় না। বালীরাজের প্রধানা মহিষী তারাদেবী অত্যন্ত সুমার্জিতা এবং শিল্পীসুলভ মনোভাবসম্পন্না। তিনিও মনে মনে স্বামীকে ঘৃণা করেন এবং উদারস্বভাব, পণ্ডিত, ধীরস্থির চরিত্রের সুগ্রীবের প্রতি অনুরক্তা।

গিরিশৃঙ্গ হতে অবতরণ করে সুগ্রীব উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—আমার মনে হয় বালীরাজ কোন সশস্ত্র অনুচর পাঠিয়েছেন আমাদের হত্যা করার জন্যে। আগন্তুক-দ্বয়ের হাতে ধনুর্বাণ দেখলাম। ওঁরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এ সব অস্ত্র আমরা ব্যবহার করতে জানি না। আমরা মল্লযুদ্ধ ও প্রস্তরক্ষেপণ যুদ্ধেই পারদর্শী। ওঁরা যদি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ করেন, তাহলে আমাদের মরণ নিশ্চিত এবং আমরা ওঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারব না।

হনুমান ধীরভাবে নিজের দেহ হতে রোমশ পরিচ্ছদ খুলে ফেলে দিলেন। প্রত্যেক কিষ্কিন্ধ্যাবাসী এই ধরনের রোমশ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকেন। এই রোমশ পরিচ্ছদ তৈরি হয়ে থাকে বানর প্রভৃতি পশুর চর্ম থেকে। এই চর্মাবরণ থাকার জন্য হঠাৎ কোন প্রস্তরখন্ড গায়ে এসে পড়লে তেমন আঘাত লাগবার সম্ভাবনা থাকে না, তাছাড়া এইরূপ আচ্ছাদনে আবৃত রাখলে শত্রুর হাত হতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা যায়, হঠাৎ কেউ কাউকে চিনতে পারে না। সকলকেই এক রকম মনে হয়।

হনুমান আবরণ উন্মোচন করে ভিক্ষুকের বেশে ধরলেন এবং সুগ্রীবকে বললেন—আমি ভিক্ষুকের বেশে আগন্তুকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিপ্রায় জেনে আসি। যতদূর মনে হয়, আগন্তুকদ্বয় উত্তর ভারতের অধিবাসী। আমি উত্তর ভারতের ভাষা জ্ঞাত আছি। বেদ-উপনিষদ পাঠকালে আমি আর্যভাষা শিক্ষা করে-ছিলাম। সুতরাং ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমার অসুবিধা হবে না।

—কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলবে। যতক্ষণ না ওঁদের পরিচয় পাও, ততক্ষণ তোমার পরিচয় দান করবে না।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

ভিক্ষুকরূপী হনুমান পর্বতাঞ্চল থেকে অবতরণ করে, পম্পা নদীতীর ধরে হাঁটতে লাগলেন এবং অল্পকাল পরেই রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন।

রাম-লক্ষ্মণ ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়ালেন।

হনুমান প্রণাম করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর্যভাষায় বললেন—তোমরা কে যুবা এই বিজন বনে পম্পা নদী তীরে সশস্ত্র হয়ে ভ্রমণ করছ? কি তোমাদের উদ্দেশ্য?

শ্রীরাম উত্তরদান করলেন—আমরা কিষ্কিন্ধ্যার রাজভ্রাতা সুগ্রীবের সাক্ষাৎপ্রয়াসী। শুনেছি, তিনি এই ঋষ্যমূক পর্বতেই আত্মগোপন করে আছেন।

হনুমানের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করলেন—তোমাদের প্রকৃত পরিচয় কিন্তু তোমরা উপস্থাপন করনি।

শ্রীরাম ধীরকণ্ঠে আপন পরিচয় দান করলেন। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের ঘটনাও সজল-নেত্রে বর্ণনা করলেন।

সর্ব ঘটনা ব্যক্ত করার পর শ্রীরাম বললেন—আমরা শুনেছি সুগ্রীব ধর্মজ্ঞ ও ন্যায়বান। তাঁকে বালীরাজ রাজ্যহারা করে সদর্পে রাজত্ব করছেন। আমরা তাঁর রাজ্য উদ্ধার করে, তাঁকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করব, তারপর তাঁর সাহায্যে আমরা লঙ্কায় যাত্রা করে সীতা উদ্ধার করব।

—জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম! জয় রাজভ্রাতা লক্ষ্মণের জয়! আমি হনুমান, সুগ্রীবের সচিব।

মুহূর্তমধ্যে দুই ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে হনুমান দুই স্কন্ধে তুলে নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতের মলয় উপত্যকার দিকে সানন্দে ধাবমান হলেন।

মলয় উপত্যকায় রাজভ্রাতা সুগ্রীবের সম্মুখে রাম-লক্ষ্মণকে উপস্থাপিত করে হনুমান বললেন—মহারাজ। উত্তর ভারতের ইক্ষ্বাকু বংশজাত মহারাজ দশরথের দুই তনয়। ইনি রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, আর ইনি তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ। দনুরাজের নিকট আপনার সংবাদ আহরণ করে, আপনার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে অভিলাষী।

—আমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন? মৃদু হাস্যে সুগ্রীব প্রশ্ন করলেন—আমি রাজ্যহারা, পত্নীহারা দুর্ভাগ্যপীড়িত বনবাসী। আমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে কী অভীষ্টসাধন হবে?

রাম সাহাস্যে উত্তরদান করলেন—দুর্দিনে যাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হয়, সেই সখ্যতা চিরস্থায়ী। আমি মহামান্য হনুমানের নিকট শ্রবণ করেছি, আপনি রাজ্যহারা। আমিও পত্নীহারা হয়ে পথে পথে তাঁর অন্বেষণ করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাকে আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধার করে দেব, তার পরিবর্তে আপনি আমাকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবেন।

সুগ্রীব অল্পক্ষণ চিন্তা করলেন। আপন বানরাবরণ উন্মোচন করে, সুগ্রীব তাঁর সুন্দর দেহসৌষ্ঠব উন্মুক্ত করলেন। রাম সহাস্যে বললেন—আপনাদের এই সুন্দর দেহ কেন পশুচর্ম আবরণে আবৃত রাখেন?

সুগ্রীব উত্তরদান করলেন—আমরা প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা অথবা মল্লযুদ্ধ প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ করে থাকি। এই বানরাবরণ সমস্ত শরীরে ঢাকা থাকলে প্রস্তর খণ্ডের আঘাত সমধিক অনুভূত হয় না। মল্লযুদ্ধেও প্রতিপক্ষ এই আবরণের জন্য কঠিনভাবে ধরতে পারেন না এবং আমরা অনায়াসে যুদ্ধ করতে পারি।

সচিব হনুমান ততক্ষণে সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করে ফেলেছেন। সচন্দন পুষ্পগন্ধ মিশ্রিত কাষ্ঠখণ্ডগুলি একত্র করে আসনের সৃষ্টি করে সুগ্রীবের সম্মুখে এসে বললেন—মহারাজ! আপনার আসন প্রস্তুত। অতিথিদের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে কথা বলুন, আমি ততক্ষণ কিছু আহার্যের ব্যবস্থা করি।

সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করলেন। সুগ্রীব অল্পেক্ষণ চিন্তা করে বললেন—মহামান্য রাম। আমরা বোধহয় আপনার পত্নীকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে দেখেছি।

—দেখেছেন ? কোথায় ?

—সে কথা সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও অপহৃতা রমণী যে আপনার পত্নী, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এক দস্যু তাঁকে বিমানে করে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আকাশ পথে যাচ্ছিল, আর বন্দিনী রমণী আর্তস্বরে চিৎকার করে ক্রন্দন করছিলেন 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ।' তদুপরি তাঁর নিজের পরিচিতি প্রকাশ করার জন্য এই অলঙ্কার ও উত্তরীয় তৃণভূমিতে ফেলে দিয়ে গেছেন। প্রস্তরভূমিতে পতিত না হয়ে, তৃণভূমিতে পতিত হওয়ার জন্য অলঙ্কারগুলি অবিকৃত আছে। আপনারা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখুন, সত্যই মহারাণী মৈথিলীর দ্রব্য কি না

সুগ্রীবের আদেশে গুহামধ্য হতে হনুমান সীতা পরিত্যক্ত কেয়ূর, কঙ্কণ নূপুর ও উত্তরীয় আনয়ন করলেন।

রাম সেগুলি পরিদর্শন করে আকুল নেত্রে লক্ষ্মণকে বললেন—দেখ, দেখ লক্ষ্মণ, এ সব বৈদেহীর, তুমি চিনতে পার কি না দেখ!

লক্ষ্মণ ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আর্য, আমি মাতৃসমা জানকীর পদযুগল ব্যতিরেকে দেহের অন্য কোন অংশ কখনও দেখি নাই, সেইজন্য একমাত্র নূপুর ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার বা উত্তরীয় আমার পক্ষে চেনা শক্ত।

—বেশ, বেশ, তাই তুমি নূপুর দেখেই বল, এ নূপুর জানকীর কি না ?

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন—হ্যাঁ দেব, এই নূপুরদ্বয় মাতৃস্বরূপা জানকীর।

—কে তাঁকে হরণ করেছে ? কোন দিকে নিয়ে গেছে ? বল, আমি তাকে হত্যা করে সীতা উদ্ধার করব।

—কে বা কোথায় তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ কথা সঠিক ভাবে বলতে পারি না। কিন্তু এ কথা সঠিক যে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে সেই দস্যু সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

—আমি তাঁর কিছুটা পরিচয় পেয়েছি।

—কে সে ?

—লঙ্কার অধিপতি রাজা রাবণ।

—সে রাজ্যে কোন্ দিকে যেতে হয় ?

—আমিও সঠিক পথ চিনি না। পবননন্দন অগাধ জ্ঞানী। ও ঠিক পথ খুঁজে বার করবেন।

—লঙ্কার পথ আবিষ্কার করা এমন কোন কঠিন কর্ম নয়, কিন্তু বালীরাজকে পরাভূত করে, সে রাজ্য অধিকার করা অনেক বেশি আয়াসসাপেক্ষ। পূর্বে

আপনি রাজ্য অধিকার করে সিংহাসনে আরোহণ করুন, তারপর আমি অনায়াসে লঙ্কার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব।

হনুমানের বক্তব্য শ্রবণ করে শ্রীরাম অনুধাবন করলেন, পূর্বে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হনুমানের অভিপ্রায়। নিরুপায় রাম উত্তর-দান করলেন—অতি উত্তম প্রস্তাব। তার আগে আমার জানা প্রয়োজন, কেন বালীরাজা আপনাকে দেশত্যাগী করেছেন। আমাকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করুন, পূর্বে আমাকে বিচার করতে দিন অপরাধ কার? যদি আপনার অপরাধ হয়, বিনাপরাধ বালীকে হত্যা করা অপরাধ হবে আর যদি সত্যিই বালীর অপরাধ থাকে, ভূ-ভারতে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না।

সুগ্রীব শ্রীরামের কথা শ্রবণ করে বললেন—আমার সব কথা আপনাকে অকপটে ব্যক্ত করব। কিন্তু তার পূর্বে আপনার শক্তি পরীক্ষা আমার প্রয়োজন। মহাবীর বালী ওই যে পর্বত প্রমাণ প্রস্তর খণ্ড রয়েছে, অনায়াসে তা ক্ষেপণ করতে পারেন, ওই যে শালবৃক্ষ রয়েছে, একসঙ্গে সাত শালবৃক্ষ উৎক্ষেপিত করে যুদ্ধ করতে পারেন। আপনি কি সে শক্তির অধিকারী?

এ কথার কোন উত্তর দিলেন না শ্রীরাম। তূণ হতে একটি শর বার করে ধনুতে যোজনা করে প্রস্তর খণ্ডের প্রতি ক্ষেপণ করলেন। মুহূর্তমধ্যে সকলকে বিস্মিত করে প্রস্তরখণ্ডটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, শরটি পুনরায় রামসমীপে ফিরে এল। রাম শরটি তূণে রেখে পুনরায় অন্য একটি শর নির্বাচিত করে শালবৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে ক্ষেপণ করলেন। চক্ষুর নিমেষে শালবৃক্ষগুলির কাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং সশব্দে সাতটি শালবৃক্ষ একত্রে ভূতলে পতিত হল। পূর্বের ন্যায় এবারেও শরটি পুনরায় রামের নিকট এসে পড়ল। রাম শরটিকে সযত্নে পুনরায় তূণে রেখে বললেন—আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন আছে?

এতক্ষণ বিস্মিত নয়নে সুগ্রীব ও হনুমান শ্রীরামের অস্ত্রক্ষেপণ কৌশল অবলোকন করছিলেন। এই অভাবনীয় অস্ত্রকৌশলে সুগ্রীব ও হনুমান ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন।

রামের কথায় সুগ্রীবের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। সুগ্রীব যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে বললেন—বন্ধুবর, আপনার শক্তি পরীক্ষা করাই আমার অপরাধ হয়েছে, তবে করলাম, যদি আপনি মহাবীর বালীর নিকট পরাজিত হয়ে হত হন, এই ভয়ে।

রাম সে কথায় উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন—এবার আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপনে আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই?

হনুমান তৎক্ষণাৎ কয়েকটি চন্দনকাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে সুগ্রীব ও রামকে আহ্বান করে পাণিপীড়ন করতে বললেন। সুগ্রীব অগ্নিকুণ্ডের একদিকে, শ্রীরাম অন্যদিকে দণ্ডায়মান হয়ে অগ্নিকুণ্ডকে মধ্যে রেখে উভয়ে উভয়ের পাণিপীড়ন করলেন

এবং অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করলেন। শ্রীরামের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর, লক্ষ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। একই রকম শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে হনুমানের সঙ্গেও রাম-লক্ষ্মণ বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

শ্রীরাম আপন আসন গ্রহণ করে বললেন—বন্ধু, এবার বল তোমার সব কথা।

সুগ্রীব নিজ আসন গ্রহণ করে বলতে লাগলেন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের কাহিনী। বালী ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতা, কিন্তু চরিত্রে একেবারে বিপরীত। বালীর চরিত্রে অধিকাংশই পশুসুলভ বৃত্তি। তিনি প্রচুর আহার করেন, পশুর ন্যায় বহু নারীকে সম্ভোগ করেন এবং তিনি অসাধারণ বিক্রমশালী। সুগ্রীব অত্যন্ত ধার্মিক, ন্যায়বান এবং মানবিক গুণের অধিকারী। তিনি হনুমানের সঙ্গে আর্যভাষা শিক্ষা করেন এবং আর্যশিল্প অনুকরণ করেন। সুগ্রীবের পত্নী রুমা এবং বালীর জায়া তারা। তারা দেবর সুগ্রীবের নিকট আর্য সভ্যতার শিল্প, সাহিত্য এবং যুদ্ধরীতির কাহিনী শ্রবণ করে মনে মনে নিজেকে আর্য রমণী রূপে কল্পনা করতেন এবং বেশভূষায়, সাজসজ্জায় আর্য রমণীর সমতুল করে তুলতেন।

সুগ্রীব বালীর অনুরক্ত ও আজ্ঞাবহ হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় মায়াবী নামক এক অর্বাচীন দস্যুর সঙ্গে রমণীঘটিত কোন ব্যাপারে বালীর সঙ্গে কলহ হয়। একদিন রাত্রে মায়াবী রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে হুংকার দিয়ে বালীরাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। মায়াবীর চিৎকারে বালীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাজপ্রাসাদের বাহির-দ্বারে এসে বললেন—মায়াবী! এত চিৎকার করছ কেন? শক্তি থাকে এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি এখন বীরপান করে মত্ত হয়েছি। এ মত্ততায় তুমি ভয় পেয় না। এস আমরা মল্লযুদ্ধ করি।

মায়াবী কোন বিশেষ অভিসন্ধি নিয়েই বললেন—স্ত্রীলোকদের সামনে তুমি অহমিকা আর দম্ভ প্রকাশ করছ। ক্ষমতা থাকে আমার নিকট এসে যুদ্ধ কর।

বালী ক্রোধান্ধ হয়ে অগ্রসর হলেন। সুগ্রীব এবং বালীর পত্নীগণ বার বার বালীকে নিষেধ করলেন, কিন্তু বালী কারুর নিষেধ শুনলেন না। হুংকার ছাড়তে ছাড়তে মায়াবীর পশ্চাতে ধাবিত হলেন। সে রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল। মায়াবীর পশ্চাতে বালী যখন ধাবমান, সুগ্রীবও বাধ্য হয়ে বালীর পশ্চাতে চললেন।

মায়াবী অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে পর্বতগাত্রের এক গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন। বালী ও সুগ্রীব গুহাদ্বারে উপস্থিত হলেন। বালী সুগ্রীবকে বললেন—আমি মায়াবীকে বধ করতে গুহামধ্যে প্রবেশ করছি। তুমি গুহাদ্বারে অবস্থান কর। আমি যতদিন না প্রত্যাবর্তন করি, ততদিন তুমি এই গুহাদ্বারে অবস্থান কর।

বালী গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন। সুগ্রীব সেস্থানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দিন যায় মাস যায়, বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু বালীর কোন সাড়া নেই। হঠাৎ একদিন সুগ্রীব লক্ষ্য করলেন গুহামধ্য হতে সফেন রুধির স্রোতের ন্যায়

নির্গত হচ্ছে। মায়াবী এবং তার দলবলের চিৎকার শ্রবণে এল, কিন্তু বালীর কোন তর্জন-গর্জন, সাড়াশব্দ কিছুই শ্রবণে এল না। সুগ্রীবের ধারণা হল বালী মায়াবী কর্তৃক হত হয়েছেন, এবং তাঁরই শোণিতধারা নির্গত হচ্ছে।

সুগ্রীব আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করেও যখন কাউকে দেখতে পেলেন না, তখন গুহাদ্বার প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করে, কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করলেন।

সুগ্রীব প্রথমে কোন কথাই ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু ক্রমশঃ মন্ত্রিগণ ব্যাপারটা জানতে পারেন। তখন সকলে যুক্তি করে, সুগ্রীবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে, রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

সুগ্রীবের রাজত্বকালে কিষ্কিন্ধ্যার প্রভূত উন্নতিসাধন হল। তারাদেবী যে উপদেশ দিতেন, সুগ্রীব নতমস্তকে তাই পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য পরিচালনা করতেন অন্তরালবর্তিনী তারাদেবী। সুগ্রীব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন কেবল লোকচক্ষে রাজরূপে।

সুগ্রীব বলতে লাগলেন—একদিন অকস্মাৎ বালী ফিরে এলেন। আমি এবং মন্ত্রিগণ বিস্মিত! বালী আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করলেন এবং মন্ত্রিগণকে পরুষ বাক্য বললেন। আমি ইচ্ছা করলে বালীকে বন্দী করে হত্যা করতে পারতাম, কারণ তখন সমস্ত রাজশক্তি আমার পক্ষে, তবু আমি অধর্মের আশ্রয় নিলাম না। রাজমুকুট মস্তক হতে খুলে, জ্যেষ্ঠের পদতলে রেখে বিনীতকণ্ঠে বললাম—দীর্ঘ এক বৎসর আমি সেই গুহাদ্বারে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু আপনার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, তারপর শোণিতস্রোত অবলোকন করে স্থির করলাম আপনার দেহান্ত ঘটেছে।

এ রাজ্য আপনার। আপানার প্রতিনিধি হয়ে এই রাজ্য পরিচালনা করেছি। আজ আপনি প্রত্যাগত। আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন, আমি আপনার আজ্ঞাবহ হয়েই দিনাতিপাত করব।

—না। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বালীরাজ। তিনি সুগ্রীবকে প্রহার করে বললেন—তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে গুহাদ্বার বন্ধ করে, রাজ্য অধিকার করেছ। ভেবেছিলে গুহাদ্বার উন্মুক্ত করে আর কোনদিন ফিরে আসতে পারব না। তোমাকে আমার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। এই মুহূর্তে তুমি এক বস্ত্রে আমার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হও, তা না হলে তোমাকে হত্যা করব।

সুগ্রীব কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর বললেন—আমারই সম্মুখে আমার পত্নী রুমাকে বালী আকর্ষণ করে, তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে, কক্ষের অর্গলদ্বার বন্ধ করে দিলেন। আমি এক বস্ত্রে এই সহচরবৃন্দের সঙ্গে ঋষ্যমূক পর্বতে আত্মগোপন করে আছি। পবননন্দন হনুমান পরম ধার্মিক অথচ মহাবীর। তিনি আমার সঙ্গেই বসবাস করছেন।

শ্রীরাম একটি কথাও উচ্চারণ না করে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। সুগ্রীব অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন—কবে বালীকে হত্যা করে, আমার হৃতরাজ্য উদ্ধার করে দেবেন?

শ্রীরাম গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—অদ্য বিশ্রামের দিন। কাল সমস্ত আলোচনা বিশদভাবে হবে।

– যথা আজ্ঞা বন্ধুবর। শ্রীমান হনুমান, তুমি বন্ধুদের বিশ্রামের আয়োজন কর।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের আহারাদির পর, বিশ্রামের আয়োজন করে দিলেন হনুমান।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ শয়ন করলেন, সুগ্রীব ও হনুমান অন্য গুহায় প্রবেশ করলেন।

সমস্ত রাত্রি নীরব নিথর। সুগ্রীব, হনুমান—আদি গভীর নিদ্রায় অভিভূত। নিদ্রাহীন চঞ্চল শ্রীরামচন্দ্র। গুহাশয্যা পরিত্যাগ করে একসময় তিনি মুক্তাকাশের নিম্নে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলেন স্বচ্ছ মেঘহীন আকাশের বুকে লক্ষ লক্ষ তারার মেলা। শুক্লপক্ষ। চন্দ্রদেবও আকাশের পশ্চিম দিগন্তে বিলীয়মানপ্রায়। চন্দের ম্লান কিরণে সারা আকাশব্যাপী এক রহস্যময় ম্লান জ্যোৎস্নার বিকিরণ। শ্রীরাম রহস্যময় মহাকাব্যের পানে তাকিয়ে গভীর চিন্তা করে চলেছেন। তিনি কি করবেন? বালীরাজের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবেন, অথবা সুগ্রীবের সহায় হবেন বালী অথবা সুগ্রীব দুজনকেই পরাভূত করার ক্ষমতা রাখেন রামচন্দ্র, কিন্তু বালীরাজ অসীম ক্ষমতাবান। বালীরাজের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলে অনায়াসে তিনি সীতা উদ্ধার করতে পারবেন। সুগ্রীবের কথায় স্পষ্ট প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পায়, তিনি বালী অপেক্ষা হীনবল এবং রামকেই তিনি সহায়রূপে অবলম্বন করেছেন। সুগ্রীবকে সাহায্য করলে তিনি অবশ্য বাধ্য হবেন বালীকে পরাভূত করে, কিন্তু তাঁর সাহায্যে সীতা উদ্ধার কতখানি সার্থক হবে, এ সম্পর্কে এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে।

নিজের প্রশ্নে, নিজেই জর্জরিত রাম। নিজেকেই উত্তরদান করতে লাগলেন। বালী বলিষ্ঠ, অমিতপরাক্রমশালি বীর, বালী নিজেকে কোন রাজার অধীনস্থ বলে স্বীকার করবেন, এরূপ মনে হয় না। ভারতে অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বালীর মত বীর রাজাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। সুগ্রীব ধার্মিক, ধীর, স্থির এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অনায়াসে তিনি রামের বশ্যতা স্বকার করবেন এবং সারা ভারতে অখণ্ড রাজত্ব বিস্তার করা সম্ভব হবে। সীতা-উদ্ধার হয়ত আয়াসসাপেক্ষ হবে, কিন্তু সসৈন্য সুগ্রীব রামকে সাহায্য করলে নিশ্চয়ই একদিন সীতা উদ্ধার সম্ভব হবে।

একই সঙ্গে দুই কর্ম সাধিত হবে। সীতা উদ্ধার এবং ভারতে অখণ্ড রাজত্ব স্থাপন।

কিন্তু বিনা কারণে বালীকে হত্যা করবেন শ্রীরাম ? বালী তো রামের কোন ক্ষতি করেন নি। শ্রীরাম তো বালীর নিকট সীতা উদ্ধারের প্রস্তাব উত্থাপন করে, অপমানিত হয়ে ফিরে আসেননি ? তাহলে এই কর্মের জন্য যখন বিশ্বচরাচর তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইবেন, তখন কি যুক্তি দেবেন তিনি ?

আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কে এক যুক্তি বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে উঠল। তিনি নিজের মনেই উত্তর পেয়ে গেলেন এবং প্রশান্ত চিত্তে পুনরায় শয্যাগ্রহণ করলেন।

পরদিন প্রভাতে সুগ্রীবকে প্রাভাতিক আলিঙ্গন করে রাম বললেন—এখন আমরা কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করি। তুমি অগ্রগামী হয়ে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। আমি দূরে বৃক্ষান্তরালে থাকব এবং সেস্থান থেকে অনায়াসে বালীকে বধ করতে পারব।

রামের নির্দেশ অনুযায়ী সুগ্রীব সদলবলে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন। রাম লক্ষ্মণ দূরে বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সুগ্রীব তাঁর পরিধেয় পরিচ্ছদ দৃঢ়বদ্ধ করে, ঘোর রবে আকাশ বিদীর্ণ করে বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান শ্রবণে বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুই ভ্রাতার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। তাঁরা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পরস্পর পরস্পরকে করতল ও মুষ্টি দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

রাম বিস্মিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দুই ভ্রাতার অবয়ব সম্পূর্ণ এক প্রকার। কে সুগ্রীব এবং কে বালী, অন্তরাল থেকে বিচার করা অসম্ভব। রামের শঙ্কা হল তিনি শরমোচনে বালীর বদলে হয়ত সুগ্রীবকে হত্যা করতে পারেন, সেইজন্য তিনি শরক্ষেপণ করলেন না।

সুগ্রীব প্রহারে প্রহারে জর্জরিত। তিনি ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছেন। রাম কোন সাহায্য করছেন না লক্ষ্য করে সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিলেন এবং ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে পলায়ন করলেন। বালী ভ্রাতাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করে পুনবার প্রাসাদে প্রত্যাগমন করলেন।

ঋষ্যমূক পর্বতের গভীর অরণ্যমাঝে মলয় উপত্যকায় রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহে সুগ্রীব অধোমুখে উপবিষ্ট। লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম তথায় উপস্থিত হতে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুগ্রীব বললেন—এ তুমি কি করলে বন্ধু ? তুমি বালীকে আহ্বান করতে বললে, নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করলে, তারপর বালীর হাতে প্রচণ্ড প্রহার খাওয়ালে। কেন এমন করলে ? প্রথমেই সত্য কথা বলা উচিত ছিল। তুমি কি বালীকে বধ করতে চাও না ? তাহলে আমিও আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে বেরোতাম না।

রাম ধীরকণ্ঠে বললেন—সুগ্রীব, ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার সমস্যার কথা শোন। তোমরা দুই ভাই অবিকল একই প্রকার। দূর হতে আমি কোন প্রভেদ

বুঝতে পারিনি। আমি প্রাণান্তকর শরমোচন করতে পারিনি এই ভয়ে যে বালীর পরিবর্তে তোমাকেই হত্যা করে বসি। তুমি আমার বন্ধু। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতা তোমার শরণাগত। আমরা তোমাকে দূর হতে চিনতে পারি, এমন কোন চিহ্ন ধারণ করে পুনরায় তুমি যুদ্ধে যাও। তুমি দেখবে চক্ষের পলকে আমি বালী বধ করব।

সুগ্রীব নীরব।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কণ্ঠে অভিজ্ঞানস্বরূপ পুষ্পিত গজপুষ্পী লতা বেঁধে দিলেন। তারপর তাঁরা পুনর্বার কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় পেঁাছে পূর্ববৎ বৃক্ষের অন্তরালে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রয় নিলেন, সুগ্রীব হনুমান, নীল, নল প্রচণ্ড নিনাদে বালীকে যুদ্ধে আহবান করলেন।

বালী তখন তাঁর প্রাসাদ কক্ষে মহারাণী তারার সঙ্গে আলিঙ্গন অবস্থায় সময় যাপন করছেন। বালী সুগ্রীবের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে আলিঙ্গনচ্যুত হয়ে, হুঙ্কার ছেড়ে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। তারা আলিঙ্গনকে আরও দৃঢ় করে বাধা দিয়ে বললেন—না মহারাজ, আপনি এই যুদ্ধে যাবেন না। সুগ্রীব আপনার অত্যন্ত অনুগত, ভদ্র ও বিশ্বাসী। তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে, দুই ভ্রাতা একত্রে শান্তিতে রাজত্ব করুন।

—আমি জানি তারা। সুগ্রীবের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, কিন্তু আমি জীবিতকালে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে দেব না। আমি সুগ্রীবকে বধ করে অতি সত্বর প্রত্যাবর্তন করব। তুমি ততক্ষণ স্থির হয়ে থাক।

—মহারাজ, উত্তর ভারত হতে অযোধ্যানিবাসী দুই রাজকুমার সন্ন্যাসীর বেশে ঋষ্যমূক পর্বতে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালী করেছেন। তাঁদের বেশ সন্ন্যাসীর ন্যায় কিন্তু তাঁদের কাছে অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। আমার খুব ভয় হচ্ছে সুগ্রীবের এই যুদ্ধ আহবানের পশ্চাতে রাম-লক্ষ্মণের কোন উদ্দেশ আছে।

—তুমি এসব কথা জানলে কি ভাবে?

—কুমার অঙ্গদকে পাঠিয়েছিলাম গুপ্তচর হিসাবে ঋষ্যমূক পর্বতে। সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে আমার নিকট নিবেদন করেছে।

বাইরে সুগ্রীবের হুঙ্কার, ভেতরে তারার অনুরোধ। বালী কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তারপর সহাস্যে বললেন—রামচন্দ্র আমার ক্ষতি করবেন কেন? আমি তাঁর কী ক্ষতি করেছি? তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি সুগ্রীবের দর্প চূর্ণ করে অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্তন করে তোমার সঙ্গে সম্ভোগসুখ ভোগ করব। প্রতিজ্ঞা করছি আমি সুগ্রীবকে হত্যা করব না।

তারার নিষেধ অবজ্ঞা করে, বালী হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এলেন এবং সুগ্রীবকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করতে লাগলেন। প্রথমে সুগ্রীব কয়েকটি

প্রহার প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু তারপর আর তাঁর সামর্থ্যে কুলালো না। তিনি বার বার কাতর নয়নে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। রামও লক্ষ্য করলেন, সুগ্রীব ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছেন। সুগ্রীবকে আর্ত দেখে মহাবল রাম ধনুতে ভুজঙ্গসম শরসন্ধান করে কৃতান্তের কালচক্রের ন্যায় জ্যা আকর্ষণ করলেন। সেই প্রদীপ্ত অশনিতুল্য শর মুক্ত হয়েই ঘোর রবে বালীর বক্ষে পতিত হল এবং তিনি আশ্বিন পূর্ণিমার উৎসবান্তে উৎক্ষিপ্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অচেতন হয়ে ভূমিতলে পতিত হলেন।

সতেরো

বালী ভূপতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ বৃক্ষান্তরাল থেকে নির্গত হয়ে বালীর নিকটে গমন করলেন। লুপ্তচেতন বালী মৃত্যুর পূর্বে পুনরায় সামান্য ক্ষণের জন্য চেতনাপ্রাপ্ত হলেন।

তিনি রামকে সম্মুখে দেখে প্রশ্ন করলেন—হে ধর্মজ্ঞ, বীর, রাম, এ তুমি কি করলে? তুমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত মহামতি রাজপুত্র। তোমাকে সকলে দেবজ্ঞানে পূজা করে। আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যার জন্য তুমি আমাকে অলক্ষ্য থেকে বধ করলে? যদি তোমার যুদ্ধ করারই প্রবৃত্তি ছিল, তাহলে আমাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলে না কেন? দেখতাম, তুমি কত বলশালী?

তারার অনুরোধ না শুনেই আমার এই বিপদ ঘটল। যদি তারার কথা শুনতাম, তাহলে আজ আমার মৃত্যু ঘটত না। লোকে যেন কখনও পত্নীকে অবজ্ঞা না করে, বিপদকালে সে-ই প্রকৃত বন্ধু এবং প্রকৃত উপদেশদাত্রী।

রাম ধীরভাবে বালীর কথাগুলো শুনলেন, তারপর উত্তর দিলেন—আমি যা করেছি, ন্যায়সঙ্গত করেছি।

—ন্যায় করেছ? বালী সক্ষোভে বললেন—তুমি যদি আমার নিকট সীতার কথা ব্যক্ত করতে, আমি একদিনেই রাবণকে বন্দী করে, তোমার নিকট উপস্থিত করতাম। তুমি অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার করতে পারতে—

রাম বিজ্ঞভাবে উত্তর দিলেন—কেবল সীতা উদ্ধারের জন্য তোমাকে বধ করি নাই। তুমি অত্যন্ত বলদর্পী এবং অধার্মিক রাজা। অযোধ্যাধিপতি ভরত যে ভাবে রাজ্য পরিচালনা করছেন, তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা উত্তর ভারত হতে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত ভ্রমণ করছি, সমস্ত ভারতে এক অখন্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তুমি জীবিত থাকলে কোনদিন আমার বশ্যতা স্বীকার করতে না,

সেইজন্য আমি পরম দুর্দিনে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব স্বীকার করেছি। বন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার অর্থই হল আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ করার পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত। আমি যুদ্ধের একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি মাত্র। এতে কোন অপরাধ হয় না। তুমি নিজেই তোমার চারিত্রিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবে, তোমাকে বধ করা আমার কর্তব্য। তুমি ক্ষমতায় আসীন হয়ে, তোমার ভ্রাতার পত্নী রুমাদেবীকে, যিনি তোমার আশ্রিতা এবং পুত্রবধূসমা, কামবশে অপহরণ করে অপমানিত করেছ। এ সমস্ত ব্যতিরেকেও তুমি পশুচর্মাবৃত। পশু বধে মানুষের কোন পাপ হয় না। সেজন্য তোমাকে বধ করে আমার কোন পাপ হবে না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

বালীর স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন— রাম, তুমি ধর্মজ্ঞ, ন্যায়বান, বীর বলে খ্যাত। তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠব না। তুমি যা করেছ, ন্যায় মনে করেই করেছ। তোমার শাস্তি আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। আমি তারা বা অন্যান্যদের জন্য শোক করছি না, কেবল আমার পরম স্নেহলালিত বালক অঙ্গদের জন্যই কাতর হয়ে পড়ছি। তুমি কথা দাও, অঙ্গদের কোন অপমান হবে না।

রাম ধীরস্থিরভাবে উচ্চারণ করলেন—তোমার মৃত্যুকালে আমি প্রতিজ্ঞা করছি অঙ্গদ পরম স্নেহে ও যত্নে লালিত হবে। সুগ্রীব রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পরই, অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে।

তারা বালীহত্যার সংবাদ শ্রবণ করে পুত্র অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। মুমূর্ষু বালীর বুকের ওপর আর্তক্রন্দনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা বললেন-মহারাজ। তোমার এ কি অবস্থা! আমার আলিঙ্গন ত্যাগ করে ভূমিতল আলিঙ্গন করে আছ কেন? ভূমিতল কি তোমার কাছে আমার চেয়েও প্রিয়? মহারাজ, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষায় যা বলতাম, তুমি মোহবশে, দম্ভভরে তা শুনতে না। তুমি রক্তসম ভ্রাতা সুগ্রীবকে নির্বাসিত করে, তার পত্নী রুমাকে হরণ করেছিলে সেই পাপের পরিণাম এই করুণ সমাপ্তি। তোমার অবর্তমানে সুখে লালিত এই রাজপুত্র অঙ্গদের কী হবে? ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের আশ্রয়ে সে অত্যাচারিত হবে। স্বামী, তুমি বিদায় নিচ্ছ, পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে, তাকে উপদেশ দাও, আমার স্মরণীয় কী, তুমি বলে যাও।

সুগ্রীবের পানে তাকিয়ে এবার ধীরকঠিন কণ্ঠে তারা বললেন—সুগ্রীব, তোমার কামনা সিদ্ধ হল, রুমাকে ফিরে পাবে, এখন নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর। ভ্রাতৃরূপী শত্রু নিহত হয়েছে।

তারা আর কথা বলতে পারলেন না। আকুল ক্রন্দনে উদ্বেলিতা হয়ে পড়লেন। বালী ইঙ্গিতে সুগ্রীবকে নিকটে আহ্বান করলেন। সুগ্রীব নতমস্তকে বালীর

নকটে উপস্থিত হতে বালী বললেন—আমারই অন্যায়ের জন্য এই পরিণতি। তার
মাকে বারংবার তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু
ম্ভভরে আমি তা পালন করিনি, সেই কারণে আমি রাজ্যসুখ ও ভ্রাতৃপ্রেমসুখ
একসঙ্গে ভোগ করতে পারলাম না। সুগ্রীব, আমি একটু পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ
করব, তুমি আমার প্রাণপ্রতিম সন্তান অঙ্গদকে রক্ষা কর। আজ হতে তুমিই ওর
পিতা এবং রক্ষক। দেখ, ও তোমার সমস্ত কাজের সহায়ক হবে এবং যে কোন
যুদ্ধে তোমার পার্শ্বে দাঁড়াবে। তুমি ওকে পুত্রবৎ পালন কর, আর তীক্ষ্ন
বুদ্ধিসম্পন্না, তারার প্রতিটি নির্দেশ মান্য করে রাজকার্য পরিচালিত করবে। আমি
তারার নির্দেশ কর্ণপাত করি নাই বলেই আজ আমার এই দুর্গতি।

সুগ্রীব নীরবে বালীরাজের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। বালীরাজ ক্রমশই
নিস্তেজ হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হয়ে মহাবিশ্বে বিলীন
হয়ে গেল।

সকলে একসঙ্গে উচ্চরোলে ক্রন্দন করে উঠলেন। সুগ্রীব সক্রন্দনে দূরে
অন্তরালে দন্ডায়মান রাম-লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন—নরশ্রেষ্ঠ
রাম। তুমি তোমার কর্তব্য করেছ, কিন্তু আমি আমার ধিক্কৃত জীবন রাখতে আর
ইচ্ছা করি না। আমি ঋষ্যমূকেই চিরকাল বাস করব। রাজ্যসুখ চাই না।
আমিই তাঁকে হত্যা করেছি। আমি রাজ্য ত্যাগ করে বনে যাত্রা করছি, তোমার
আদেশে রাজপুত্র অঙ্গদ সসৈন্যে সীতা উদ্ধার করবে।

শোকার্ত সুগ্রীবের কথা শ্রবণ করে শ্রীরাম বিমনা হয়ে সজলনয়নে তারার দিকে
দৃষ্টিপাত করলেন। শোকবিহ্বলা তারা রামের দিকে তাকিয়ে বললেন—জিতেন্দ্রিয়,
মহাত্মা রামচন্দ্র, যে বাণে তুমি বালীকে হত্যা করেছ সেই বাণে আমাকেও হত্যা কর।
আমাকে হত্যা করলে, তুমি নারীজনিত হত্যার পাপে পতিত হবে না। কারণ
বালীর আত্মাই আমার আত্মা।

শ্রীরাম ধীরকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—বীরপত্নী, শোক ত্যাগ কর। মৃত ব্যক্তির
জন্য শোক ও পরিতাপ অবাঞ্ছনীয়। বিধাতা যখন জন্ম দিয়েছেন, মৃত্যুও
অবশ্যম্ভাবীরূপে একদিন দেখা দেবে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধির বিধান। কোন
মানুষের ক্ষমতা নেই, বিধির সেই বিধান লঙ্ঘন করে। একদিন আমার মৃত্যু হবে,
একদিন তোমার মৃত্যু হবে। তুমি বীরপত্নী। তোমার শোক সাজে না। বালীরাজ
যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম।
বালীরাজ স্বর্গলাভ করেছেন। যাও, তোমরা এখন সত্বর সচন্দন পুষ্প অর্ঘ্য দান
করে, মৃতদেহ সুসজ্জিত করে দাহ করার ব্যবস্থা কর। তারপর পুত্র অঙ্গদকে
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং সুগ্রীবকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে পরম শান্তি
শৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্য পালন কর।

তারাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলেন। বালীরাজের কদাচারে অত্যাচারে জর্জরিত তারাদেবী তাঁর উপর বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু সাহস ভরে তাঁকে কোন কথাই বলতে পারতেন না। তিনি এবং সুগ্রীব সমবয়সী, দুজনে বন্ধুর মত বড় হয়েছেন, উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যতা বিদ্যমান। তারাদেবী মনেপ্রাণে জানেন তাঁর আদেশ সুগ্রীব কদাপি অন্যথা করতে পারবেন না। সুগ্রীব রাজা হলে প্রকারান্তরে তিনিই রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হতে পারবেন, এ বিষয়ে কোন অন্যথা হবে না।

লক্ষ্মণ আদেশ দিলেন—সখা সুগ্রীব, মর্যাদার সঙ্গে বালীরাজের মরদেহ সংকারের আয়োজন কর।

সুগ্রীব লক্ষ্মণের আদেশে বালীরাজের মৃতদেহ একটি স্বর্ণখচিত পালঙ্কে স্থাপিত করলেন। নারীগণ ও পুরুষেরা বিভিন্ন পুষ্পে মরদেহ সজ্জিত করলেন, তারপর রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে শবদেহ বহন করে শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শোকদিবস গত হলে সুগ্রীব সিংহাসন গ্রহণ করলেন। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন—তোমরাও চল। আমার রাজপ্রসাদে অবস্থান করবে।

—সে হয় না। শ্রীরাম উত্তরদান করলেন্।

—আমি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—চতুর্দশ বর্ষ সন্ন্যাসীর ন্যায় বনে বাস করব। চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম হতে এখনও বাকী আছে, আমি রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠান করতে পারি না, তবে লক্ষ্মণ ইচ্ছা করলে তোমার প্রাসাদে বাস করতে পারে।

লক্ষ্মণ মৃদু হাস্যে প্রত্যুত্তর দিলেন—আপনি পরিহাস করছেন। আপনি যেস্থানে, সেস্থান ব্যতিরেকে অন্য কোথাও রাত্রিযাপন করব না, এ প্রতিজ্ঞা আমি আমার আত্মার নিকট করেছি। এ অবস্থায় আপনাকে পরিত্যাগ করে, আমার প্রাসাদে অবস্থান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের সুখদুঃখের প্রসঙ্গ পরিহার করে, বর্তমানে জননীপ্রতিমা আম সীতাদেবীকে অন্বেষণ করাই প্রধান কর্তব্য।

সুগ্রীব করযোড়ে বললেন—আমি মহাদেবী সীতার প্রসঙ্গ বিস্মৃত হই নি, কিন্তু বর্তমানে বর্ষা কাল। বর্ষা ঋতুতে অন্বেষণ করা সম্ভব নয়, কেবল লোকক্ষয় হবার ভীতি। বর্ষার অন্তে, আসন্ন শরৎকালে আমরা সীতাদেবীর অন্বেষণ করে, তাঁকে নিশ্চিতভাবে উদ্ধার করব।

—তথাস্তু। শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তরদান করলেন—আমরা বর্ষা ঋতু অপেক্ষা করব। শরৎকালের সূচনাতেই সীতার অন্বেষণ যাত্রা আরম্ভ হবে আশা করি।

—নিশ্চয়ই। আমি বাক্য দান করছি। সুগ্রীব সবিনয়ে নিবেদন করলেন।

—বেশ! তাহলে শরৎকালের সূচনাতেই আমাদের সাক্ষাৎ হবে, ততদিন তুমি

নির্বিঘ্নে রাজসুখ উপভোগ কর। যদি কোন বিপদ হয়, আমাদের স্মরণ করবে, আমরা তোমাকে উদ্ধার করব।

—শ্রীরামচন্দ্রের জয়। সুগ্রীব করযোড়ে প্রণাম করে অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি ।রিগণের সঙ্গে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরাম মৃদু হাস্য করলেন।

আঠারো

সুগ্রীব সহচরবৃন্দের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করলে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বললেন—ক্ষ্মণ, আমরা বর্ষা ঋতু প্রস্রবণ গিরির গুহায় অতিবাহিত করব। আমি গুহাটি র্যবেক্ষণ করে দেখেছি। অত্যন্ত সুন্দর স্থান। প্রশস্ত গুহায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে য়ু সঞ্চালন করে এবং সরীসৃপ প্রভৃতি জীব অবর্তমান। গুহার ভূমিতল অত্যন্ত ।রিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রস্তর নির্মিত মসৃণ। আমরা স্বচ্ছন্দে সেস্থানে বাস করতে ।ারব। বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হলে, নিশ্চয়ই সুগ্রীব সীতা অন্বেষণে আমাদের ।াহায্য করবে।

লক্ষ্মণ কোনরূপ মন্তব্য না করে কেবল বললেন—দেখা যাক।

সুগ্রীব অভিষেক উৎসবের পর, অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তারপর ানন্দ ও উপভোগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। প্রজাগণও সুখে ও নির্বিঘ্নে ত্যাগীতে অবসর যাপন করতে লাগলেন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অধিবাসিগণ ধিকাংশই নিরামিষাসী। সেই জন্য বর্ষার পূর্বেই যথেষ্ট খাদ্য ও মদ্য সংগ্রহ করে খেন এবং বর্ষা ঋতুতে বিশ্রামের সময় সেই সব ভোজ্যবস্তু আহার করেন। বর্ষান্তে াঁরা পুনরায় আপন কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সুগ্রীবও রাজ্যসুখে মত্ত হয়ে রুমা ও তারার সঙ্গে আনন্দ করতে লাগলেন।

বিলাসমগ্ন অবস্থায় কখন যে বর্ষা ঋতু অতিক্রম করে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছে ুগ্রীব অনুভব করতেও পারেন নি।

শরৎ ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরস্থির অথচ মহাবিক্রমশালী চরিত্রবান কৃতদার হনুমান সুগ্রীবের নিকটস্থ হয়ে বললেন—তুমি মিত্রের সহায়তায় রাজ্য এবং ক্ষ্মীলাভ করেছ। তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তুমি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করবে। এক্ষণে ীরাম কোন মন্তব্য করার পূর্বেই তুমি প্রতিজ্ঞামত তাঁর সাহায্যার্থে কর্তব্য সম্পাদন র। বিলম্বে কর্তব্য পালন করলে, হয়ত কর্তব্য সম্পাদন হবে, কিন্তু মিত্রের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক আছে তা বিনষ্ট হবে। মিত্রের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সেজন্য আমার উপদেশ, দেশের যেস্থানে যত স্বজাতি আছে সকলকে আহ্বান করে বীরগণকে নির্দেশ দান করে তাঁদের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করে সীতাদেবী অন্বেষণ কর।

সুগ্রীব হনুমানের উপদেশবাক্য শ্রবণ করে যেন সজাগ হলেন। তিনি সেই মুহূর্তে নীলকে আদেশ দিলেন—বীর নীল, তুমি একদিকে গমন কর এবং পঞ্চদশ রাত্রের মধ্যে আমাদের স্বজাতিগণকে কিষ্কিন্ধ্যায় আসবার জন্য আদেশ দেবে। যে এই আদেশ অন্যথা করবে, তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। সেই সঙ্গে আমার সৈন্য ও যূথপতি সমষ্টিকে সংগ্রহ কর।

নীল সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

সুগ্রীব হনুমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে আদেশ দিলেন—তুমি আর যুবরাজ অঙ্গদ অন্য দিকে যাত্রা করে আমাদের স্বজাতিকে এ স্থানে আসার নির্দেশ দাও।

হনুমান ও অঙ্গদ বিদায় নিলেন, সুগ্রীব পুনরায় তারা ও রুমার সঙ্গে প্রমোদবিহারে মত্ত হবার জন্য কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে অর্গল বন্ধ করে দিলেন।

আহারের জন্য ফল সংগ্রহ করে গুহামধ্যে প্রত্যাবর্তন করে লক্ষ্মণ দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বিষাদমগ্ন এবং অত্যন্ত কাতর। লক্ষ্মণ সহানুভূতি মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—আর্য, আপনি পত্নীশোকে এত মুহ্যমান হবেন না। মাতৃসমা জানকী অগ্নির ন্যায় পবিত্র। তাঁকে স্পর্শ করার ক্ষমতাও নেই দুরাত্মা রাবণের। যে মুহূর্তে জানকী অনুভব করবেন, তিনি কলঙ্কিত, সেই মুহূর্তে তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্রীরাম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—এই সময়ে নৃপতিগণ শত্রুজয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু কই, সুগ্রীবের উদযোগ কোথায়? সে কি রাজ্য লাভ করার পরই আমাকে বিস্মৃত হয়েছে? ভ্রাতা, তুমি একবার সুগ্রীবের কাছে যাও। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এস যে বন্ধুর উপকার বিস্মৃত হয়, সে পুরুষাধম। তাকে হত্যা করলেও কোন পাপ হয় না; তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করে সুগ্রীবকে বলবে, সে যদি প্রতিজ্ঞামত কার্য সম্পাদন না করে, তাহলে কৃতান্তের ন্যায় আমি উপস্থিত হব। বালী একা নিহত হয়েছে কিন্তু আমি সুগ্রীবকে সবান্ধব হত্যা করব।

লক্ষ্মণ সেই মুহূর্তে ভীষণাকার ধনুঃবহন করে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পৃষ্ঠদেশে তূণভরা শরগুচ্ছ।

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার উপকণ্ঠে উপস্থিত হতে সৈন্য ও রক্ষিগণ লক্ষ্মণকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে এক বিরাট টঙ্কার দিলেন। সেই টঙ্কারের শব্দ শুনে প্রহরিগণের ভয়ের সঞ্চার হল। তাদের মনে পড়ল বালী নিধনের দিন এমনিই টঙ্কার একবার মাত্র শ্রবণ করেছিল পরক্ষণেই তারা দেখেছিল

বার বালী ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সভয়ে ভীত হয়ে সৈন্যগণ ং রক্ষীদল ত্বরিত গতিতে সুগ্রীবের কক্ষসম্মুখে উপস্থিত হয়ে বারংবার তারস্বরে হ্বান করতে লাগল। কিন্তু সুগ্রীব তারাসমীপে মত্ত ছিলেন। সাধারণ রক্ষী সেনকদের কোন বাক্যই তাঁর কর্ণগোচর হল না। নিরুপায় ভীত সন্ত্রস্ত যুবরাজ ঙ্গদ ধীরপদে লক্ষ্মণ-সমীপে উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মণ উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বৎস। আমি তোমাদের কারও ওপর ুদ্ধ নই, তুমি কেবল সুগ্রীবকে সংবাদ দাও, আমি দ্বারদেশে অপেক্ষা করছি। তাঁর অভিরুচি হয়, তিনি যেন এই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য শ্রবণ করেন। ধার্কার, তুমি তাঁকে সংবাদ প্রদান করে, তাঁর বক্তব্য আমাকে এসে জানাবে।

লক্ষ্মণকে প্রণাম করে অঙ্গদ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হলেন। সুগ্রীব সে ে মত্ত লীলার অবসানে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কোন উপায় স্থির করতে না বে অবশেষে সকলে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দিল।

সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি সকলকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে বিমূঢ় হযে শ করলেন—কি সংবাদ?

যক্ষ ও প্রভাব নামধারী দুই মন্ত্রী রাজসকাশে সবিনয় নিবেদন করলেন—মহারাজ, পনি যুবরাজ অঙ্গদ এবং পাত্রমিত্রসহ যথাশীঘ্র সম্ভব লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন ং রামের আদেশ শ্রবণ করুন।

সুগ্রীব সচকিত। তিনি সভয়ে উক্তি করলেন—আমি তো জ্ঞানত কোন অপরাধ নি। এ নিশ্চয়ই কোন বন্ধুবেশী শত্রুর কাজ। সে আমার নামে লক্ষ্মণের ট মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছে। আমি অবশ্য রাম-লক্ষ্মণকে ভয় করি না কিন্তু অকারণে কুপিত হবেন তাও বাঞ্ছনীয় নয়।

পণ্ডিতপ্রবর হনুমান বীরগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—শ্রীরামচন্দ্র তোমার শুভার্থে ী বধ করেছেন, কিন্তু তুমি তাঁর উপকারের প্রত্যুপকারের কোনও ব্যবস্থাই করছ এই জন্য তিনি ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। তুমি স্বয়ং উপস্থিত হলেই দেখবে, তাঁর কোপ হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি কটুবাক্য প্রয়োগ করতে পারেন। তুমি নীরবে ণ করবে। কোন উত্তর দেবে না। এখন তুমি লক্ষ্মণকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে ন্ন করার চেষ্টা কর।

—যাও অঙ্গদ, তুমি মহাসমাদরে বন্ধুবর লক্ষ্মণকে আমার সমীপে উপস্থিত কর। াব আদেশ দিলেন।

অঙ্গদ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ ালেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন, পর একসময়ে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

রাজপুরীর দ্বারদেশে যে সমস্ত রক্ষী ও প্রতিহারী দণ্ডায়মান ছিল, তারা সকলেই

কৃতাঞ্জলি হয়ে অঙ্গদ ও লক্ষ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করল। লক্ষ্মণ এক একটি করে সাত কক্ষ অতিক্রম করে অবশেষে সুগ্রীবের কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন।

কক্ষের অভ্যন্তর হতে নর্তকীর নূপুর নিক্কণ শ্রবণ করে, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হলেন। তিনি সেস্থানেই দণ্ডায়মান অবস্থায় বিশাল ধনুকে টঙ্কার প্রদান করলেন। কক্ষমধ্যে সুগ্রীব সেই টঙ্কার শ্রবণ করে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারাদেবীকে অনুনয় করলেন—তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর এবং তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা কর।

মদিরাসক্তা তারা বিহ্বল ও স্খলিত পদক্ষেপে লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণ এ অবস্থার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। সুরাপানে মত্তা স্খলিতবেশা তারাকে অবলোকন করে তিনি লজ্জায় নতমস্তকে স্থির হয়ে রইলেন।

তারা জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—রাজপুত্র, তুমি এত কুপিত কেন? কে তোমার আদেশ লংঘন করেছে?

লক্ষ্মণ ধীরে গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দান করলেন—তোমার স্বামী সুগ্রীব কামাসক্ত। কর্তব্যপালনে ধর্মপালনে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। বর্ষা ঋতু অতীত, বর্তমানে শরৎ ঋতু।

তারাদেবী ধীর পদক্ষেপে লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—কুমার, তুমি বৃথা স্বজনের উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছ। সুগ্রীব তোমার বন্ধু; তোমার ভ্রাতৃপ্রতিম। এ কথা সত্য, কামের বশবর্তী হয়ে সে আমার সঙ্গে নিরন্তর কালযাপন করছে, কিন্তু সে কর্তব্যকর্মে কোথাও অবহেলা প্রকাশ করে নি। সে ইতিমধ্যেই নানা দেশ হতে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ প্রেরণ করেছে।

লক্ষ্মণ নীরব।

তারা আরও নিকটে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—রাজকুমার, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাসী, কিন্তু তুমি তো সন্ন্যাসী নও। তুমি অযথা কেন সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনযাত্রা পালন করছ? এস, তুমি আমার সঙ্গে আনন্দবিহারে মত্ত হয়ে জীবনের সুধা পান কর।

লক্ষ্মণ কোন উত্তর দান করলেন না। দীর্ঘ পদক্ষেপে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সুগ্রীব সেস্থানে রুমাকে আলিঙ্গন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। লক্ষ্মণকে দেখে তিনি সভয়ে দণ্ডায়মান হয়ে করযোড়ে অভ্যর্থনা জানালেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—যে অধার্মিক নৃপতি আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে বন্ধুকে ত্যাগ করে, তার ন্যায় নরাধম আর কেউ নাই। তাকে বধ করায় কোন পাপ হয় না। তুমি অনার্য, মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন। সুগ্রীব, আমি তোমাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি, তুমি বালীর পথে যাত্রা কর না।

সুগ্রীব কোন উত্তর দানের পূর্বেই তারাদেবী বললেন—ইনি শঠ, প্রবঞ্চক বা

মথ্যাবাদী নন। রাম সুগ্রীবের জন্য যা করেছেন, সুগ্রীব তা বিস্মৃত হন নি। তুমি সন্যাসী, তুমি সংসারজীবনের আদি কথা সঠিক জান না। সুগ্রীব সারাজীবন দুঃখ করেছেন। সম্প্রতি সুখভোগ করছেন, সেই জন্যেই বোধহয় যথাকালে কর্তব্য নিধারণ করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু আমি কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবের মুখপত্রী হয়ে তোমাকে বাক্য দান করছি, আজ অথবা কাল আমাদের সৈন্যসংগ্রহ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারপরই আরম্ভ হবে জয়যাত্রা।

তারার বাক্যে সুগ্রীব আশ্বাস পেয়ে বললেন—বন্ধুবর লক্ষ্মণ, আমি শ্রীরামের অনুকূল্যে জীবনের সমস্ত প্রসাদই লাভ করেছি। তিনি রাবণবধ এবং সীতা উদ্ধার কার্যে সার্থক হবেন। আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, আমাকে ক্ষমা কর।

লক্ষ্মণ প্রীত হয়ে উত্তর দান করলেন—কিষ্কিন্ধ্যা আধপতি সুগ্রীব, তুমি যখন আমাদের সহায, তখন আমরা আর ক্ষীনবল নই। তোমার সাহায্যে আমরা নিশ্চয়ই শত্রুনিধন করতে সমর্থ হব। তুমি নৃপতির যোগ্য বাক্যই উচ্চারণ করেছ। ঈশ্বরের কৃপাতেই আমরা তোমার বন্ধুত্ব লাভ করেছি। এখন আমার সঙ্গে রাম-সমীপে যাত্রা কর। রামকে তোমার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান কর। আমি তোমাকে যা বলেছি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশাকরি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

সুগ্রীব গভীর আলিঙ্গনে লক্ষ্মণকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করলেন।

সুগ্রীবের নির্দেশে বিভিন্ন সেনাপতি সৈন্যসামন্ত সহ বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন। তারাদেবী সুগ্রীবকে পরামর্শ দান করে বললেন—সুগ্রীব, তুমি দক্ষিণ দিকে অঙ্গদ ও হনুমানকে সৈন্যসহ প্রেরণ কর। আমি লোকমুখে শ্রবণ করেছি, কিছু বর্ষ পূর্বে কোন এক নারীকে রাবণ হরণ করে তাঁর রাজ্য লঙ্কায় নিয়ে গেছেন।

—রাবণ হরণ করেছেন, কি করে অনুমান করলে? সুগ্রীবের প্রশ্ন।

—সেই বিমানটি ছিল স্বয়ং রাবণের। পুষ্পকরথ। রাবণ নিজেও সেই বিমানে উপস্থিত ছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অধিবাসীগণ রাবণকে বিলক্ষণ জানে, কারণ একসময়ে রাবণের সঙ্গে বালীর যুদ্ধ হয়। রাবণের সঙ্গে যে রমণী ছিলেন, আমার বিশ্বাস তিনিই সীতা। তুমি লঙ্কায় অঙ্গদ ও হনুমানকে প্রেরণ কর। হনুমান মহাবীর এবং দীর্ঘ লম্ফে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি অনায়াসে সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হবেন।

সুগ্রীব এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সেইমত অঙ্গদ ও হনুমানের নেতৃত্বে সৈন্যদলকে দক্ষিণ দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আপন অঙ্গুলি হতে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় হনুমানকে অর্পণ করে বললেন—যদি সীতার সাক্ষাৎ পাও, এই অঙ্গুরীয় তাঁকে দেখিও। এই অঙ্গুরীয় দর্শনমাত্রই তিনি অনুভব করবেন,

আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি। আশীর্বাদ করি, তোমার অন্বেষণে তুমি সার্থক হও।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠগণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে অঙ্গদ ও হনুমান দক্ষিণাপথে সসৈন্য যাত্রা করলেন।

হনুমান ও অঙ্গদ ভারত-ভূখণ্ডের দক্ষিণ অংশের সমস্ত স্থানই অন্বেষণ করলেন. কিন্তু কোথাও সীতার দর্শন লাভ হল না। ক্লান্ত সৈন্যগণ বনমধ্যে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে লাগল। অঙ্গদ তাদের সান্ত্বনা এবং সাহস দান করে বললেন—আমরা বহুস্থানে অন্বেষণ করেছি, কিন্তু জানকীর সাক্ষাৎ পাই নি। আমাদের সময়কাল উত্তীর্ণপ্রায় এবং তোমরা সুগ্রীবের উগ্র শাসনের কথাও জ্ঞাত আছ। অতএব চল, আমরা শেষবারের ন্যায় আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করে সীতার অন্বেষণ করি।

সকলে একসঙ্গে অন্বেষণ আরম্ভ করল। যে বনে তারা প্রবেশ করল, সে বন অতি দুর্গম ও গভীর। দলছাড়া হয়ে পড়লে, সেখান হতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব এবং অনাহারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অঙ্গ স্পর্শ করে অগ্রসর হতে লাগল। বহুক্ষণ এই ভাবে অগ্রসর হয়ে অবশেষে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। দীর্ঘ এবং সর্পিল গুহাপথ দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। কিন্তু গুহামধ্যে আলোকবর্তিকা, মানুষের উপস্থিতির বহু নিদর্শন বর্তমান। মাসাধিককাল ভ্রমণ করেও হনুমান ও অঙ্গদ নিষ্ক্রমণের পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে গুহামধ্যে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে এক কক্ষের ন্যায় স্থানে উপস্থিত হলেন। সেস্থানে এক বৃদ্ধা তাপসী বাস করেন। হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে নিবেদন করলেন—আমরা জানকী অন্বেষণ করতে করতে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করেছি। আমাদের যে সময় নির্ধারিত ছিল, তা এই গুহামধ্যে ভ্রমণ করতে করতে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে বহির্গমনের পথনির্দেশ না করলে আমরা সকলেই এ স্থানে মৃত্যুবরণ করব।

বৃদ্ধা তাপসী মৃদু হাস্য করলেন। তিনি বললেন—এই গুহায় যে একবার প্রবেশ করে, তার প্রত্যাবর্তনের আর আশা থাকে না। যে অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে এ গুহায় প্রবেশ করে, সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণত্যাগ করে।

তাপসী অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—তোমরা সৎকার্যের জন্য যাত্রা করেছ এবং লক্ষ্য করেছি তোমরা কোনও অনিষ্টসাধন কর নি। আমি তোমাদের এক সর্তে বহির্গমনের পথনির্দেশ দান করতে পারি।

—আজ্ঞা করুন। সবিনয়ে হনুমান নিবেদন করলেন।

তাপসী প্রত্যুত্তর করলেন—সকলে পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করে চক্ষু বন্ধ কর। সর্বাগ্রে যে থাকবে, আমি তার হস্ত স্পর্শ করে অগ্রসর হব। যদি কেউ চক্ষু উন্মীলিত

করে, আমি সেই মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে যাব এবং সকলেই গুহামধ্যে মৃত্যুবরণ করবে।

—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য। হনুমান বিনীতভাবে নিবেদন করলেন এবং তাপসীর নির্দেশ অনুসারে সকলেই চক্ষু বন্ধ করে অগ্রসর হলেন।

—চক্ষু উন্মীলিত কর।

তাপসীর গম্ভীর নির্দেশে সকলেই চক্ষু উন্মীলিত করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন!

সম্মুখে সীমাহীন গভীর নীল মহাসমুদ্র। সমুদ্রের অন্তস্তল হতে ধীরে ধীরে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। দিবাকরকে অবলোকন করে হনুমান অনুমান করলেন, এই মহাসমুদ্র স্থলভাগের পূর্বে অবস্থিত। পশ্চাৎপানে দৃষ্টিগোচর করে অবলোকন করলেন তৃণভূমি এবং পর্বতমালা। অদূরে পর্বততরঙ্গের ভূমিদেশে অবস্থিত সেই গুহাপথ, যে গুহাপথ হতে সদলে সকল সৈন্য গুহার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তাপসীর পানে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি বললেন—তোমরা স্বভাবে শান্ত এবং ভদ্র, সেইজন্য এবারের ন্যায় গুহা হতে মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনদিন প্রবেশ কর, সদলে তোমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমি পুনরায় তোমাদের উদ্ধার কার্যে সাহায্য করব না।

তাপসী অতিরিক্ত একটি বাক্যও উচ্চারণ না করে পুনরায় গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন।

অঙ্গদ অল্পক্ষণ বিহ্বল নেত্রে হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, মহাবীর হনুমান। আমরা কোন্ দেশে উপস্থিত হলাম? এ স্থানে সীতাদেবীর উপস্থিতির চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নেই।

সীতাদেবীর উদ্ধারকার্য অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করে যদি আমরা কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে রাজা সুগ্রীব আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

অঙ্গদ সক্রন্দনে বললেন—পিতৃব্য সুগ্রীব স্বভাবতঃই আমার উপর বিরূপ। তিনি মাতার প্রতি অনুরক্ত এবং মাতাও তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়জন রূপে চিন্তা করেন। মাতা চিরকাল পিতার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করে এসেছেন। তিনি পিতৃব্যের প্রতি আসক্তা এবং বর্তমানে বিপিতা। এমতাবস্থায় মাতা আমাকে পিতৃব্যের ক্রোধ হতে রক্ষা করবেন না। আমার মৃত্যু অবধারিত। আপনারা কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে জানকীর ব্যর্থ অন্বেষণের সংবাদ রাজা সুগ্রীবকে প্রদান করুন। আমি চিরকালের জন্য দেশান্তরিত হয়ে অন্যত্র বাস করব।

হনুমান অঙ্গদের বিলাপের বিন্দুমাত্রও শ্রবণ করেন নি। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। অনেকক্ষণ অন্বেষণের পর তাঁর মুখমণ্ডলে আশার আলোক সঞ্চারিত হল। দূরে পর্বতোপরে বৃক্ষান্তরাল হতে ধূম্রজাল উদ্গীরিত হয়ে আকাশপথে বিস্তারিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই ওই স্থানে কোন মানুষের বসবাস আছে।

অঙ্গদ হনুমানের নিকট হতে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে হতাশায় অন্ধ হয়ে সৈন্যদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—তোমাদের মধ্যে যে সকল সৈন্য কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত নও, তারা আমাকে অনুসরণ করতে পার। আমরা অন্য রাজ্য স্থাপিত করব।

সৈন্যদল ভীত হয়ে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—আমরা নিহত না হই, সেই ব্যবস্থাই কর। আমরা কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে আর প্রত্যাবর্তন করব না। সেস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে নিষ্ঠুর সুগ্রীব আমাদের হত্যা করবেন।

হনুমান প্রমাদ গণলেন। অঙ্গদ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সৈন্যমধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন এবং তার আজ্ঞা অধিকাংশ সৈন্যই পালন করবে, এ সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিন্ত।

হনুমান এ অবস্থায় বিচলিত না হয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন—অঙ্গদ, তুমি ধীমান। তারাপুত্র হয়ে তোমার ইদৃশ চপলমতিত্ব শোভা পায় না। তুমি স্থির থাক। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আমরা মাতা জানকীর সন্ধান নিশ্চিতভাবে পাব।

অঙ্গদ চরম হতাশার সঙ্গে উত্তর দান করলেন—কী ভাবে, কোথায় জানকীর সন্ধান পাব, সেকথা আপনি বলুন।

—ওই দেখ ধূম্রজাল। ওখানে নিশ্চয়ই কেউ বাস করে। ঐ স্থানে উপস্থিত হলে আমার মনে হয়, কোন সূত্র পেতে পারি।

হনুমান বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং চিরকুমার। চরিত্রবলও অসাধারণ। একদা এক দুর্ঘটনায় তাঁর হনু ভগ্ন হয়, সেইজন্য তিনি আপন পরিচয় হনুমানরূপে নামাঙ্কিত করেন। ভগ্ন হনুর জন্যই তিনি কুৎসিত দর্শন এবং সেইজন্যই চিরকুমার। তিনি সহাস্যে ঘোষণা করেছিলেন—কুৎসিত পুরুষের বিবাহ অপরাধ। একটি নিরীহ নারীকে কেবল যন্ত্রণা দান করা।

তিনি বিবাহের পর বাহ্যত হয়ত নীরব থাকবেন, কিন্তু সদাসর্বদা কুৎসিত স্বামীকে দর্শন করে আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ হবেন। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যাও অসম্ভব নয়। সর্বদিক চিন্তা করে হনুমান সাংসারিক জীবনের স্বপ্ন পরিত্যাগ করে আজীবন পরোপকারে আপন সত্তা উৎসর্গ করেছেন।

এ সব তথ্য অঙ্গদেরও অজ্ঞাত নয়। হনুমানকে সেইজন্য সকলে সমীহ করে এবং তাঁর বাক্য মঙ্গলময় চিন্তা করে সকলে সুস্থির মস্তিষ্কে পালন করে।

অঙ্গদ ধূম্রজালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন—ঐ স্থানে যদি কোন শত্রু অবস্থান করে?

—আমরা তো পূর্বেই আক্রমণ করছি না। অকারণে অপরিচিত জন আমাদের শত্রুতা সাধন কেন করবে? আমরা প্রথমে আমাদের আগমনের হেতু ওদের নিকট ব্যক্ত করব। তা সত্ত্বেও আক্রমণ করলে, আত্মরক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করব। আত্মরক্ষার কারণে যুদ্ধ করলে কোন অপরাধ হয় না।

অঙ্গদ হনুমানের বাক্যে পুনরায় আত্মবিশ্বাস লাভ করলেন। বিনীত ভাবে তিনি বললেন—আমার ধৃষ্টতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যা আজ্ঞা করবেন, আমি তা যথাযথ পালন করব।

হনুমান প্রীত হয়ে বললেন—বৎস! বিপদে কখনও বিচলিত হতে নাই। কোন চিন্তা কর না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। সমস্ত কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। এখন ওই উপত্যকাভূমিতে অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হও।

সর্বাগ্রে অঙ্গদ ও হনুমান, পশ্চাতে সৈন্যদল। সকলে পর্বতারোহণ আরম্ভ করলেন। পর্বতশৃঙ্গের মধ্যস্থলে উপত্যকা। উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্বে পুনরায় পর্বতমালার সৃষ্টি। সেই পর্বতমালার পাদদেশে একটি বিশাল গুহা। গুহার সম্মুখে এক জরাজীর্ণ অসুস্থ পঙ্গু বৃদ্ধ আহারের নিমিত্ত কোন বস্তু অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পরক্ষণেই অগ্নি হতে উদ্ধার করে, একটি পাত্রে সংগ্রহ করছেন।

সদলবলে অঙ্গদ ও হনুমানের অকস্মাৎ উপস্থিতিতে বৃদ্ধ মুহূর্তকাল বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই পার্শ্বে রক্ষিত লোষ্ট্রখণ্ড দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করে নিক্ষেপের ভঙ্গি করলেন। হনুমান ঊর্ধবাহু হয়ে তাঁকে নিষেধ করলেন। বৃদ্ধ হনুমানের নিষেধ বাক্য মান্য করে আঘাত করলেন না। হনুমান ও অঙ্গদ বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে আপন আপন পরিচয় দান করলেন।

বৃদ্ধ নিজের পরিচয় প্রদান করলেন—আমি সম্পাতি। জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

—জটায়ু? যিনি সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন?

—কি বললে? জটায়ু জীবিত নেই। রাবণ তাকে হত্যা করেছে?

—হ্যাঁ। অঙ্গদ উত্তর দান করলেন।

কিছুক্ষণ শোকে মুহ্যমান হয়ে রইলেন বৃদ্ধ সম্পাতি। শোকের প্রাথমিক আঘাত কোনরূপে সহ্য করে ম্রিয়মান কণ্ঠে সম্পাতি প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি কারণে এত দূরদেশে?

অঙ্গদ বিনীতভাবে উত্তর দান করলেন—রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। আমরা রাম ও সুগ্রীবের আদেশে সীতাদেবীর অন্বেষণে ভ্রমণ করছি। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই পারি। বৃদ্ধ সম্পাতির মুখমণ্ডলে উত্তেজনার রক্ত সঞ্চালন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—জটায়ুর ন্যায় আমারও একটি ক্ষুদ্র বিমান ছিল, কিন্তু

দুর্ঘটনায় সেটি ভস্মীভূত হয়ে সমুদ্রবক্ষে পতিত হয়। আমিও আহত হ
এবং শরীরের অধিকাংশ স্থান দগ্ধ হয়। সেই সময় হতে আমি পঙ্গু ও উত্থানশক্তি
রহিত। আমার একমাত্র পুত্র সুপার্শ্ব আমাকে উদ্ধার করে এ স্থানে রক্ষা করে
আমি তখন সম্পূর্ণ অচেতন। জ্ঞানপ্রাপ্ত হবার পর আমি লক্ষ্য করলাম আমা
উত্থানশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট এবং আমার পার্শ্বে সুপার্শ্ব। তাকে প্রশ্ন করে
দুর্ঘটনার সমস্ত বিষয় অবগত হলাম।

বৃদ্ধ অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন—জটায়ু মৃত। প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা
আমার অবলুপ্ত, নইলে দুরাত্মা রাবণ আমার হাতেই নিহত হত।

—আপনি কি রাবণকে দেখেছেন? অঙ্গদ উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—নিশ্চয়ই দেখেছি। একদিন পুষ্পকরথে রাবণ আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে
চলেছিল। তার রথে এক অপরূপা সুন্দরী রমণী ছিলেন। তিনি 'হা রাম, হা
লক্ষ্মণ' উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন এবং গাত্র হতে আভরণ খুলে ভূমিতে
নিক্ষেপ করছিলেন। আমার সন্দেহ, তিনিই স্বয়ং সীতা।

—রাবণের নিবাস কোথায়?

—এ স্থান হতে শত যোজন পূর্বে লঙ্কা দ্বীপ নামে এক দ্বীপ আছে
সেই দ্বীপের অধীশ্বর বিশ্রবার-পুত্র রাবণ। রাবণ অত্যন্ত বলশালী
উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

হনুমান চিন্তিত হয়ে বললেন—লঙ্কা দ্বীপে পৌঁছবার কোন প
বিদ্যমান আছে?

—না।

হনুমান নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। শত যোজন দীর্ঘ লম্ফ দান করবার
ক্ষমতা তাঁর নাই, এক দমে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক লম্ফ দান করতে পারেন স
যোজন।

—লঙ্কা দ্বীপ সঠিক কোথায় অবস্থিত আমাদের দয়া করে জ্ঞাত করা
পারেন?

সম্পাতি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তর দান করলেন—আমি উত্থানশক্তি রহিত
তোমারা যদি আমাকে সমুদ্র তীরে বহন করে নিয়ে যাও, আমি সঠিক স্থান নি
করতে পারব, এ কার্য ব্যতিরেকেও আমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর আত্মাতৃপ্তির জ
তর্পণ সম্পন্ন করতে পারি।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—অঙ্গদ সানন্দে উত্তর দান করলেন, তারপর সৈন্যদে
প্রতি দৃষ্টিপাত করে আদেশ দিলেন—তোমরা অত্যন্ত যত্ন ও মর্যাদার সঙ্গে মহাম
সম্পাতিকে ধীরে ধীরে সমুদ্র সৈকতে বহন করে নিয়ে চল। ওঁর নির্দেশিত প
আমরা যাত্রা করব।

দশ-বারো জন সৈন্য সম্পাতিকে স্কন্ধে নিল, তারপর সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশে যাত্রা করল।

সমুদ্র তীরের বালুকাবেলায় সম্পাতি একস্থানে পেঁছে বললেন—এই স্থান হতে পূর্ব এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপ অবস্থিত। এই স্থান হতে লঙ্কা দ্বীপের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম। একশত যোজন। পঞ্চাশ যোজন দূরে সমুদ্রবক্ষে এক পর্বত বিদ্যমান, তার নাম মৈনাক পর্বত। পর্বতের শীর্ষদেশ কোন সময়ে জলের নীচে যায় আবার কোন সময়ে শিখর দৃশ্যমান হয়। আমি বহুবার আকাশ পথে ভ্রমণের সময় এই পর্বতশিখর লক্ষ্য করেছি।

হনুমান তাঁর কর্তব্য মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন। তিনি এই স্থানের পর্বতগাত্র হতে দীর্ঘ লম্ফ দান করবেন এবং মৈনাক পর্বতে অবতরণ করে, পুনরায় লংকা দ্বীপের জন্য লম্ফ দান করবেন।

—আমাকে জল স্পর্শ করবার সুযোগ দাও—সম্পাতি অনুনয় করলেন। হনুমান সম্পাতিকে ক্রোড়ে তুলে কটিদেশ পর্যন্ত জলে নিমজ্জমান হলেন এবং সম্পাতিকে স্নান করালেন। সম্পাতি স্নান করে জটায়ুর তর্পণ করলেন এবং সমুদ্র স্নানের পর অনেক সুস্থ বোধ করলেন। তিনি সানন্দে বললেন, আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি। আশাকরি আমি পদব্রজে গমন করতে পারব। তোমাদের মঙ্গল হোক।

সম্পাতি আশীর্বাদ করে ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন।

হনুমান অঙ্গদকে বললেন—আমি পর্বতগাত্র হতে বিদ্যুৎগতিতে যাত্রা করে লম্ফ প্রদান করব। পঞ্চাশ যোজন দূরে মৈনাক পর্বতে অবতরণ করে, সেই মুহূর্তে পুনরায় লম্ফ প্রদান করে লংকা দ্বীপে অবতরণ করব। তারপর সীতাদেবীর অন্বেষণ করব। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময় করে, আমাদের সমস্ত সংবাদ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সংবাদ এবং আমাদের রণসজ্জার প্রস্তুতির কথা জ্ঞাত করে পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাবর্তন করব। তোমরা এ স্থান হতে অন্য কোথাও গমন করবে না, তাহলে তোমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

অঙ্গদ সৈন্যদলকে সেস্থানে অপেক্ষা করতে বলে হনুমানের সঙ্গে উপত্যকা ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। যাত্রার পূর্বে হনুমান বানর-চর্ম নির্মিত পোশাক পরিধান করলেন। হনুমানের এই পোশাকের বিশেষত্ব, এ পোশাক অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, অথবা জলে সিক্ত হয় না। অতিরিক্ত তীক্ষ্ন শর ব্যতিরেকে কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে চর্ম আচ্ছাদন ভেদ করতে পারে না। এই ধরনের পোশাক পরিধান করলে অনায়াসে অতি উচ্চ বৃক্ষচূড়ে পেঁছান যায় এবং অনেক উচ্চ হতে লম্ফ প্রদান করলে সহজে শরীরে আঘাত লাগে না।

হনুমান বিদ্যুৎবেগে আকাশ পথে লম্ফ প্রদান করলেন এবং চক্ষের নিমেষে দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে গেলেন।

হনুমান লম্ফ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক লক্ষ্য করলেন এবং আপন দিক নির্ণয় করতে লাগলেন। সূর্য লক্ষ্য করেই তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন।

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ যোজনের মধ্যে মৈনাক পর্বত অবস্থিত। মৈনাক পর্বতের শীর্ষদেশ হনুমানের দৃষ্টিগোচার হল। তিনি সাব্যস্ত করলেন, পর্বতের শীর্ষদেশ স্পর্শ করে পুনরায় লম্ফ প্রদান করলে হয়ত লঙ্কা দ্বীপে পৌঁছুতে পারবেন, কিন্তু কোন কারণে যদি শ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহলে আর অতদূরে পৌঁছুবার কোন আশা নাই।

মৈনাক পর্বত স্পর্শ করে পুনবায় একই শ্বাসে লঙ্কা দ্বীপ অভিমুখে লম্ফ প্রদান করলেন হনুমান।

যতই হনুমান লঙ্কা দ্বীপের নিকট অগ্রসর হলেন, ততই গৃহ, অট্টালিকা, প্রাসাদ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হল। দ্বীপের মধ্যস্থলে প্রাচীরবেষ্টিত নগরী লঙ্কাপুরী। লঙ্কা দ্বীপ তীরের নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান আপন গতিকে স্তিমিত করলেন, তারপর বালুকা ভূমির ওপর পতিত হলেন।

লঙ্কা দ্বীপের এই প্রান্ত নির্জন এবং লোকবাস প্রায নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হনুমান অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম করলেন। তাঁর অন্তরে আনন্দের উত্তেজনা তিনি এখন এই নূতন দেশে পরিভ্রমণ করে সীতাদেবীব অন্বেষণ করবেন। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে। কোন লোক যেন অনুভব কবতে না পারে কোন বিদেশীর আবির্ভাব ঘটছে এই রাজ্যে।

ত্রিকূট পর্বতের ওপর অবস্থিত লঙ্কা অভিমুখে অতি সন্তর্পণে যাত্রা করলেন হনুমান। পথিমধ্যে হনুমান দর্শন করলেন হারিদ্রাবর্ণ তৃণভূমি, পুষ্পশোভিত বনরাজি, সরল কর্ণিকার কুটজ কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ এবং হংস-কারণ্ডব সমাকীর্ণ পদ্ম উৎপল শোভিত বহু সরোবর দর্শন করলেন।

পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত লঙ্কাপুরী সত্যই বমণীয়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার বিদ্যমান, হনুমান চতুর্দিক লক্ষ্য করে ধীর ও নিঃশব্দ পদক্ষেপে উত্তর দ্বারের নিকট উপস্থিত হলেন।

হনুমান চিন্তিত হয়ে ভাবলেন, এস্থানে সুগ্রীবরাজের সসৈন্য আগমন করা নিরর্থক হবে, কারণ এই প্রকার দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নগরীমধ্যে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। শ্রীরাম-লক্ষ্মণই বা কী করবেন?

হনুমান আপন মনেই চিন্তা করে স্থির করলেন, পূর্বে বৈদেহীর অবস্থিতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ গ্রহণ করা যাক, পরে যথাযথ কর্তব্য নির্ধারণ করা যাবে।

সন্ধ্যাকালে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার নামার কিয়ৎকাল পরে অতি সন্তর্পণে, মার্জারের ন্যায় নিঃশব্দে হনুমান প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করলেন।

নগরমধ্যে প্রবেশ করে হনুমান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। নগরের মধ্যে সাগরের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু সঞ্চালিত। সারি সারি সুসজ্জিত গৃহ। মধ্যে প্রশস্ত রাজপথ। কোন গৃহ হতে কিংকিনীর নূপুর নিক্কণ ধ্বনিত, কোন গৃহ হতে সংগীত ধ্বনি শ্রুত। হনুমান সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, লঙ্কার গৃহদ্বার স্বর্ণনির্মিত। সোপানশ্রেণী মূল্যবান রত্নখচিত, সর্বস্থান জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত।

হনুমান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলেন না, কোন্‌দিকে যাত্রা করবেন ? দিক নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে একটি প্রশস্ত পথ অবলম্বন করে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন।

অল্পক্ষণ অগ্রসর হতেই এক গৃহ হতে জনৈকা সশস্ত্র নারী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কঠিন কণ্ঠে হনুমানকে প্রশ্ন করলেন—তুমি কে ?

হনুমান বিব্রত। এরূপভাবে অকস্মাৎ মহিলার সম্মুখ দর্শনে কিঞ্চিৎ হতবাক, পরক্ষণেই সম্বিৎপ্রাপ্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি কে ?

নারী আত্মপরিচয় দান করলেন—আমি লঙ্কা। এই নগরীর রক্ষাকর্ত্রী। নগরীর সমস্ত নিরাপত্তা আমি রক্ষা করি। তুমি লঙ্কার অধিবাসী নও, আমি লঙ্কার প্রত্যেক অধিবাসীকে প্রত্যক্ষভাবে জানি। তুমি আগন্তুক। তোমার সঠিক পরিচয় জ্ঞাপন না করে এবং আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত না করে তুমি লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

—কিন্তু তুমি নারী। কোন নারীকে বধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তবে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও। ত্বরিত গতিতে লঙ্কা হনুমানকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু হনুমান তদপেক্ষা ত্বরিত গতিতে বাম হস্তে লঙ্কার মুখে একটি চপেটাঘাত করলেন। এইরূপ বলিষ্ঠ আঘাতের জন্য লঙ্কা প্রস্তুত ছিলেন না। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় কিছুদূরে পতিত হয়ে ভীতভাবে লঙ্কা সবিনয়ে বললেন—আগন্তুক, আপনি কে জানি না, কিন্তু আপনি অসীম সাহসী এবং বলশালী। আপনার নিকট আমি পরাজয় স্বীকার করে এই মুহূর্তে লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করছি, কারণ রাবণ আমাকে পরাজিত অবস্থায় জীবিতা দেখলে অবশ্যই বধ করবেন। মহাশয়, আপনি ব্যক্ত করুন কী কারণে আপনার এই পুরীতে আগমন ?

হনুমান তথাপি আপন পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখে বললেন—আমি লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য উপভোগ করার হেতু উপস্থিত হয়েছি।

—কিন্তু আমি অনুভব করছি লঙ্কার পাপ পূর্ণ হয়েছে। অবিরত নারী লাঞ্ছনা ঘটছে। সেই লাঞ্ছনার সর্বশেষ নিদর্শন সীতাহরণ। সীতাদেবী, শুনেছি,

অযোধ্যা নামের এক রাজ্যের রাজপত্নী। সেই রাজার নাম শ্রীরাম। যেদিন হতে রাবণ সীতাকে বন্দিনী করে রেখেছেন, সেইদিন হতে রাজ্যে নানা অমঙ্গল পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি কোনদিন কারুর নিকট পরাস্ত হই নি। আজ সেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলাম। আমি ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছি, রাবণের পাপে লংকা ধ্বংস আসন্ন।

লঙ্কা প্রস্থান করলেন। হনুমান পুনরায় সেই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করে নগরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হলেন। হনুমান লঙ্কার বাক্যে অনুমান করলেন সীতাদেবী এখনও জীবিতা, কোথাও বন্দিনী হয়ে জীবনযাপন করছেন।

পথের দুই পার্শ্ববর্তী গৃহগুলি লক্ষ্য করে হনুমান বিস্মিত। প্রত্যেকটি ভবন শুভ্রমেঘ বর্ণ এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাকার। কোথাও স্বল্প আলোকে মধুর সংগীত কোথাও বা নৃত্যের মৃদু ঝঙ্কার, আবার কোথাও প্রতিহারী সৈনিকের সিংহনাদ। কোন কোন ভবন হতে বেদমন্ত্র উচ্চারিত। এক গৃহমধ্যে, হনুমান অন্তরাল হতে লক্ষ্য করলেন, অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁদের কেউ বা মুণ্ডিত মস্তক আবার কেউ বা জটাজুটধারী। এরা বোধহয় গুপ্তচর।

হনুমান নিঃশব্দে সমস্ত লক্ষ্য করে আরও অগ্রসর হলেন। বর্মধারী তেজস্বী সৈনিকেরা বিবিধ অস্ত্র নিয়ে পদচারণা করছে, দ্বারদেশে শ্বেতহস্তী ও অশ্ব বিচরণ করছে। পথিপার্শ্বে বহু রথী ও বিমান সুসজ্জিত। হনুমান অতি সন্তর্পণে সকলের অলক্ষ্যে সেস্থান পরিত্যাগ করে পুনর্বার অগ্রসর হলেন।

হনুমান বিচরণ করতে করতে একটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত স্বর্ণনির্মিত তোরণদ্বার ও প্রকোষ্ঠ। গজারোহী মাহুত, অশ্ব ও রথসহ সারথি। সালঙ্কারা বরনারীগণ নানা স্থানে বিদ্যমান। কোন স্থানে ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খবাদ্য সহ দেবতাগণের পূজা হচ্ছে। হনুমান অতি সন্তর্পণে ও সঙ্গোপনে অগ্রসর হলেন।

অনেক গৃহ এবং উদ্যান অতিক্রম করে হনুমান একটি নয়নাভিরাম নিকেতনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। চতুর্দিকে নানা আকারের শিবিকা এবং লতাগৃহ। মধ্যে চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ এবং কামগৃহ অবলোকন করে অবশেষে একটি অপূর্ব বিশাল কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কক্ষ সংলগ্ন উদ্যানে মণিমুক্তাখচিত একটি বিমানরথ দর্শন করলেন এবং মনে মনে স্থির করলেন, এটি নিশ্চয়ই পুষ্পকরথ। পুষ্পকরথ-সংলগ্ন এই স্বর্গসম প্রশস্ত সুন্দর কক্ষটি নিশ্চয়ই লঙ্কাধিপতি রাবণের। হনুমান অন্তরে রোমাঞ্চিত। তাঁর বাহ্যিক প্রকাশ আচ্ছাদনের নীচে অবলুপ্ত।

হনুমান অনুমান করলেন, রাবণের বাসগৃহ এক যোজন দীর্ঘ, অর্ধ যোজন প্রস্থ। রক্ষকগণ অস্ত্র উদ্যত করে সদাসর্বদা রত। পার্শ্ববর্তী বহু কক্ষে রমণীগণ নিদ্রা প্রহরায় মগ্না। হনুমান সবিস্ময়ে সেই প্রাসাদ পরিভ্রমণ করে চিন্তা করলেন, এ কি স্বর্গপুরী?

একটি সুবিশাল কক্ষের মধ্যে এক স্ফটিক নির্মিত বেদী লক্ষ্য করলেন। একদিকে শ্বেতশুভ্র রাজছত্র, অপর প্রান্তে হস্তীদন্ত ও কাঞ্চন নির্মিত রত্নখচিত মহামূল্যবান পর্যঙ্ক। পর্যঙ্কের পার্শ্বদেশে চামরধারিণী শুভ্রবেশ পরিহিতা পুত্তলিকাবৎ চতুষ্টয় পরিচারিকা দণ্ডায়মানা। সেই পর্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ মহার্ঘ শয্যাস্তরণের উপর শায়িত দেবতানিন্দিত এক রূপবান পুরুষ। তাঁর গাত্রবর্ণ মেঘের ন্যায়। রক্তচন্দন চর্চিত ললাট ও গাত্র। পরিধানে স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত বস্ত্র। ঊর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত ও মহামূল্যবান আভরণে সজ্জিত।

হনুমান দর্শনমাত্রই হতচকিত হয়ে কিঞ্চিৎ পশ্চাদাপসরণ করলেন, পরক্ষণেই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলেন, ইনিই রাবণ।

ধীর নিঃশব্দপ্রায় পদক্ষেপণে অগ্রসর হয়ে নিদ্রামগ্ন রাবণকে নিরীক্ষণ করলেন। পর্যঙ্কের চতুর্দিকে চারটি কাঞ্চনদীপ স্নিগ্ধ আলোক বিকীরণ করছে। পদতলে বহু নারী অসলগ্ন অবস্থায় নিদ্রিতা। কক্ষের মধ্যে অদূরে একটি পৃথক শয্যায় নিদ্রিতা কনকবর্ণা এক রূপসী। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই লঙ্কেশ্বরের অন্তঃপুরেশ্বরী মহারানী মন্দোদরী। প্রথমে হনুমান চিন্তা করেছিলেন, ইনি সীতা, পরক্ষণেই তাঁর ভ্রান্তি দূর হল। সীতাদেবী কখনই রামবিহনে এত নিশ্চিন্তে নিদ্রাভিভূতা হতে পারেন না। ইনি নিশ্চয়ই মন্দোদরী।

হনুমান সেস্থান হতে নিঃশব্দে প্রস্থান করে রাবণের পানশালায় প্রবেশ করলেন। সেস্থানে বহু নারী সুরাপানে মত্ত হয়ে অবশেষে গভীর ক্লান্তিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নিদ্রিতা অবস্থায় শায়িতা রয়েছেন।

অধিকাংশ রমণীর অঙ্গে বস্ত্র নাই। উন্মুক্ত নারী-শরীর দর্শন করে হনুমানের মনে সংকোচ, লজ্জা ও অপরাধবোধ অনুভূত হল। তিনি ভাবলেন, এইভাবে নিদ্রিতা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা পাপ। তিনি কক্ষের নিকট হতে দূরে গমন করে আপনমনেই নিজের কর্মবিষয়ে সমালোচনা করতে লাগলেন। একবার চিন্তা করলেন, তিনি যা করছেন, পাপকর্ম করছেন। পুনর্বার চিন্তা করলেন, জানকীর দর্শনলাভের জন্য নারী অন্বেষণ একান্তভাবে প্রয়োজন, এবং তিনি যা করছেন, অত্যন্ত শুদ্ধচিত্তেই করছেন। অতএব তিনি কোন অন্যায় করেন নি এবং এইভাবেই তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে।

এইভাবে হনুমান লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, নিশাগৃহ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে সীতাদেবীর অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। একবার চিন্তা করলেন, রাবণ কি সীতাদেবীকে হত্যা করেছেন? সীতাদেবীর অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে হনুমান যদি প্রত্যাবর্তন করেন, তাহলে শোকে মুহ্যমান হয়ে শ্রীরাম দেহত্যাগ করবেন। রামের বিহনে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রাণত্যাগ করবে। সেই শোকে সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যাবাসী প্রাণ বিসর্জন দেবে। এই অবস্থায় সীতার সংবাদ সংগ্রহ

না করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই আসে না। যদি তিনি প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহলে আশায় আশায় সকলে প্রাণধারণ করবেন।

হনুমান সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার অন্বেষণ আরম্ভ করলেন। ভ্রমণ করতে করতে সহসা তিনি একটি অশোকবন নিরীক্ষণ করলেন। সেই অশোকবনে তিনি ইতিপূর্বে অন্বেষণ করেন নি চিন্তা করে, এক উচ্চ লম্ফে তিনি বনপ্রাচীরের শীর্ষে উপস্থিত হলেন। প্রাচীরশীর্ষ হতে লক্ষ্য করলেন, অশোকবনের মধ্যে অগণিত পুষ্প ও ফলবৃক্ষ বিরাজ করছে। চতুর্দিক অন্বেষণ করতে করতে অকস্মাৎ হনুমানের দৃষ্টি একটি শিংশপা বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হল। কাঞ্চন বর্ণ শিংশপা তরুর তলদেশে এক স্বর্ণময় বেদী। হনুমান আরও স্পষ্টভাবে সমস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করার উদ্দেশে, বৃক্ষেব শীর্ষদেশে অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে আরোহণ করলেন।

বৃক্ষচূড় হতে হনুমান লক্ষ্য করলেন, শিংশপা তরুতলে এক অনিন্দ্যসুন্দরা রমণী উপবিষ্টা। তিনি শোকগ্রস্তা জীর্ণবস্ত্র পরিহিতা, উপবাসক্লিষ্টা এবং নতমস্তক। তিনি ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন এবং চক্ষু দুটি অশ্রুসজল একবেণীধরা সেই রমণীকে পবিবেষ্টন করে বিকট দশনা, কুৎসিত রূপ প্রতিহারিণীগণ প্রহরায় রত।

হনুমান অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন, সেই রমণীর অঙ্গে কয়েকটি আভরণ। হনুমান চিন্তা করে দেখলেন, ঋষ্যমূক পর্বতে যে আভরণগুলি সীতাদেবী আকাশপথ হতে নিক্ষেপ করেছিলেন, এই রমণীর গাত্রে সেই আভরণসজ্জাব সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হনুমান বিচার করে দেখলেন, যে অলঙ্কারগুলি সীতাদেবী হরণকালে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই অলঙ্কারগুলি রমণীর গাত্রে নাই, অন্য অলঙ্কারগুলি যথাস্থানে বিদ্যমান। হনুমান স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলেন, ওই শ্রদ্ধেয়া রমণীই সীতাদেবী। হনুমান আর একবার প্রতিহারিণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তারা ঘোরদর্শনা, কুৎসিত ও বিকটরূপিণী। হনুমান চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে সীতাসকাশে গমন করবেন, কী-ভাবেই বা তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করবেন। অকস্মাৎ হনুমানের দর্শনে সীতাদেবী ভীত হযে চিৎকার করতে পারেন, ফলস্বরূপ সমস্ত প্রতিহারিণীগণ ভয়ার্ত চিৎকার করবে। সকলের আর্তনাদে সৈন্যদল এবং রক্ষীদল উপস্থিত হবে, তার ফলে, সীতাদেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না এবং শ্রীরামসকাশে কোনও সংবাদই পরিবেশন করা সম্ভব হবে না। অতএব নিশা অবসানের জন্য অপেক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন।

রাত্রির অবসানে রাবণের নিদ্রাভঙ্গ হল। রাবণ সারারাত্রি সীতাদেবীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলেন। সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ না করা পর্যন্ত হৃদয় উদ্বেলিত, উদভ্রান্ত। নিশা অবসান মুহূর্তে রাবণ শয্যাত্যাগ করে অশোকবনে যাত্রা করলেন।

তাঁর সঙ্গে স্বর্ণপ্রদীপ, তালবৃন্ত, স্বর্ণভৃঙ্গার, গোলাকার আসন, সুরাপানের পাত্র-সামগ্রী এবং বহু নারী অনুগমন করল।

রাবণের চক্ষুদ্বয় মদ্যপানে আরক্ত, বস্ত্র স্খলিত, বাহুভূষণে বস্ত্র বারে বারে আবদ্ধ। দূর হতে রাবণকে লক্ষ্য করে হনুমান বৃক্ষের শীর্ষদেশে গমন করে, পত্রান্তরালে লুক্কায়িত থেকে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

রাবণ সীতাদেবীর সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। সীতাদেবী সংকোচে, লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদনে উপবেশন করে রইলেন। রাবণ তাঁর গম্ভীর মধুর কণ্ঠে সীতাকে উদ্দেশ করলেন—সুন্দরি, আমাকে দেখে তুমি স্তন ও উদর গোপন করে, ভয়ে অদৃশ্য হতে চাচ্ছ কেন? বিশালাক্ষ্মী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বলোক মনোহরা, আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করে তুমি আমার সম্মান রক্ষা কর। পরস্ত্রীহরণ এবং পরস্ত্রীগমন আমাদের সমাজে প্রচলিত, সে কারণে অনিচ্ছায় আমি তোমাকে স্পর্শ করব না, সেজন্য আমি তোমার সম্মতি ভিক্ষা করছি।

রাবণ সমস্ত বাক্যই সংস্কৃতে উচ্চারণ করলেন, সেই হেতু সীতাদেবী এবং হনুমান উভয়েই রাবণের বাক্যসমষ্টি অনুধাবন করলেন।

রাবণ পুনরায় বললেন,—দেবি, দীন রামের জন্য তুমি অকারণ প্রতীক্ষা করছ। সে আর জীবিত নেই, জীবিত থাকলেও সাগর অতিক্রম করে লঙ্কায় আগমন করা সম্ভব নয়। তুমি প্রতীক্ষায় কালবিলম্ব করে তোমার যৌবনকেই অতিক্রম করছ। এস, যৌবনকে উপভোগ কর, জীবনকে উপভোগ কর, এস আমরা মিলিত হই।

রাবণ সীতার প্রতি অগ্রসর হবার জন্য পদক্ষেপণ করতেই সীতাদেবী ভূমিতলে একটি তৃণ স্থাপন করে, উভয়ের ব্যবধানকে চিহ্নিত করে দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দান করলেন—তুমি রাজা, আমি সাধ্বী পরপত্নী। তুমি যেমন আপন স্ত্রীকে রক্ষা কর, পরস্ত্রীকেও তেমনিভাবে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। লঙ্কায় বোধহয় কোন হিতোপদেশ দানকারী ব্যক্তি নাই। যদি থাকতেন, তাহলে তিনি বলতেন, রাজার পাপে রাষ্ট্র ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। তুমি যে পাপকর্ম করেছ, তার জন্য তোমার এই স্বর্ণলংকা একদিন ধ্বংস হবে, তুমি পরাজিত হবে, তোমার বৈভব, অহঙ্কার, দর্প, গরিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন, কৃতান্ত তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ লোকনাথ রাঘব তোমাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। তাঁর সঙ্গে সমরে তোমার নিশ্চিত মৃত্যু।

রাবণ মৃদুহাস্যে ধীরভাবে উত্তর দান করলেন—তোমার কটু কথায় আমি বিন্দুমাত্র উত্যক্ত নই। শোন সুন্দরি, তোমাকে আর মাত্র দুমাস সময় দান করলাম। মনস্থির কর। সেই সময়ের মধ্যে যদি তোমার মনস্থির না হয়, তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

রাবণের সহচরিগণ রাবণ বা সীতার ভাষা অনুধাবন করতে পারে নি, কিন্তু

আকারে ইঙ্গিতে কথোপকথনের সারবত্তা অনুভব করছিল। তারা সীতার সন্নিকটে এসে আকারে প্রকারে মুদ্রায় রাবণের অভিলাষ পূর্ণ করার আবেদন জানাল। সীতাদেবী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে পুনরায় বললেন, লঙ্কায় বোধ করি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। তুমি আমাকে যে সব পাপ কথা বললে, তার হাত হতে তোমার মুক্তি হবে না। এই পাপেই তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

রাবণ মহাক্রোধে, আরক্ত নয়নে সর্পনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—তুমি হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানবর্জিতা নারী। তোমাকে আজই বধ করব।

পরক্ষণেই প্রতিহারিণীগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাবণ কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিলেন—ছলে-বলে-কৌশলে তোমরা আজই এই নারীর সম্মতি আদায় কর।

ধান্যমালিনী নাম্নী এক সহচরী রাবণের কণ্ঠলগ্না হয়ে সুরাসক্ত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমার সঙ্গে আনন্দ কর। ওই দীনা, বিবর্ণা রমণী সীতাকে কি প্রয়োজন? চল—

রাবণ ধান্যমালিনীকে বক্ষে ধারণ করে প্রস্থান করলেন। রাবণের আদেশ অনুসারে প্রতিহারিণীগণ সীতাদেবীকে নির্যাতন আরম্ভ করল। সীতাদেবী সক্রন্দনে বিনা প্রতিবাদে সেই নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন। এমন সময় প্রবীণা প্রতিহারিণী ত্রিজটা নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত হয়ে সভয়ে সকলকে নিরস্ত করে বললেন—ওরে, তোরা থাম, থাম—

সকলে ত্রিজটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ত্রিজটা সভয়ে নিম্নকণ্ঠে আপন ভাষায় স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করল। সে স্বপ্ন দেখেছে, এই নারীর জন্য রাম-লক্ষ্মণ সাগর পার হয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছেন। রাবণের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। সেই যুদ্ধে রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সমস্ত বীরগণ নিহত হয়েছেন, কেবল বিভীষণ কৃপাবলে রক্ষা পেয়েছেন। রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে উদ্ধার করে পুনরায় আকাশপথে যাত্রা করেছেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করে সকলেই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং সীতাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

সীতাদেবী বিহ্বলা, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর কি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। এ কি শুনছেন তিনি? পরিষ্কার সংস্কৃত ভাষায় অদৃশ্যলোক থেকে শব্দ ভেসে আসছে। সীতাদেবী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন, কে যেন বৃক্ষচূড় থেকে যথাসম্ভব সুমধুর বাক্য উচ্চারণ করছেন—দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে এক রাজা ছিলেন। রাম তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার সত্য রক্ষার্থে রাম বনে গমন করেন। সঙ্গে ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্যা সাতীদেবীও বনগমন করেন। তিনি জনস্থানের বহু লঙ্কার লোককে যুদ্ধে নিহত করেন। সেই জন্যে রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মৈত্রী হয়। সেনাদল চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণ

করেন। আমি অন্বেষণ করতে করতে অশোকবনে উপস্থিত হয়েছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস সীতাদেবীর সন্ধান পেয়েছি।

সীতাদেবী আনন্দে বিহ্বলা, অবিশ্বাসের দোলায় বিহ্বলা, চিন্তায় বিহ্বলা, কর্তব্যে বিহ্বলা। অবিশ্বাস এবং আনন্দে তাঁর দুই চক্ষু অশ্রুধারায় বিগলিত। তিনি চতুর্দিক অন্বেষণ করতে লাগলেন।

হনুমান বৃক্ষশাখা হতে অবতরণ করে, নিম্নদেশের একটি শাখায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখলেন। সীতাদেবীও এতক্ষণে হনুমানকে প্রত্যক্ষ করলেন। আর নিঃশব্দ গতিতে বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হলেন।

হনুমান নিম্নশাখায় অবতরণ করে, সীতাদেবীকে প্রণাম করে মস্তকে অঞ্জলি রেখে বিনীতকণ্ঠে বললেন—পদ্মপলাশাক্ষি, তুমি কে? তোমার ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাস দেখে অনুমান করছি, তুমি দেবী নও। তোমার যাবতীয় লক্ষণ লক্ষ্য করে প্রতীয়মান হয় তুমি রাজমহিষী এবং রাজকন্যা। তুমি যদি প্রকৃতই সীতাদেবী হও, তবে আমার প্রশ্নের উত্তরদান কর।

সীতাদেবী মৃদুকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—আমি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্নী। আমার নাম সীতা। দণ্ডকারণ্যে বাসকালে রাবণ আমাকে অপহরণ করে, সে আমাকে দু মাস মাত্র সময় দান করেছে, তার মধ্যে কিছু না হলে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

হনুমান বিনীতভাবে উত্তরদান করলেন—দেবি, আমি রামের কুশল সংবাদ বহন করে এনেছি। লক্ষ্মণ তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

হনুমান সর্বনিম্ন শাখায় অবতরণ করতে সহসা সীতাদেবী ভীতা হয়ে পড়লেন। সভয়ে সীতা উক্তি করলেন—তুমি নিশ্চয়ই মায়াবী রাবণের অনুচর। যেভাবে প্রতারিত করে রাবণ আমাকে অপহরণ করেছে, সেই ভাবেই হয়তো তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করছ।

সীতাদেবী সকাতরে উচ্চারণ করলেন—আমি অনাহারে অনিদ্রায় ক্লিষ্ট। অকারণ তোমরা আমাকে এমন যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন? তোমার কথা শ্রবণ করে আমার আনন্দ হচ্ছে সত্য, আমার মনে হচ্ছে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটেছে।

হনুমান যথাসম্ভব মধুর ও বিনীত বাক্যে উত্তরদান করলেন—তোমার বিভ্রম দূর কর। আমাকে বানরাকৃতি দেখে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নাই। আমি সত্যই শ্রীরামের দূত। আমার পরিচয়, আমি কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের সচিব। আমার নাম হনুমান। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সখা ও সহচর।

—তোমাদের সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের যোগাযোগ হল কী প্রকারে?

হনুমান সংক্ষেপে পূর্বাপর বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন। বর্ণনার ইতিতে হনুমান অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বললেন—তুমি আশ্বস্ত হও, আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান কর।

তোমার অভিপ্রেত কী আমার নিকট ব্যক্ত কর। তোমার অকারণ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শ্রীরাম আমাকে অভিজ্ঞানস্বরূপ তাঁর অঙ্গুরীয় প্রদান করেছেন। এই অঙ্গুরীয় দর্শনের পর নিশ্চয়ই তোমার প্রত্যয় ফিরে আসবে।

সীতাদেবী রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দর্শনে পুলকিতা। তাঁর মুখমণ্ডলে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য। তিনি অঙ্গুরীয় দর্শনের পর নিঃসন্দেহভাবে হনুমানকে বিশ্বস্ত চিন্তা করে, রুদ্ধ-বিহ্বলা কণ্ঠে বললেন—তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তোমার কর্মপটুতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু আমি অনুভব করতে অপারগ, শ্রীরাম যদি নিরাপদেই থাকেন, তবে রাবণকে সসৈন্যে নিধন করে আমাকে উদ্ধার না করার হেতু কী?

হনুমান সীতাদেবীকে আশ্বস্ত করার জন্য স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—দেবি, তুমি উতলা হইও না। তুমি যে এখানে বন্দিনী, এ সংবাদ শ্রীরামের অজানা। শ্রীরামের পক্ষ থেকে আমিই সর্বপ্রথম তোমাকে আবিষ্কার করি। আমার প্রত্যাবর্তনের পর আমার নিকট সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে শীঘ্রই শ্রীরাম লঙ্কাজয়ের জন্য যাত্রা করবেন। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দান করছি, অতি সত্বর তুমি শ্রীরামের দর্শনলাভ করবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে উদ্ধার করে, পৃষ্ঠদেশে বহন করে সাগর পার হয়ে শ্রীরামসকাশে উপস্থিত হতে পারি।

বালিকাসুলভ সহাস্যে সীতাদেবী সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন—তুমি আমাকে বহন করতে পারবে কেন?

প্রশ্নটি হনুমানের অহমিকায় আঘাত হানল। মাংসপেশী সংকোচনের ফলে হনুমানের আকৃতি ক্ষুদ্রকায় রূপান্তরিত, সীতাদেবীর প্রশ্নে আহত হনুমান মাংসপেশী বিস্ফারিত করলেন এবং মুহূর্তমধ্যে অতিকায় রূপ ধারণ করলেন।

সীতাদেবী মৃদু হাস্যে বললেন—তোমার আকৃতি স্বাভাবিক কর।

মুহূর্তমধ্যে হনুমান আদেশ পালন করলেন। সীতাদেবী পুনরায় বিষণ্ণকণ্ঠে ব্যক্ত করলেন—বৎস! তোমার বীরত্বে এবং কর্তব্যপালনে আমি মুগ্ধ, কিন্তু আমি পরপুরুষকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করতে অপারগ। একমাত্র পরপুরুষ রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু তখন আমি অসহায়া অনাথা ছিলাম। তোমাকে আমি অশ্রদ্ধা করি না, অথবা তোমার ওপর আমার অবিশ্বাসও নাই। কিন্তু তুমি যখন আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে, রাবণের দল তোমাকে অনুসরণ করে অস্ত্রাঘাত করবে। তুমি নিরস্ত্র, তোমার পৃষ্ঠদেশ থেকে আহত অথবা নিহত হয়ে আমি জলমধ্যে পতিত হতে পারি, অন্যথায় ভীতা হয়েও তোমার পৃষ্ঠদেশ হতে আমার পতন হতে পারে। এই অবস্থায় তুমি শ্রীরামের নিকট আমার সংবাদ পরিবেশন করে, সসৈন্যে লঙ্কা আক্রমণ কর। তোমাদের সখ্যতায় শ্রীরাম রাবণকে নিধন করে আমাকে উদ্ধার করলেই তাঁর মর্যাদার মানরক্ষা হবে।

হনুমান মুহূর্তকাল নীরব থেকে উচ্চারণ করলেন—দেবি ! তোমার বাক্যই যথার্থ। আমি প্রত্যাবর্তন করে তোমার সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করব। আমি যে তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার প্রমাণস্বরূপ তুমি আমাকে কোনও অভিজ্ঞান দান কর, যা আমি শ্রীরামচন্দ্রকে দান করে নিশ্চিতভাবে তোমার সাক্ষাতের প্রমাণ দান করতে পারি।

সীতাদেবী ক্ষণিক চিন্তা করলেন, অতঃপর বস্ত্রান্তরাল হতে একটি দিব্য চূড়ামণি বার করে হনুমানকে প্রদান করে বললেন—এটি তাঁকে দিলেই তিনি সম্যকরূপে অনুধাবন করবেন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে।

হনুমান দিব্য চূড়ামণি গ্রহণ করে যেস্থানে শ্রীরামের অঙ্গুরীয় ছিল, সেইস্থানে সযত্নে রাখলেন, তারপর সীতাদেবীকে প্রণাম করে বললেন—এবার বিদায় দাও। আমি প্রস্থান করি।

সীতাদেবী পুনরায় ক্রন্দন করতে করতে বললেন—আমি জানি না কীভাবে শ্রীরাম সাগর লঙ্ঘন করে আমাকে উদ্ধার করবেন, তুমি কর্মপটু, বুদ্ধিমান, বীর, সেজন্য তুমি তোমার কার্যে সফল হয়েছ। আমি জানি, তুমি একাকী আমাকে উদ্ধার করতে পার, কিন্তু সে আমার অভিপ্রায় নয়। আমার ইচ্ছা, রাবণকে সবংশে নিধন করে শ্রীরাম আমাকে উদ্ধার করেন। রাবণের ন্যায় পাপ ধরাধামে জীবিত থাকলে বহু সতী নারীর সর্বনাশ ঘটবে। এই মূর্তিমান পাপ ধ্বংস করা যে কোন রাজার অবশ্য কর্তব্য।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে সীতাদেবী পুনরায় উচ্চারণ করলেন—বৎস হনুমান, তুমি নিকটে কোন নিরালা স্থানে একদিন বিশ্রাম করে যাত্রা কর। যাত্রার পূর্বে সম্ভব হলে আর একবার সাক্ষাৎ কর। তোমাকে দেখে আমার যে আনন্দ হচ্ছে, সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

হনুমান প্রণিপাত হয়ে প্রণাম করে বললেন—যথা আজ্ঞা দেবি।

কুড়ি

শত্রুপক্ষের বলাবল নির্ণয়ের জন্য সাম, দান, ভেদ ও বল প্রথা প্রয়োগ বিধিসম্মত হনুমান সীতাদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে চিন্তা করলেন, সীতাদেবীর সংধান মিলেছে, বর্তমানে শত্রুপক্ষের ক্ষমতা নির্ণয় করে কিষ্কিংধ্যারাজ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হলেই দূতের যথাযথ কর্তব্য পালন সার্থক হবে। সাম, দান, ভেদ প্রথায় লংকার ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব হবে না, সেজন্য হনুমান বলের প্রয়োগ চিন্তা করলেন।

হনুমান স্ফীত হয়ে অশোকবনের বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস করলেন, ব্যতিক্রম কেবল সীতাদেবীর শিংশপা বৃক্ষ। কিংকরী ও প্রতিহারিণীগণ নিদ্রিত ছিল। হনুমানের বিরাট হুংকারে এবং বৃক্ষগুলির ছত্রভঙ্গ অবস্থা নিরীক্ষণ করে ভীতা, সন্ত্রস্তা এবং হতচকিতা হয়ে গেল। তারা সভয়ে সীতাদেবীকে প্রশ্ন করল—এ কে? কোথা হতে এল? এস্থানে আসার কারণ কি এ ভাবে সমস্ত অশোকবন ধ্বংস করছে কেন?

সীতাদেবী প্রচ্ছন্নভাবে উত্তরদান করলেন—আমি কি করে বলব, কে? লংকা দ্বীপের অধিবাসী কি চায়, আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তোমরাই বলতে পার, ও কে?

প্রতিহারিণীর দল সত্রাসে রাবণ-সমীপে উপস্থিত হয়ে হনুমানের বৃত্তান্ত গোচর করল। একজন প্রতিহারিণী বলল—মহারাজ, ওই দানবটি সীতার সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কথাবার্তা বলছিল।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সৈনিককে আদেশ দিলেন হনুমানকে বধ করার জন্য। সৈনিক দল অশোকবনের পথে যাত্রা করল। হনুমান ইতোমধ্যে নগরের তোরণদ্বারের শীর্ষে অবস্থান করে হুংকার ছাড়তে লাগলেন। সৈন্যদল তোরণদ্বারের দিকে ধাবমান হল। হনুমান তোরণদ্বারে লৌহনির্মিত পরিঘ খুলে আপন হস্তে গ্রহণ করে সৈন্যদলকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। সৈন্যদল নিকটে এসে অস্ত্রক্ষেপণ আরম্ভ করল। হনুমান সুচতুরভাবে প্রত্যেকটি অস্ত্র হতে নিজেকে রক্ষা করে তোরণের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎগতিতে দিক পরিবর্তন করতে লাগলেন।

সৈন্যদল অস্ত্রক্ষেপণ করতে করতে হনুমানের সন্নিকটে উপস্থিত হতেই তিনি পরিঘ দ্বারা তাদের আঘাত করলেন। হনুমানের সেই আঘাত বজ্রসম। সেই আঘাতে সৈন্যদল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে প্রাণত্যাগ করল, হনুমান পুনরায় তোরণদ্বারের

শীর্ষদেশে পরিঘ হস্তে অবস্থান করতে লাগলেন। কয়েকজন সৈনিক জীবিত ছিল, তারা ভয়ার্তভাবে রাবণকে দুঃসংবাদ পরিবেশনের জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করল। হনুমান তোরণশীর্ষ হতে এক উচ্চ লম্ফে, লঙ্কা দ্বীপ-দেবতার মন্দির চৈত্যপ্রাসাদের শীর্ষে উপস্থিত হলেন। সে স্থানে উপস্থিত হয়ে হনুমান সরবে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের জয়ধ্বনি আরম্ভ করলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্রে হনুমানকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করতেই হনুমান মণিমুক্তাখচিত একটি স্তম্ভ সবেগে উৎপাটিত করে আঘাত করেন। ফলে, চৈত্যপালগণের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হল। মন্দিরের মধ্যে বহু প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল, হনুমানের আঘাতে প্রদীপের শিখা হতে মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা ঘটল। অত্যল্প কালের মধ্যেই সমস্ত চৈত্যপ্রাসাদে অগ্নিকান্ড ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল। রণদূত এই দুঃসংবাদ রাবণকে নিবেদিত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রহস্তপুত্র মহাবীর জম্বুমালীকে নির্দেশ দান করলেন হনুমানকে শাসন করতে। জম্বুমালী রথারোহণে যুদ্ধযাত্রা করলেন। হনুমান চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংস করে পুনরায় তোরণশীর্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। জম্বুমালী তোরণের নিকট উপস্থিত হতেই অকস্মাৎ হনুমান বিরাটকায় পরিঘ জম্বুমালীকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। জম্বুমালী এ ধরনের যুদ্ধের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে জম্বুমালী শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

সৈন্যদল কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দণ্ডায়মান রইল, পরক্ষণে রাবণের প্রাসাদ অভিমুখে সবেগে পলায়ন করল। রাবণ সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করে চিন্তিত হয়ে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামধারী পঞ্চবীরকে উপদেশ দিয়ে বললেন—তোমরা অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করবে। আমার অনুমান আগন্তুক সামান্য নয়। আমি বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, নীল, দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণের বীরত্বের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু আগন্তুক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অসাধারণ শক্তিধর। তোমরা অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে পরিবেশ লক্ষ্য করে যুদ্ধ করবে এবং শত্রুশাসন করবে।

পঞ্চবীর সসৈন্যে তোরণদ্বারে উপস্থিত হলেন। হনুমান তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এক গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করলেন এবং শৃঙ্গচূড়া উৎপাটিত করে সবেগে পঞ্চবীরকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণ করলেন। পঞ্চবীরও এই প্রকার আকস্মিক আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তর খণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁরা যুদ্ধের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করলেন। সেনাপতির অভাবে সমস্ত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং নিরুপায় রণদূত সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে গেল লঙ্কেশ্বরের নিকট।

রাবণ সমস্ত শ্রবণের পর কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। রাবণের দৃষ্টিপাত মাত্র পুত্র অক্ষ রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন। মহাবীর অক্ষ সুবিশাল রণরথে আরোহণ করে তীক্ষ্ণ শাণিত শরসহ হনুমানের প্রতি ধাবিত হলেন। দূর হতে

হনুমানকে দর্শন করে, সশ্রদ্ধ চিত্তে কুমার অক্ষ তিনটি শর নিক্ষেপ করে হনুমানে
যুদ্ধে আহ্বান করলেন। হনুমানও অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অক্ষকে লক্ষ্য করছিলেন।
বয়সে কিশোর হলেও যুদ্ধবিদ্যায় পরিণতবুদ্ধির পরিচয় দেয়। অক্ষের শরাঘাত
হনুমান প্রত্যাখ্যান করছিলেন, কিন্তু একটি শর হনুমানের বুকে আঘাত হানল
সেই আঘাতে হনুমান বক্ষদেশে যন্ত্রণা অনুভব করলেন এবং চিন্তা করলেন শত্রুপক্ষে
অধিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো উচিত হবে না। অগ্নি সত্বর নির্বাপিত না করলে প্রলয়ংকর
অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কুমার অক্ষের শরজালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে
তোরণশীর্ষ হতে হনুমান এক লম্ফ প্রদানে অক্ষের রথের ওপর উপস্থিত হলেন
কুমার অক্ষ অত সন্নিকটে শত্রুকে দেখে ধনুকের দিক পরিবর্তন করতে নিমেষ মা
কালক্ষেপণ করলেন, হনুমান সেই পলকে কুমার অক্ষের পদযুগল দৃঢভাবে ধারণ
করে সবেগে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করলেন। ঘূর্ণায়মান অবস্থাতেই কুমার অক্ষ জ্ঞানহীন
হয়ে পড়লেন এবং ভূমিতলে পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। হনুমান
পুনরায় তোরণদ্বারে উপবেশন করে রামের জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

কুমার অক্ষের মৃত্যুসংবাদ লাভ করে রাবণ ধৈর্য অবলম্বন করে কুমার ইন্দ্রজিৎকে
স্মরণ করলেন। ইন্দ্রজিৎ উপস্থিত হতে রাবণ ধীরকণ্ঠে ব্যক্ত করলেন—ইন্দ্রজিৎ
তুমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিশারদ, অতীতে কোন শত্রু তোমার নিকট জয়ী হতে সক্ষম হয়নি
বহু সৈন্য, জম্বুমালী, অক্ষ এবং পঞ্চসেনাপতি আগন্তুক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত
এ অবস্থায় আমি অন্য কাউকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমি
যাও। শত্রু যেন আর বৃদ্ধি না পায়, তুমি গোপন দিব্য অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাও।
শত্রু উত্তর ভারতীয় যুদ্ধ পদ্ধতিতে পারদর্শী নয়, আমার অনুমান, শরযুদ্ধ পদ্ধতি
তাঁর জানা নেই। তোমাকে আমি যেসব দিব্যাস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়েছি, আমার
স্থির বিশ্বাস, সেই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করলে শত্রুর পরাজয় ঘটবেই। বৎস
তুমি সত্বর যুদ্ধযাত্রা করে শত্রুকে শৃঙ্খলিত অথবা নিহত করে লংকার সম্মান
রক্ষা কর।

ইন্দ্রজিৎ স্বভাবগম্ভীর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক রাজপুত্র। তিনি লংকার
অপমান সহ্য করতে পারেন না। পিতার আদেশ-মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ রাবণকে প্রদক্ষিণ
করে, শ্রদ্ধা নিবেদনের পর চতুর্ভুজঙ্গবাহিত রথারোহণে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

দূর হতে হনুমান ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করেই অনুমান করলেন, তিনি মহাবীর এবং
রণকৌশলে অসাধারণ। হনুমান অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে নিজদেহ বিস্ফারিত
করলেন। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে সাধারণ শরনিক্ষেপ আরম্ভ করলেন। হনুমান ক্ষণে
স্ফীতকায়, ক্ষণে সংকোচনের ফলে তীরগুলি ব্যর্থ হয়ে গেল। হনুমান এক মুহূর্তে
তোরণের এক প্রান্তে, পর মুহূর্তে তোরণের অন্য প্রান্তে উপস্থিত।

ইন্দ্রজিত স্থির করলেন, সাধারণ অস্ত্রে বিপরীত পক্ষের পরাজয় সম্ভব নয়

তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করে, উন্নত ধরনের উত্তর ভারতীয় শর নির্বাচন করে সুকৌশলে ক্ষেপণ করলেন।

হনুমান স্ফীতকায় শরীরে তোরণদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। এ ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। অকস্মাৎ ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত সেই শর হনুমানের অঙ্গ স্পর্শ করল। নিমেষের মধ্যে হনুমানের সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হয়ে গেল। হনুমান অনুমান করলেন, তাঁর প্রত্যেকটি মাংসপেশী ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি ক্রমশ বিলোপ পাচ্ছে। আর তাঁর যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হনুমান শত চেষ্টা করেও আর সজ্ঞানে যুদ্ধ করতে পারলেন না, সেই তোরণদ্বারের ওপরেই তাঁর চেতনাবিলুপ্ত দেহ পতিত হল। হনুমান চেতনাবিলুপ্ত হয়ে স্থিরভাবে শায়িত রইলেন। ইন্দ্রজিতের আদেশে সৈন্যগণ হনুমানের দেহ রজ্জুবদ্ধ করল এবং রাবণ সকাশে নিয়ে চলল।

চেতনপ্রাপ্ত হয়ে হনুমান অনুমান করলেন, তিনি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বন্দী। বদ্ধ অবস্থায় তাঁকে একটি শকটের উপর স্থাপনা করা হয়েছে। অনেক সৈন্য সেই শকট চালিত করে নিয়ে চলেছে।

হনুমান মাংসপেশী সংকোচন করে দেখলেন, রজ্জুর বন্ধনী শিথিল হয়ে গেল এবং অনায়াসে তিনি মুক্ত হতে পারেন, কিন্তু সে পন্থা তিনি অনুসরণ করলেন না। ধীর মস্তিষ্কে চক্ষু মুদ্রিত করে তিনি চিন্তা করলেন, এই অবস্থায় থাকলে সহজে কেউ তাঁকে বধ করবেন না এবং তিনি লঙ্কার সমস্ত স্থানগুলি নিরীক্ষণ করতে পারবেন। সৈন্যদল এবং গোপন স্থানের পরিচয় থাকলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবার অনেক সুবিধা হবে। হনুমান কোনরূপ বলপ্রকাশ না করে নির্জীবের ন্যায়, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করে, নিঃসাড়ে শকটোপর শায়িত রইলেন।

হনুমান রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাবণ মুক্তাখচিত মহার্ঘ মুকুট পরিহিত। গাত্রে মূল্যবান মণিখচিত স্বর্ণাভরণ, উন্মুক্ত দেহাংশে রক্তচন্দন চর্চিত। পরিধানে ক্ষৌম বসন। হনুমান বন্ধনের ফলে ক্লিষ্ট হলেও রাবণের অপরিসীম শৌর্য, বীর্য লক্ষ্য করে বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি আপন মনেই চিন্তা করলেন রাবণের শৌর্য, বীর্যের দ্যুতির কথা। লঙ্কেশ্বরের সর্বাঙ্গ কি সুলক্ষণ! যদি ইনি প্রাত্যহিক জীবনে অধর্মাচারী না হতেন, তাহলে ইনি দেবতার চেয়েও শ্রেয়রূপে স্বীকৃত হতেন।

মহাবীর পিঙ্গলনয়ন হনুমানকে দর্শন করে, রাবণ মনে মনে পুলকিত হলেন এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রহস্তকে আদেশ দিলেন হনুমানকে প্রশ্ন করার জন্যে।

প্রহস্ত ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—মহাবীর তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে কে লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করেছেন?

হনুমান মৃদু হাস্যে উত্তরদান করলেন—আমাকে কেউ প্রেরণ করেন নি। আমি স্ব-ইচ্ছায় লঙ্কায় আগমন করেছি। আমি লঙ্কেশ্বর রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ-প্রয়াসী, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সাধারণভাবে প্রায় অসম্ভব, সেজন্য অশোভন আচরণ করেছি এবং যুদ্ধ করেছি। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, আমি বন্দী হয়ে রাজসভায় উপস্থিত হব।

—আপনার পরিচয়?

—আমি মারুতনন্দন হনুমান। আমি রামদাস সুগ্রীব-সচিব হনুমান।

—সুগ্রীব-সচিব হনুমান? বালীর সংবাদ?

—যে বালী মহাবিক্রমশালী রাবণকে পরাস্ত করেছিলেন, সেই বালীকে শ্রীরামচন্দ্র একটি মাত্র শরে নিহত করে সুগ্রীবকে সিংহাসন দান করেছেন। বর্তমানে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ। জনস্থানের নিকট হতে আপনি সীতাদেবীকে হরণ করে আনেন। সুগ্রীবের সৈন্যবৃন্দ নানা দিকে সীতার অন্বেষণ করছেন, আমিও অন্বেষণ করতে করতে লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের নিকট ব্যক্ত করতে দ্বিধা নেই, আমি সীতাদেবীর দর্শনলাভ করেছি।

মহারাজ, বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ! আপনি সুপণ্ডিত এবং বহু বিষয়ে পারদর্শী। আপনি একাকীই দশ দিক পরিচালনা করেন। আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ও জ্ঞানীকে পরামর্শ দান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু আমার শেষ প্রার্থনা, আপনি সীতা-দেবীকে মুক্তিদান করুন। আপনি হয়ত জ্ঞাত নন, সীতাদেবী লঙ্কায় অবস্থান করছেন লঙ্কার ধ্বংসকারিণী কালরাত্রিরূপে। আপনি স্বেচ্ছায় সীতাদেবীকে মুক্তি দান করে সুখে ও শান্তিতে রাজ্যসুখ ভোগ করুন।

হনুমান অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর ধীরগম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় উচ্চারণ করলেন—আমি একাই লঙ্কা ধ্বংস করে সীতা উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু শ্রীরাম বা সুগ্রীব সেরূপ কোন আদেশ দেন নি, তাই সে কার্যে বিরত রইলাম। আমি দূত মাত্র। সন্দেশ নিবেদন করাই আমার কর্তব্য। আমি সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করলাম, এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন, সীতাদেবীকে মুক্তি দেবেন অথবা শ্রীরাম-সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন।

রাবণ সক্রোধে হুঙ্কার প্রদান করলেন—প্রতিহারী, এই দূতকে এই মুহূর্তে বধ কর।

—মহারাজ! ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বিভীষণ বললেন—দূত চিরকাল অবধ্য। একে বধ করলে আপনি দেশ-বিদেশে অত্যন্ত নিন্দিত হবেন।

—কিন্তু এ আমাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। একে বধ করাই উচিত।

—রাজেন্দ্ররাজ রাবণ, আপনি মহাজ্ঞানী। আপনাকে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু রাজকার্যে সৎ পরামর্শ দান করা প্রত্যেক ধার্মিক রাজকর্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। দূত অনিষ্টসাধন করেছে, সেই নিমিত্ত তার বিভিন্ন

রকমের শাস্তিবিধান আছে। আপনি ওকে শাস্তি দান করতে পারেন, কিন্তু প্রাণহরণ কদাচ করতে পারেন না।

রাবণ অল্পক্ষণ চিন্তা করে আদেশ দিলেন—বেশ। এই দূতকে আমি বধ করব না। এর লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করে, সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাও। নগরের প্রত্যেক অধিবাসী দূতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করুক।

হনুমান মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। রাত্রির অন্ধকারে নগরের প্রত্যেক স্থান সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করতে পারেন নি। মধ্যাহ্নের আলোকে সমস্ত নগর লক্ষ্য করা সম্ভব হবে এবং নগর প্রাচীরের দুর্বলতম স্থানগুলি লক্ষ্য করে রাখলে আক্রমণের সময় অত্যন্ত সুবিধা হবে।

বস্ত্র এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থে হনুমানের লাঙ্গুল বেষ্টন করল সৈন্যের দল, তারপর লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করল। চক্ষের নিমেষে লাঙ্গুলের অগ্নিশিখা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠল। প্রতিহারীর দল হনুমানকে নিয়ে নগর পরিদর্শনে যাত্রা করল। হনুমান প্রথমে চিন্তিত হয়ে ভাবলেন, লাঙ্গুলের অগ্নিশিখা অঙ্গে স্পর্শ করবে কি না। যদিও জ্ঞাত ছিলেন, বানরাবরণ অগ্নিতে দহন হয় না, কিন্তু কোনদিন তিনি অগ্নিসংযোগ করে পরীক্ষা করে দেখেন নি। প্রথমে চিন্তিত থাকলেও অল্পক্ষণ পরে হনুমান অনুভব করলেন, লাঙ্গুলের অগ্নি লাঙ্গুলেই সীমাবদ্ধ আছে, কেবল দাহ্য পদার্থগুলিই জ্বলছে।

নগরবাসী মহা উৎসাহে জ্বলন্ত হনুমানকে দেখতে লাগল। অশোকবনের প্রতিহারিণীগণ সানন্দে ও সাগ্রহে হনুমানের নির্যাতন কাহিনী সীতার নিকট নিবেদন করল। নিরুপায় সীতাদেবী হনুমানের নির্যাতন কাহিনী শ্রবণ করে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন এবং হনুমানের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন।

পথ, মহাপথ, রাজপথ অতিক্রম করে হনুমান তোরণদ্বারের নিকটে উপস্থিত হলেন। হনুমানের চতুপার্শ্বে যে সব সৈন্যদল উপস্থিত ছিল, তারা স্বভাবতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। এই অবসরে হনুমান মাংসপেশী বিস্ফারিত করলেন, পরমুহূর্তে সংকুচিত করে বাঁধন হতে মুক্ত হয়ে উচ্চ লম্ফে তোরণদ্বারের উপরে গমন করে উপবেশন করলেন। সৈন্যগণ হই-হই করে অগ্রসর হতেই পরিঘ আঘাতে তাদের মস্তক চূর্ণ করলেন। তাঁর জ্বলন্ত লাঙ্গুলের স্পর্শে তোরণদ্বারে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেল। হনুমান দীর্ঘ লম্ফে এক গৃহচূড়া হতে অন্য গৃহচূড়ায় উপস্থিত হতে লাগলেন এবং প্রত্যেক গৃহে অগ্নিকান্ড ঘটে গেল।

অর্ধ প্রহরের মধ্যেই সমস্ত লঙ্কাপুরীতে প্রচন্ড অগ্নিকান্ড ঘটে গেল। হনুমান পূর্বেই বিভীষণের প্রাসাদ লক্ষ্য করেছিলেন, সেজন্য সেই প্রাসাদের উপর অগ্নিসংযোগে বিরত থাকলেন।

সমস্ত লঙ্কাপুরীতে 'হায়-হায়' রব। নাগরিকগণ আর্তনাদে উন্মাদের ন্যায় ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করল। নারীগণ গৃহ হতে শিশুদের উদ্ধার করে পথে এসে আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন করে বলতে লাগল—লঙ্কার লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেছেন। লঙ্কার সর্বনাশ সমুপস্থিত। সীতাই লঙ্কার বিনাশকারিণী।

হনুমান লঙ্কাদহন করে, সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে জ্বলন্ত লাঙ্গুল সমুদ্রজলে নির্বাপিত করলেন।

একুশ

সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর হনুমান প্রত্যাবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে অকস্মাৎ চিন্তা করলেন, লঙ্কাদহনের সময়ে আশোকবনে অগ্নিকান্ড ঘটে নি তো? সীতাদেবী কি এই অগ্নিবলয়ের মধ্যে বিপদগ্রস্তা? যাত্রার পূর্বে একবার সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর কুশল বার্তা গ্রহণ করে এবং শ্রীরামসমীপে আরও যদি কোন সংবাদ প্রেরণ করবার অভিলাষ সীতাদেবীর থাকে, তাও বহন করে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

হনুমান ধীর পদক্ষেপে অশোকবনের দিকে যাত্রা করলেন। নগরের অধিকাংশ গৃহই ভস্মীভূত। এখনও অনেক গৃহচূড়া হতে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশের দিকে উড্ডীন। নগর-অধিবাসিগণ আপন আপন গৃহের অগ্নি নির্বাপিত করার জন্যে ব্যস্ত, তাদের কেউই হনুমানের দিকে লক্ষ্য করল না।

হনুমান অশোকবনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সীতাদেবী শিংশপা বৃক্ষতলে চিন্তিত মুখে উপবিষ্টা, প্রতিহারিগণ তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে। হনুমান অল্প দূর হতে সংস্কৃত ভাষায় সীতাদেবীকে উদ্দেশ করে বললেন—দেবি, আমার বিদায়ক্ষণ উপস্থিত। আমার নিকট আর কোন নিবেদন থাকলে আপনি বিনা দ্বিধায় পরিবেশন করতে পারেন, আমি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে সব বার্তাই নিবেদন করব।

হনুমানকে লক্ষ্য করে প্রতিহারিণীগণ সভয়ে অশোকবনের এক প্রান্তে পলায়ন করল।

সীতাদেবী ধীর পদক্ষেপে হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি কীর্তিমান, বুদ্ধিমান এবং বীর। তোমার কর্মকান্ডের উপর আমার আস্থা বিদ্যমান। রাঘবের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে দু মাসের মধ্যে উদ্ধার করেন। দু মাস আমি অপেক্ষা করব, দু মাস পরে আমাকে আত্মহত্যা করতেই হবে।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সীতাদেবী পুনরায় বললেন—সসৈন্যে রাঘব এবং সুগ্রীব কিভাবে সাগর অতিক্রম করে এই দুর্গম পুরীতে উপস্থিত হবেন, আমি কল্পনাও করতে পারছি না। তোমার একার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, সকলের পক্ষে তা সম্ভব হবে কি না আমার সন্দেহ।

হনুমান আশ্বাসবাণী দান করে বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সাগর অতিক্রম করে লঙ্কা আক্রমণ করব।

হনুমান সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণিপাত করে সীতাদেবীকে বললেন—বিদায় দিন। আমি রামসকাশে যাত্রা করি।

—আশীর্বাদ করি, তোমাদের চেষ্টা ও ইচ্ছা পূরণ হোক।

হনুমান বিদায় গ্রহণ করলেন। সীতাদেবী সাশ্রুনেত্রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হনুমান লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করে অরিষ্ট পর্বতের চূড়ায় উপস্থিত হলেন. তারপর দিক নির্ণয় করে বিদ্যুৎগতিতে সুদীর্ঘ লম্ফ প্রদান করলেন।

সাগরমধ্যে মৈনাক পর্বতশৃঙ্গে ক্ষণিক পদক্ষেপণ করে পুনরায় ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন। হনুমান যতই ভারতের নিকটস্থ হতে লাগলেন, ততই তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ভারতবেলাভূমিতে হনুমান পদার্পণ করে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করলেন। অঙ্গদ এবং অন্যান্য বীরগণ দূর হতেই হনুমানকে লক্ষ্য করেছিলেন। হনুমানের অবতরণ মুহূর্তে সকলে দ্রুতবেগে হনুমানের নিকটে আগমন করে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

হনুমান লংকার যাবতীয় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললেন—আমি রামপত্নী জানকীর সাক্ষাৎলাভ করেছি। আমি লঙ্কার পথ পরিক্রমা করে সে স্থানের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়েছি। আমাদের নির্ধারিত সময় মাত্র দু মাস। এই দু মাসের মধ্যে যদি আমরা সীতা উদ্ধার করতে না পারি, তাহলে তিনি আত্মঘাতী হবেন। রাবণ সীতাদেবীকে মাত্র দু মাস সময় দিয়েছেন চিন্তা করার জন্যে। এই সময়ের মধ্যে সীতাদেবী স্ব-ইচ্ছায় রাবণের অঙ্কশায়িনী না হলে রাবণ বলপূর্বক সীতার সতীত্ব নষ্ট করবে। আমি সীতাদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত, কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করতে প্রস্তুত নন। তিনি সতীসাধ্বী, অগ্নিসমা পবিত্র। তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে প্রাণ বিসর্জন করাও আমাদের অন্যায় হবে না।

অঙ্গদ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ধীরকণ্ঠে বললেন—মহাবীর হনুমান, আপনি যে কর্তব্যসাধন করেছেন, তাতে আমাদের সকলের জীবন রক্ষা হয়েছে। আপনাকে ধন্যবাদ বা স্তুতিবাদ করে হেয় করব না। আপনি এই কর্মপদ্ধতিতে জয়লাভ করেছেন। অতএব আপনি নিবেদন করুন, আমাদের করণীয় কি?

হনুমানের জন্য সকলে ফলমূল সংগ্রহ করে এনেছিল। হনুমান আহার করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন, তারপর বললেন—আর বিলম্ব নয়। আমরা এই মুহূর্তে রাম ও সুগ্রীব সমীপে উপস্থিত হয়ে সমগ্র বার্তা জ্ঞাত করি।

সকলেই হনুমানের মতে মত দিলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর উপকূলে এক মহার্ঘ মধুবন। এই মধুবনে বিচিত্র রকমের বৃক্ষ বর্তমান এবং সেই বৃক্ষ হতে বহুবিধ মূল্যবান মধু সৃষ্টি করে সুগ্রীব এবং অন্যান্য রাজ পরিবারের নরনারীগণ সেই মধু পান করেন। রাজা সুগ্রীব এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিরেকে মধুবনে প্রবেশের অধিকার কারুর নেই। মধুবন রক্ষণাবেক্ষণ করেন দধিমুখ ও তাঁর প্রতিহারী সমষ্টি।

মধুবনের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে কুমার অঙ্গদ হনুমানকে নিবেদন করলেন—মহাবীর, আপনি আদেশ দান করুন, আমরা মধু পান করে আনন্দ করব।

হনুমান চিন্তা করলেন, সৈন্যগণ বহু পরিশ্রম করেছে, ওদের কিঞ্চিৎ আনন্দের প্রয়োজন। হনুমান আদেশ দিলেন—বেশ, সকলে আনন্দ করুক।

অঙ্গদের নেতৃত্বে সকলে মধুবনে প্রবেশ করে যথেচ্ছভাবে মধু পান আরম্ভ করে দিল এবং বৃক্ষগুলিকে বিধ্বস্ত করতে লাগল।

দধিমুখ অকস্মাৎ এই ধরনের ব্যবহারে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তারপর সহকারীবৃন্দকে আদেশ দিলেন অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে বাধা দান করার জন্য। অঙ্গদ মধুপানে উন্মত্ত। তাঁকে বাধা দান করার জন্যে যখন রক্ষকদল অগ্রসর হল, তখন কুমার অঙ্গদ তাঁদের প্রত্যেককে প্রহার করলেন, এমন কি বয়সে প্রবীণ দধিমুখও সেই প্রহার হতে নিস্তার পেলেন না।

দধিমুখ অঙ্গদের এই আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে সেই মুহূর্তে সুগ্রীবের নিকট যাত্রা করলেন।

সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে ছিলেন, সেস্থানে অনুচরবৃন্দসহ দধিমুখ উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে প্রণাম করলেন।

সুগ্রীব প্রশ্ন করলেন—কী সংবাদ দধিমুখ? তোমাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? আমি অভয় দিচ্ছি, সত্য কথা বল। মধুবনের কোন ক্ষতি হয় নি তো?

দধিমুখ বিষণ্ণ, দ্বিধাভরে, ভীতভাবে বর্ণনা করলেন—মহারাজ সুগ্রীব। তুমি বা বালী কাউকে কোনদিন মধুবনে প্রবেশ করতে দাও নি এবং আমিও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মধুবনের সর্বাঙ্গীন যত্ন পালন করেছি, কিন্তু বর্তমানে অঙ্গদ বহু সৈন্যসামন্ত সহ মধুবনে প্রবেশ করে সমস্ত মধু পান করেছে এবং বৃক্ষগুলিকে নষ্ট করেছে। আমি বাধা দান করতে গেলাম, ফলস্বরূপ পানোন্মত্ত অবস্থায় ওরা আমাকে প্রহার করল।

দধিমুখ বিষণ্ণ চিত্তে নীরব হলেন। সুগ্রীব কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না,

কোন আদেশ দান করলেন না, গম্ভীর ও চিন্তান্বিত হৃদয়ে পদচারণা করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ চিন্তিত হয়ে সুগ্রীবকে প্রশ্ন করলেন—বনরক্ষক এত চিন্তিত কেন? ও তোমায় এতক্ষণ কি কথা বলল?

সুগ্রীব পদচারণা ক্ষান্ত দিয়ে লক্ষ্মণের সম্মুখীন হয়ে বললেন—দধিমুখ সংবাদ পরিবেশন করল অঙ্গদ এবং অন্যান্য বীরগণ মধুবনে প্রবেশ করে মধু পান করেছে, বৃক্ষগুলি ধ্বংস করেছে এবং দধিমুখ ও অন্যান্য রক্ষকবৃন্দকে প্রহার করেছে।

সুগ্রীব অল্পক্ষণ নীরব থেকে লক্ষ্মণকে বললেন—আমি সেজন্যে চিন্তা করছি না, আমি চিন্তা করছি এত সাহস অঙ্গদ হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি বীরের কেন হল? আমার সন্দেহ, সন্দেহ নয়—আমার বিশ্বাস—হনুমান, অঙ্গদাদি বীরগণ জানকীর সন্ধান পেয়েছে, সেই হেতু বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও ওদের এত আনন্দ এবং উচ্ছৃংখলতা। দধিমুখ, তুমি সত্বর মধুবনে যাত্রা কর। কুমার অঙ্গদকে সংবাদ দান করে বলবে, তুমি আমাকে সমস্তই নিবেদন করেছ, তা সত্ত্বেও আমি ক্রুদ্ধ না হয়ে হৃষ্টচিত্তে সকলকে আহ্বান করেছি।

দধিমুখ সুগ্রীবকে প্রণাম করে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে মধুবনে যাত্রা করলেন। মধুবনে উপস্থিত হয়ে দধিমুখ দেখলেন, অঙ্গদ এবং অন্যান্য সৈন্যসামন্তদের উগ্রতা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। তারা এখন অনেক স্থির ও ভদ্র।

দধিমুখ অঙ্গদের সম্মুখে সম্মান প্রদর্শন করে বললেন—কুমার অঙ্গদ, তুমি রাজকুমার। তোমাদের যতক্ষণ ইচ্ছা, তোমরা মধুপান কর। আমি তোমাদের আগমনবার্তা মহারাজ সুগ্রীবের নিকট পরিবেশন করেছি, কিন্তু তিনি রুষ্ট না হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমাদের স্মরণ করেছেন।

অঙ্গদ ও হনুমান সম্মুখে, সৈন্যদল পশ্চাতে, সুশৃংখলিত ভঙ্গিতে সুগ্রীবসকাশে যাত্রা করলেন। সকলে সুগ্রীব সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করলেন। সুগ্রীব গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কী সংবাদ কুমার অঙ্গদ?

—মহামতি বীর হনুমান জানকীর দর্শন লাভ করেছেন?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুগ্রীব হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। হনুমান ধীরভাবে সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করে উচ্চারণ করলেন—আমি মহাসতী মাতৃস্বরূপিনী সীতাদেবীর দর্শনলাভ করেছি। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়েছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বিহনে তপস্বিনীর জীবনযাপন করছেন।

—কোথায় তাঁর সাক্ষাৎলাভ করলে? শ্রীরাম প্রশ্ন করলেন।

—লঙ্কা দ্বীপে। রাবণের রাজ্যে অশোকবনে তিনি বন্দিনী।

—তিনিই যে জনকনন্দিনী সীতা, তার প্রমাণ কী?

রামের প্রশ্নে হনুমান বস্ত্রান্তরাল হতে সীতাদেবী প্রদত্ত কাঞ্চনাবদ্ধ দীপ্যমান

দিব্য মণি অভিজ্ঞানস্বরূপ রামহস্তে প্রদান করে বললেন—জননী জানকী অভিজ্ঞান-স্বরূপ এই রত্নটি আপনার হস্তে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই রত্ন দর্শনমাত্রই আপনি সম্যকরূপে অনুভব করবেন, আমার সঙ্গে সীতাদেবীর সাক্ষাৎ হয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্র মণি-হস্তে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—বৎস হনুমান, রাজর্ষি জনক যজ্ঞকালে এই মণি লাভ করেছিলেন। আমাদের বিবাহকালে জনকরাজ এই মণিটি জানকীকে উপহারস্বরূপ দান করেন। তাঁর শিরোভূষণে অলঙ্কৃত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মণি-দর্শনে আজ আমার পিতা, জানকীর পিতা এবং জানকীকে বারংবার মনে পড়ছে। আমি প্রতি মুহূর্তে এই মণির মাধ্যমে জানকীর সান্নিধ্য অনুভব করছি।

লঙ্কার এবং সীতার সংবাদ শ্রীরাম হনুমানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করলেন, হনুমানও সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, পরিশেষে বললেন—দেবী জানকী বলেছেন, রাম যেন শীঘ্র সসৈন্যে লঙ্কায় পদার্পণ করে রাবণকে যুদ্ধে বধ করে, সীতাকে উদ্ধার করে স্বভবনে নিয়ে যান। এই কর্মই মহাবীর রামের অনুরূপ হবে।

হনুমান অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—আমি জননী জানকীকে আশ্বাস দিয়েছি, দেবি, কোন শোক কর না, তুমি শীঘ্রই রাম-লক্ষ্মণকে লঙ্কার দ্বারে দেখতে পাবে, তার সঙ্গে আমাদেরও দর্শন পাবে। তোমাকে উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে সিংহাসনে অভিষিক্ত হবেন।

হনুমান ধীরকণ্ঠে বাক্য সমাপ্ত করলেন—আমার আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করে সীতাদেবী শান্তিলাভ করেছেন, কিন্তু মহাবীর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য মাত্র দুই মাস কাল সময় আছে। তার মধ্যে আমরা যদি আরব্ধ কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে মহাসতী সীতাদেবী আত্মঘাতিনী হবেন।

হনুমানের বার্তা শ্রবণে শ্রীরাম অত্যন্ত প্রীত হলেন, সেই সঙ্গে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোথায় লঙ্কা? কত দূরে দেশে অবস্থিত? এই সুবিশাল সাগরই বা কী ভাবে উল্লঙ্ঘন করে জানকীকে উদ্ধার করে আনা হবে?

শ্রীরামচন্দ্রকে ব্যাকুল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে সুগ্রীব সাহস দিয়ে বললেন—মহাবীর শ্রীরাম, তোমার ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির সাধারণ মানুষের ন্যায় বিহ্বল ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। যেখানে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা এবং একতা, জয় সেখানে অবশ্যম্ভাবী। আজ তুমি একা নও, আমরা সকলে তোমার সঙ্গে আছি। আমরা সকলে একত্রে সমুদ্র লঙ্ঘন করে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাঁকে পরাস্ত করে অতি অবশ্যই সীতাদেবীকে উদ্ধার করব। তুমি শোক পরিত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন কর।

সুগ্রীবের বাক্যে শ্রীরামের শোক কিঞ্চিৎ লাঘব হল। তিনি মনকে দৃঢ় করে বললেন—তোমার বাক্যই যথার্থ বন্ধুবর সুগ্রীব। প্রিয় হনুমান, তুমি লংকার অবস্থান যথাযথ ভাবে পরিচিত হয়ে এসেছ আশা করি। সাগর লঙ্ঘনের ব্যবস্থা হয়ত আমি করতে পারব, অবশ্য তোমরা যদি আমার সহায় থাক।

হনুমান বর্ণনা দিলেন—লংকাপুরী অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। নগরীর চারিপার্শ্বে প্রাচীর এবং মধ্যে মধ্যে তোরণদ্বার বর্তমান। তোরণের সঙ্গে অর্গলযুক্ত। প্রত্যেকটি অর্গল পরিঘ দ্বারা বন্ধ। চারটি সুবিশাল প্রবেশ পথে নানাবিধ অস্ত্র বিদ্যমান। প্রত্যেকটি অস্ত্র অত্যন্ত আধুনিক। এই অস্ত্র দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিনাশ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রবেশ দ্বারের সঙ্গে যন্ত্রযুক্ত সেতু যুক্ত আছে। শত্রুসৈন্য সেতুর ওপরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিখার মধ্যে পতিত হয় এবং ধ্বংস হয়। রাবণ অত্যন্ত জ্ঞানী ও ধীরমতি। তিনি অবশ্যই রাজ্যের নৃপতি, কিন্তু তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনা করে থাকেন। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ এবং আরও কয়েকজন বীর যোদ্ধা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মতই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ। লংকাপুরীর গৃহগুলি অতি সুন্দর এবং অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ ও স্বর্ণনির্মিত।

আমি লংকার তোরণদ্বারগুলি ভগ্ন করেছি। অধিকাংশ গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছি, শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস করেছি। এই সময়ে লংকাপুরী আক্রমণ করলে রাবণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন, অতএব আমার পরামর্শ অনুযায়ী আর বিলম্ব না করে লংকা আক্রমণের উদ্যোগ করা কর্তব্য।

শ্রীরাম উত্তরদান করলেন—আজ উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্র। আগামীকল্য যুদ্ধযাত্রার জন্য অতি শুভক্ষণ। তোমরা প্রস্তুত থেকো। আগামীকাল আমরা যুদ্ধযাত্রা করব। সুগ্রীব, তোমার পরামর্শ কী?

—তুমি যা বলবে, তাই হবে সখা।

—তবে কল্যই যুদ্ধযাত্রার শুভারম্ভ।

সমস্ত বনাঞ্চল মুখরিত করে, সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন—জয় শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীলক্ষ্মণের জয়, জয় কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের জয়।

বাইশ

রাবণ সভাস্থলে দুঃখিত অন্তরে, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। বিভিন্ন আসন অলঙ্কৃত করে উপবেশন করেছেন বিভীষণ, প্রহস্ত এবং অন্যান্য বীরগণ। একটি সুসজ্জিত অলঙ্কৃত মহাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘদেহী, স্বল্পভাষী, গম্ভীর কুম্ভকর্ণ।

রাবণ সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—হনুমান অকস্মাৎ লংকাপুরীর যে ক্ষতিসাধন করেছে, তার প্রতিশোধ কী রূপে গ্রহণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই অদ্যকার সভা। সভার কার্যক্রম তিনভাবে নির্ণীত হয়। যে প্রস্তাব প্রথমেই সকলে একমত হয়ে গ্রহণ করেন, সেই মতই সর্বোত্তম। যে প্রস্তাবে প্রথমে মতপার্থক্য ঘটলেও পরে একমত হয়, তাকে মধ্যম বলা হয় এবং যে প্রস্তাবে সদস্যগণ পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন, সেই মতই হল নিকৃষ্টতম। আজ আমি এই সভা আহূত করেছি আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি আলোচনার জন্য। আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন, আমি রামপত্নী সীতাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে এনে অশোকবনে বন্দিনী করে রেখেছি। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ এবং কামমোহিত। আমি তাঁকে অঙ্কশায়িনী করতে চাই, কিন্তু সেই নারী অদ্যাপি স্বীকৃতি দান করে নাই। আমি তাঁকে এক বৎসর সময় দান করেছিলাম, তাও প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে, এমন সময় অকস্মাৎ হনুমানের আবির্ভাব। সে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, পরামর্শ করেছে, লংকা আগমনের পথ পরিচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সে সৈন্যদলকে পথনির্দেশ দান করে লঙ্কায় উপস্থিত হতে পারবে। তারই নির্দেশিত পথে রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব সৈন্যসহ লংকা আক্রমণ করবে। আমি কেবল আশ্চর্য হচ্ছি, হনুমান কী ভাবে লঙ্কার পথের সন্ধান পেল. কী করেই বা সাগর লঙ্ঘন করল? সে মহাবীর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে সুচতুর এবং মহাজ্ঞানী, এ সম্পর্কেও আমি নিঃসন্দেহ। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই লঙ্কার যে বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে, তা আমার কল্পনারও অতীত। আমি রাজনীতির দৃষ্টিতে অবলোকন করছি, রাম অনতিবিলম্বেই স্বর্ণলংকা আক্রমণ করবে। তার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য, সেই জন্য অদ্যকার সভা আহূত।

সভাস্থ সকলে নীরব।

রাবণ পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রহস্তকে নির্দেশ দিলেন—প্রহস্ত, এক সপ্তাহের মধ্যে লঙ্কার সমস্ত নাগরিকের গৃহ যেন নির্মিত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে স্বাভাবিক জীবনধর্ম পালন করে।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ। প্রহস্ত সবিনয়ে প্রত্যুত্তর করলেন।

—আমি সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করলাম, এক্ষণে আপনাদের অভিমত আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

প্রহস্ত আপন আসন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হয়ে ধীরস্থির কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—মহামতি রাজেন্দ্র। আপনি কোনদিন কোন রণে পরাস্ত হন নি। রামের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের একান্তভাবে কাম্য। আমাদের দেশবাসী ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করছিল। লঙ্কায় যেরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, উপনিবেশ স্থাপন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই। রাম সেই উপনিবেশগুলি ধ্বংস করেছে, এবং আমাদের রাজন্যবর্গকে নিধন করেছে। ভারতে আমাদের রাজ্য প্রসারিত করতে হলে সর্বপ্রথমেই রামশক্তিকে খর্ব করতে হবে।

ভারতের ভূমিতে রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করা কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ শ্রীরাম অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যোদ্ধা। সীতাদেবীকে বন্দিনী করে আনার জন্যই রাম লঙ্কায় উপস্থিত হবেন এবং লঙ্কার রণপ্রাঙ্গনে শ্রীরামকে বধ করা অত্যন্ত সহজ হবে। অতএব মহারাজ, শ্রীরামকে লঙ্কায় পদার্পণ করার সুযোগ দিন, তারপর তাঁকে নিধন করুন। শ্রীরাম নিহত হলে সীতাদেবীও আপনাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

রাবণ আনন্দিত কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—সাধু, সাধু।

দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, নিকুম্ভ, বজ্রহনু, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ সমস্বরে গর্জন করে উঠলেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-হনুমান সমেত সমস্ত সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন করব, ধ্বংস করব।

সকলকে নিরস্ত করে বিভীষণ দণ্ডায়মান হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে উদ্দেশ করে বললেন—মহাবীর আর্য। আপনি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। আপনাকে রাজনীতি সম্পর্কিত উপদেশ দান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু আপনি যখন অভয় প্রদান করেছেন, তখন সৎ পরামর্শ দান করা আমার কর্তব্য। রাজনীতিক্ষেত্রে সাম-দান-ভেদ প্রথা সর্বাগ্রে শত্রু বিনাশে প্রযোজ্য। এই তিন প্রথায় যদি শত্রু বশে না আসে, তখন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। শক্তি প্রয়োগের পূর্বে শত্রুপক্ষের শক্তি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আমরা কেউই জ্ঞাত নই, শ্রীরামপক্ষের শক্তি কত দূর। শত্রুপক্ষের শক্তি নির্ধারণ না করে, যুদ্ধ আরম্ভ করলে, সে যুদ্ধের পরিণাম শুভ নয়, এ কথা আপনিও সম্যকরূপে অবগত আছেন।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কর্ম আপনি সীতাহরণ করেছেন। যে রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে নারী জড়িত হয়েছে, সেই রাজনৈতিক কর্ম প্রলয়ঙ্করী রূপে প্রতিভাত হয়েছে। শ্রীরাম খর নিধন করেছিলেন রাজনৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার জন্য। আপনি গুপ্তচর হিসাবে শূর্পণখাকে ভারতে প্রেরণ করেছিলেন,

রাম-লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে শাস্তি দিয়েছেন গুপ্তচররূপে, নারীরূপে নয়। আপনি একটি নিদর্শনও দেখাতে পারবেন না, সাধারণ এক নিরীহ গৃহস্থ রমণীর ওপর রাম অত্যাচার করেছেন। আপনি তাই করেছেন। রাম-রাবণের রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে সরলা সতীসাধ্বী, নিরীহ সীতাদেবীর ভূমিকা কোথায় এবং কিসের, যে জন্য আপনি বিনা দোষে তাঁকে অপহরণ করে আনলেন? রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বদাই যুদ্ধ বাঞ্ছনীয় নয়, শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি ও সখ্যতাও অনেক সময় একান্ত কাম্য। আমার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মহারাজকে এই উপদেশই দান করে যে, আপনি সসম্মানে সীতাদেবীকে রামসমীপে প্রত্যর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করুন। রাম-রাবণের মিলিত শক্তিতে পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে যে রাজ্য সৃষ্টি হবে, সে রাজ্য শৌর্যে বীর্যে অপরাজেয় হয়ে উঠবে এবং এ রাজ্যকে পরাস্ত করা দেবতারও অসাধ্য হবে। আপনি যদি রামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, আপনি যুদ্ধে পরাস্ত হবেন, কারণ আপনি সীতাদেবীকে অপহরণ করেছেন, অপরাধ বোধ আপনাকে সদাসর্বদা পীড়িত করবে, অপরপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বন্দিনী পত্নীকে উদ্ধার করতে আসবেন, তাঁর মনে বীরোচিত বলবীর্য প্রকাশ পাবে। এই অবস্থায় আপনি সর্বদিক চিন্তা করে লংকাবাসীর মঙ্গলার্থে যে প্রস্তাব সমীচীন বলে স্থির করবেন, সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করবেন। আমার শেষ কথা, আপনি প্রসন্ন হোন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, ধর্মাশ্রয়ী হন। যা ন্যায়সম্মত ও হিতকর, তাই আপনি করুন।

সীতার চিন্তায়, আত্মীয়স্বজনের নিকট সম্মানহানির আশংকায়, আপন পাপকর্মের, অপরাধ বোধের গ্লানিতে রাবণ ক্লিষ্ট, ভারাক্রান্ত, তবু অন্তরের সমস্ত গ্লানি গোপন করে সরোষে উত্তরদান করলেন—আমি ভয়ের কোন কারণ দেখি না, সীতাকে কখনই রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করব না। রাম যদি স্বয়ং ইন্দ্রকেও সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।

রাবণ আপন বাক্য উচ্চারণ করার সময় কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। কুম্ভকর্ণ একটি মণিমুক্তাখচিত প্রশস্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় সুরাপানে আরক্ত। তাঁর ভঙ্গিমায় নির্লিপ্ততা প্রকট। রাবণ কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ধীরকণ্ঠে বললেন—তুমি বিশ্রামকক্ষে নিদ্রিত ছিলে, সেজন্য তোমাকে সীতার বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত করতে সমর্থ হই নি। সীতার ন্যায় অপরূপা সুন্দরী আমি কখনই দর্শন করি নি। সীতাকে বন্দিনী করার পর হতে আমি উন্মাদের ন্যায় দিনাতিপাত করছি, অথচ সীতা কোনমতেই আমার অংকশায়িনী হতে ইচ্ছুক নয়। এ অবস্থায় আমার কী কর্তব্য দয়া করে ব্যক্ত কর।

কুম্ভকর্ণ ঈষৎ বিরক্তিভরে বললেন—তুমি কাজটা অন্যায় করেছ। এ কাজ করার পূর্বে তোমার রাজসভায় আলোচনা করা উচিত ছিল এবং সকলের অনুমতি গ্রহণ করে সীতাহরণ করা বিধেয় ছিল। তুমি এ কাজ কারুর অনুমতি না নিয়ে

আত্মসুখ লাভের জন্য একাই সীতাহরণ করেছ। এই কার্যে রাষ্ট্রের কোন মঙ্গল অথবা লাভ হবে না, যা লাভ হবে, তা কেবল তোমার ব্যক্তিগত।

কুম্ভকর্ণ অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—তবু তুমি দেশের রাজা। তুমি যা করেছ, তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তোমার নির্দেশ পালন করাই আমাদের কাজ। তোমার কাজের সমালোচনা করলে দেশের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে এবং বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। তুমি অন্যায় করেছ, এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা নেই, কিন্তু যখন একবার দুষ্কর্ম করেছই, তখন তাকে সমর্থন করা আমার ধর্ম। তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমি প্রাণপাত করেও রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তুমি নিশ্চিন্তে সুরাপানের সঙ্গে নারীসঙ্গ ভোগ কর। আমি রামচন্দ্রকে যমালয়ে পাঠালেই সীতা তোমার বশে আসবে।

সভাস্থল আবার নীরব।

মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন—মহারাজ, আপনি এত ইতস্ততঃ করছেন কেন? আপনি যে কোন মুহূর্তে সীতাকে গ্রহণ করে অঙ্কশায়িনী করতে পারেন। এর জন্য সীতার অনুমতি ভিক্ষার কী প্রয়োজন?

মহাপার্শ্বের বাক্যে রাবণ ধীরকণ্ঠে বললেন—আমি আজ সব কথা স্বীকার করব এই সভামধ্যে। একদিন আমি পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক নারীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করি। সেই নারী ব্রহ্মার নিকট অভিযোগ করে। ব্রহ্মা আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, যদি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক সঙ্গম করি, সেই মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটবে।

সেদিন হতে আমার মনে কেমন ভীতির সঞ্চার হয়েছে। কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি নারীসম্ভোগ করি, তাহলে হয়ত আমার মৃত্যু ঘটবে। সেই অবধি আমি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গম করি নাই অথবা করবও না।

সভাস্থল নীরব।

বিভীষণ গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে বললেন—আপনারা সকলেই রাজাকে ভ্রান্ত উপদেশ দান করছেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই যুদ্ধে রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। আমি এখনও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছি, আপনি সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করুন।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বললেন—তাত, আপনি এত ভীত হচ্ছেন কেন? আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারবে না।

বিভীষণ ধীর মধুর স্বরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন—বৎস ইন্দ্রজিৎ, তুমি বয়সে নবীন, আপন শৌর্যে বীর্যে মত্ত. তুমি পৃথিবীর ভালমন্দ বিচার করতে এখনও শেখনি। তোমার পিতা তোমাকে এই সভায় আহ্বান করেছেন কেবল নিজের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্য নয়। তোমার পিতাকে এই কুকর্ম হতে নিবৃত্ত করতে না পারলে তোমার ধ্বংসও অনিবার্য।

বিভীষণের বাক্যে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—বিভীষণ, আমি তোমার বাক্য অনেকক্ষণ ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেছি। রাজনীতি ধর্মে একটি উপদেশ আছে। পরম ক্ষমতাশালী শত্রু অনেক শ্রেয়, কিন্তু বিভেদকারী আত্মীয় বা ছদ্মবেশী মিত্র সর্বদা পরিত্যাজ্য। বিভীষণ, রামের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, সে বিষয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমার আদেশ, তুমি এই মুহূর্তে লঙ্কা পরিত্যাগ করে তোমার যেস্থানে ইচ্ছা গমন করতে পার।

বিভীষণ অপমানে বিবর্ণ। অল্পক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করলেন, তারপর সভাস্থল পরিত্যাগ করে আপন বিমানরথের দিকে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সহচর।

মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে সমুদ্রতীরের অদূরবর্তী স্থানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ—সুগ্রীব হনুমান সৈন্য সমাবেশ করেছেন। মহেন্দ্র পর্বতের গুহায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করছেন, আর সম্মুখে প্রশস্ত উপত্যকায় সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমানাদি বীরগণ রণসজ্জায় সজ্জিত। উপত্যকা ভূমির নিম্নে সমতল ভূমির ওপর শিবিকা স্থাপন করেছেন সৈন্যগণ এবং বেলাভূমির সীমারেখায় শিবিকা বাহক ও প্রতিহারীগণের স্থান নির্ধারিত।

বিভীষণের বিমানরথ বেলাভূমির ওপর অবতরণ করল। বিচিত্র ধরনের বিমানরথ দর্শন করে সৈন্যগণ প্রথমে হতচকিত। তারপর বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল—আপনার পরিচয়? কি অভিপ্রায়ে আপনার আগমন?

—আমার নাম বিভীষণ, আমি লঙ্কাধিপতি রাবণের ভ্রাতা। আমি শ্রীরামের সাক্ষাৎপ্রয়াসী। তাঁকে সংবাদ দাও, আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিপ্রায়ে এ স্থানে অপেক্ষা করছি।

সৈন্যগণ বিভিষণের বার্তা বহন করে শ্রীরামসকাশে উপস্থিত হল। সুগ্রীব বিভীষণের বার্তা শ্রবণ করে রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—শত্রু অতর্কিতে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। লঙ্কার সৈন্যদের অনেকে মায়াযুদ্ধে পারদর্শী। বিভীষণ হয়তো রাবণের চর। আমাদের মিত্ররূপে উপস্থিত হয়েছেন। আমার সন্দেহ, ঐ বিভীষণ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এখানে এসেছেন। মিত্র-প্রেরিত অরণ্যবাসী সৈন্য অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির ভৃত্য যদি উপস্থিত হয়, তাকে স্বপক্ষে গ্রহণ করা উচিত কিন্তু শত্রুসৈন্য অবশ্যই বর্জনীয়। আমাদের শত্রু রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ চারজন সহচর সহ এখানে এসেছেন। এঁদের বধ করাই উচিত বলে মনে হয়।

শ্রীরাম হনুমান-অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—বন্ধুবর্গ সুগ্রীবের উপদেশ সকলেই শ্রবণ করলে, এক্ষণে তোমাদের অভিমত কী? তোমরা সকলে যে উপদেশ দান করবে, আমি সেইরূপ কার্যই করব।

সকলে নত মস্তকে বিনীতভাবে নিবেদন করল যে তাদের পৃথক কোন বক্তব্য নাই। স্বয়ং রাম ও সুগ্রীব যে আদেশ দান করবেন, সকলেই নত মস্তকে বিনা দ্বিধায় তা পালন করবে।

রাম পুনরায় বীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন—তবু তোমাদের মনে কি আছে ব্যক্ত কর।

অঙ্গদ ধীরকণ্ঠে বললেন—বিভীষণকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তাঁকে বিচার করে দেখা হোক তাঁর দোষ আছে কি গুণ আছে। যদি তাঁর চরিত্রে অধিক দোষ থাকে, তাঁকে ত্যাগ করাই বিধেয় আর যদি তাঁর অধিক গুণ থাকে, তাহলে তাঁকে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বীর শরভ বললেন--চর পাঠিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করা হোক। জাম্ববান মন্তব্য করলেন—বিভীষণ শত্রুর নিকট হতে অসময়ে অস্থানে এসেছেন, সেজন্য তিনি শংকার পাত্র। মৈন্দ্র বললেন—বিভীষণকে মিষ্টবাক্যে প্রশ্ন করা হোক এবং জানা হোক তাঁর মনের অভিসন্ধি কী? ভাল না মন্দ?

হনুমান এতক্ষণে কথা বললেন। তিনি গম্ভীর অথচ ধীরভাবে বললেন—প্রভু, আপনার সচিবগণ যা বললেন, সবই শ্রবণ করলাম। আমি কিন্তু এঁদের বক্তব্য সমর্থন করি না। বিভীষণ অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির, এ সংবাদ আমি লঙ্কায় সংগ্রহ করেছি। বিভীষণ পত্নী সরমা জননী জানকীকে অত্যন্ত যত্ন করতেন এবং অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতেন। এ সংবাদ স্বয়ং জননী জানকী আমাকে প্রদান করেছেন।

আমার ধারণা, বিভীষণ অসময়ে বা অস্থানে আগমন করেননি। তিনি পূর্বাপর সব বিচার করেই শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়াসী। রাবণের দৌরাত্ম্য এবং শ্রীরামের বিক্রম বিচার করেই বিভীষণ শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এই অবস্থায় চর প্রেরণ করলে হয়ত তাঁর অপমান হবে। তাঁকে রামসমীপে সসম্মানে আনা হোক এবং তাঁর কী ইচ্ছা, তাঁর নিজ মুখ হতেই শ্রবণ করা যাক। আমার সন্দেহ, তিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবের সাহায্যে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করতে চান। এই অবস্থায় বিভীষণ আমাদের পক্ষে থাকলে আমরা শত্রুপক্ষের দুর্বলতম সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব। বিভীষণ নিতান্তই যদি বিদ্রোহ করেন অথবা শত্রুপক্ষের ন্যায় আচরণ করেন, তবে তাঁকে বধ করা মোটেই আয়াসসাপেক্ষ হবে না।

সুগ্রীব ধীরকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—বিভীষণ দুষ্ট বা অদুষ্ট, যাই হোন না কেন, যখন বিপদকালে ভ্রাতাকে ত্যাগ করে এসেছেন, তখন তাঁকে পরিহার করা আমাদেরও কর্তব্য।

শ্রীরাম মৃদু হাস্যে উত্তরদান করলেন—সুগ্রীবের উপদেশ সঙ্গত কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি কালে সর্বদা শাস্ত্র জ্ঞানসম্মত বাক্য অনুসরণ করা সম্ভব নয়, উচিতও

নয়। বিভীষণের সঙ্গে রাবণের যে বিরোধ উপস্থিত, তার কারণ অনুমান হয় জ্ঞাতিবিরোধজনিত। বিভীষণ রাবণকে পরাস্ত করে লংকার রাজত্ব লাভ করতে চান। আমাদের লংকার সিংহাসনের ওপর কোন আকর্ষণ নাই। আমাদের সাহায্যে বিভীষণ লংকার সিংহাসন লাভ করবে, বিভীষণের সাহায্যে আমরা রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করব। বিভীষণ লংকার সিংহাসনে উপবেশন করলে সমগ্র ভারতে আমরা এক অখণ্ড রাজত্ব স্থাপনা করতে পারব, অতএব বিভীষণকে এস্থানে আনয়ন করার ব্যবস্থা কর।

সুগ্রীব তবু একবার ইতস্তত করে বললেন—বিভীষণ রাবণের চর। বিশ্বাস উৎপাদন করে তিনি আমাদের বধ করতে এসেছেন।

শ্রীরাম মৃদু অথচ গম্ভীরস্বরে বললেন—বিভীষণ আমাদের লেশমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি বিভীষণকে অভয় দিয়ে এখানে উপস্থিত কর।

বিভীষণ তাঁর অনুচরগণের সঙ্গে রামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে প্রণাম করে আপন পরিচয় দান করলেন—মহামতি শ্রীরামচন্দ্র, আমি রাবণের অনুজ বিভীষণ। তিনি আমাকে অপমানিত করেছেন, সেজন্য আমি লংকার ধনসম্পত্তি ও আত্মীয়বর্গ ত্যাগ করে তোমার শরণাগত হয়েছি। আমার রাজ্য, জীবন এবং সমৃদ্ধি সমস্তই তোমার অধীন।

শ্রীরাম বিভীষণকে অভয় দান করে বললেন—তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি এক্ষণে রাবণের বলাবল বর্ণনা কর।

বিভীষণ সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ অপরাজেয় বীর। তিনি বীরত্বে কিংবদন্তী। রাবণ সর্বপ্রাণীর অবধ্য। দ্বিতীয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণও যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। সেনাপতি প্রহস্ত মণিভদ্রকে পরাস্ত করেছিলেন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অনেক রকম আধুনিক আর্য ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। বস্তুত রাবণ উত্তর ভারত হতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করে লংকায় গমন করে আপন পুত্রগণকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান করেছেন। এমনভাবে শিক্ষাদান করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে ইন্দ্রজিৎ অনায়াসে রাজ্যশাসন করতে পারে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা দশ সহস্র কোটি।

শ্রীরাম অভয় দান করে বললেন—বিভীষণ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সবংশে রাবণকে নিধন করে তোমাকে লংকার রাজপদে অভিষিক্ত করব। আমি তিন ভ্রাতার নামে এবং বন্ধুবর সুগ্রীবের নামে শপথ করছি, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, রাবণ যেস্থানেই থাকুক, আমি তাকে বধ করবই।

বিভীষণ আবেগগম্ভীর কন্ঠে উত্তরদান করলেন—রাবণ বধে এবং লংকাজয়ে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করব।

শ্রীরাম বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন। বিভীষণও আবেগে আপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন পাশে নিজেকে দ্বিধাহীন চিত্তে সঁপে দিলেন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন—লক্ষ্মণ, আমি এর প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি শীঘ্র সমুদ্র হতে জল আনয়ন কর। আমি মহাপ্রাজ্ঞ বন্ধুবর বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন করব।

রামের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ সকলের সমক্ষে বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সকলে সমস্বরে 'সাধু সাধু' রবে আনন্দধ্বনি করতে লাগল।

অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর রাম প্রশ্ন করলেন—আমরা কী করে সসৈন্যে সমুদ্র পার হব, তার উপায় নির্ধারণ কর বিভীষণ।

বিভীষণ চিন্তা করে বললেন—দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্রে গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। স্বয়ং শ্রীরাম যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে ওই স্থানে সেতুবন্ধন করা হয়ত সম্ভব হবে। সেতুবন্ধন ব্যতিরেকে সসৈন্যে লঙ্কা আক্রমণ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না।

শ্রীরাম অল্পক্ষণ চিন্তা করে বললেন—বিভীষণ যে কথা বলেছে, তা অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োচিত। চল, সকলেই আমরা সমুদ্রতীরে যাত্রা করি এবং সেতু বন্ধনের স্থান নির্বাচন করি।

সকলে শ্রীরামের পশ্চাতে সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রত্যূষের সূর্য তখন মধ্যাহ্নের আকাশে।

তেইশ

রাবণ সকাশে শার্দুল নামে এক চর শঙ্কিতভাবে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল মহারাজ, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, সাগরের অপর তীরে দশ যোজনব্যাপী দীর্ঘস্থানে সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণ সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং সাগর অতিক্রম করে লঙ্কা আক্রমণের উদ্যোগ করছেন।

রাবণ আকাশরক্ষী শুককে আহ্বান করে বললেন—শুক, তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা কর। তাকে বলবে, সুগ্রীবের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার সঙ্গে সুগ্রীবেরও সখ্যতা হওয়া উচিত। আমি রামের পত্নী অপহরণ করেছি, সুগ্রীবের কোন ক্ষতি করিনি, অতএব এই যুদ্ধে সে যেন কোন অংশগ্রহণ না করে নিরপেক্ষ থাকে।

শুক অভিবাদন করে বিদায় নিল। আকাশ পথে সাগর পার হয়ে যেস্থানে রামের সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে, সেই স্থানে সে উপস্থিত হল।

সুগ্রীবের সৈন্যগণ শুকের দর্শন মাত্রই তাকে আক্রমণ করল। নিরুপায় শুক

দৌত্য পতাকা উড্ডীন করে চিৎকার করে জানাল, আমি মহারাজ রাবণের দূত। আমি কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মহারাজ রাবণের পরামর্শ ব্যক্ত করতে উপস্থিত হয়েছি।

শ্রীরাম আদেশ দিলেন, শুককে অনতিবিলম্বে তাঁদের নিকট উপস্থিত করতে। সৈন্যগণ শুককে বন্দী করে শ্রীরাম সমীপে উপস্থিত করল। সুগ্রীব শুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন—কী তোমার বক্তব্য?

মহারাজ রাবণ আপনার নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন, অকারণ আপনি রাবণ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন। মহারাজ রাবণ আপনার কোন ক্ষতি করেন নাই উপরন্তু আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বালীর সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। রাজা রাবণ রামের পত্নী অপহরণ করেছেন, সেজন্য যদি কোন শত্রুতা ও কলহের উৎপত্তি হয়ে থাকে তা হয়েছে বনচারী শ্রীরামের সঙ্গে। এই অবস্থায় আপনি এই যুদ্ধ হতে নিজেকে অপসারিত করে একক শ্রীরামকে রণে অবতীর্ণ হবার সুযোগ দিন।

সুগ্রীব ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উত্তরদান করলেন—রাবণের সঙ্গে আমার কোন দিনই বন্ধুত্ব ছিল না, আজও নেই। শ্রীরাম আমার প্রাণের সখা, তাঁরই কৃপায় আমি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য লাভ করেছি। আমি কোনদিনই শ্রীরামের পক্ষ পরিত্যাগ করব না এ কথা তুমি রাবণকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পার। আর কিছু বক্তব্য আছে?

—না।

তবে শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর। বিলম্বে তোমার প্রাণহানির আশঙ্কা বিদ্যমান। আমার সৈন্যরা উত্তেজিত হলে তাদের শৃঙ্খলিত করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শুক সুগ্রীব-রাম-লক্ষ্মণকে অভিবাদন করে বিদায় নিল।

সুগ্রীব চিন্তিত হয়ে শ্রীরামকে বললেন—বন্ধুবর, বর্তমানে সমুদ্র লঙ্ঘনের একটি উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

শ্রীরাম বিভীষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। বিভীষণ সে দৃষ্টির কারণ অনুমান করে বললেন—একটু দক্ষিণে চলুন। সে স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প জল আছে।

শ্রীরাম সদলবলে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। একস্থানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, সমুদ্রতট হতে বেলাভূমি সমুদ্রের মধ্যে বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত। শ্রীরাম সসৈন্যে সেই বেলাভূমির ওপর যাত্রা করে লক্ষ্য করলেন, বালুকাতট সৈন্যগণের ভার গ্রহণে সমর্থ। শ্রীরাম সমুদ্রের জলপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে শর সংযোজন করে সাগরের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দীর্ঘক্ষণ পরে শরশব্দ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। শ্রীরাম অনুভব করলেন সাগরের গভীরতা এস্থানে অধিক। আরও দক্ষিণ দিকে

লক্ষ্য স্থির করে, শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় শর সংযোজন করলেন। কয়েকবার এইরূপ শরক্ষেপণ করে, একবার শ্রীরামের মনে হল, শরশব্দ অতি সত্বর প্রতিহত হয়ে এল।

শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশ দিলেন. এইস্থানে সাগরের গভীরতা অল্প। এই স্থানে প্রস্তর ক্ষেপণ করে সেতু রচনা করা সম্ভব হবে। মহেন্দ্র পর্বত এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পর্বতাঞ্চল হতে শিলাখন্ড এবং বৃক্ষাদি সংগ্রহ করে এ স্থানে নিক্ষেপ কর। বৃক্ষাদি সেতুর দুই পার্শ্বে লম্বভাবে স্থাপনা করবে, অন্যথায় শিলাখন্ডগুলি সাগরের স্রোতে ধৌত হয়ে যেতে পারে। অনর্থক সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তে সেতুবন্ধনের কার্য আরম্ভ কর।

সকলে একযোগে সেতুবন্ধনের কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শুক রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করামাত্র চিন্তিত রাবণ প্রশ্ন করলেন শুক, তোমার এ অবস্থা কেন ? কি হয়েছে ?

শুক সবিস্তারে সুগ্রীব ও রাম-সাক্ষাতের বিষয় বর্ণনা করল। পরিশেষে বলল —সুগ্রীবের সৈন্যদল অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের এবং মহাশক্তিরধর। তারা আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু পরম দয়াশীল শ্রীরাম আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। মহারাজ, এখনও সময় আছে। আপনি সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধি করুন।

রাবণ শুকের কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন—রাম-সুগ্রীবের সৈন্যদল কোথায় ?

—তাঁরা সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কার দক্ষিণে সমাবিষ্ট হয়েছেন।

—তুমি এক কাজ কর। সারণকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে শত্রুপক্ষের সৈন্যদলে যাও। তাদের ক্ষমতা বিষয়ে ধারণা করে শীঘ্র আমাকে সংবাদ প্রদান কর।

শুক রাবণকে অভিবাদন করে প্রস্থান করল।

রাবণ প্রতিহারীকে নির্দেশ দিলেন শিল্পী বিদ্যুজ্জিহ্বাকে সংবাদ প্রেরণের জন্য। মন্ত্রিগণ রাবণকে অভিপ্রায়ের প্রশ্ন করতে রাবণ মৃদুহাস্যে রহস্যজনকভাবে উত্তরদান করলেন—শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার সর্বচেষ্টাই বিধেয়।

ইতোমধ্যে শুক-সারণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে বলল—মহারাজ, আমরা রামকৃপায় কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি। আমরা ছদ্মবেশে সুগ্রীবের সৈন্যমাঝে প্রবেশ করেছিলাম, প্রথমে কেউ সন্দেহ করেনি, কিন্তু বিভীষণ আমাদের চিনতে পারেন এবং আমাদের বন্দী করে রামসমক্ষে নিয়ে যান। অন্যান্য বীরেরা আমাদের হত্যা করার পরামর্শ দেন, কিন্তু শ্রীরাম সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে আমাদের প্রতি নির্দেশ দেন, আমরা সুগ্রীব ও রামের সৈন্য সমাবেশ পরীক্ষার জন্য

গিয়েছি, অতএব আমরা যেন সে কাজ সম্পূর্ণ করে যাই। যদি সম্পূর্ণ সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য না করে থাকি, বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে সব যেন পর্যালোচনা করে আসি।

শুক লজ্জিতকণ্ঠে বলল—আমরা লজ্জায় অধোমুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর অথচ মধুরকণ্ঠে বললেন—দূতদ্বয়, তোমরা রাবণকে গিয়ে আমাদের ক্ষমতার কথা বলবে। এ কথাও বল, যে ক্ষমতার ওপর ভরসা করে জানকীকে অপহরণ করে এনেছে, রাবণ সেই ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই যেন আমাদের পরাস্ত করে।

সভাস্থল নীরব।

শুক কিছুক্ষণ নীরব রইল, তারপর সবিনয়ে নিবেদন করল—মহারাজ, আমরা শত্রুপক্ষের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। আমাদের মনে হয়, লঙ্কার মঙ্গলার্থে আপনি সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন।

রাবণ গম্ভীরকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন—তোমরা কর্তব্য সম্পাদন করেছ। এখন তোমরা বিশ্রাম কর।

শুক-সারণ নীরবে বিদায় নিল।

শিল্পী বিদ্যুজ্জিহ্বা সভায় প্রবেশ করে রাবণকে অভিবাদন করে সভাস্থলের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন। রাবণ তাঁকে নির্দেশ দিলেন—শিল্পী, তুমি আসন গ্রহণ কর।

শিল্পী আসন গ্রহণ করলেন। রাবণ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি একবার আমার বাসগৃহে এস। একটি গোপন আলোচনা আছে।

সভাভঙ্গ করে রাবণ আপন আবাসগৃহে গমন করলেন। গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী মন্দোদরী ধীরদর্পিত কণ্ঠে বললেন—এখনও যদি লঙ্কার মঙ্গল চাও, সীতাকে প্রত্যর্পণ করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর।

রাবণ মৃদুহাস্যে উত্তরদান করলেন—মহারাণী, আর কোন উপায় নাই। পৃথিবীতে হয় রাম বর্তমান থাকবে, নয় রাবণ বর্তমান থাকবে। তুমি পূজার কক্ষে শুদ্ধচিত্তে আমার কল্যাণ প্রার্থনা কর। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্দোদরী কক্ষ পরিত্যাগ করে অন্দরপ্রাসাদে গমন করলেন।

প্রতিহারী কক্ষদ্বারে উপস্থিত হয়ে জানাল, দ্বারপ্রান্তে শিল্পী বিদ্যুজ্জিহ্বা উপস্থিত।

—তাকে নিয়ে এস।

প্রতিহারী বিদ্যুজ্জিহ্বাকে কক্ষে নিয়ে এল। রাবণ প্রতিহারীকে নির্দেশ দিলেন —তুমি দ্বার বন্ধ করে কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করবে। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেবে না।

প্রতিহারী অভিবাদন করে কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। রাবণ রুদ্ধদ্বারের মধ্যে বিদ্যুজ্জিহ্বাকে আদেশ দিলেন—খুব গোপনে যথাশীঘ্র পার-

আমাকে একটি রামমুণ্ড এবং একটি সুন্দর ধনুক তৈরি করে এনে দাও। মুণ্ডটি রক্তাক্ত হবে এবং কোনমতেই যেন কৃত্রিম মনে না হয়।

বিদ্যুজ্জিহ্বা কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তর দিলেন—আপনি অর্ধ প্রহর অপেক্ষা করুন। আমি প্রস্তুত করে আনছি।

রাবণ সম্মতি দিলেন।

বিদ্যুজ্জিহ্বা সেই মুহূর্তে কক্ষ হতে নির্গত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই রামের কৃত্রিম মস্তক ও অপূর্ব মণিখচিত ধনুক সৃষ্টি করে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

রাবণ উল্লসিত হয়ে কৃত্রিম মস্তক ও ধনুর্বাণ সহ অশোকবনের দিকে যাত্রা করলেন।

অশোকবনে প্রতিহারিণী বেষ্টিতা সীতাদেবী নত মস্তকে দুঃখিত অন্তরে উপবিষ্টা ছিলেন। রাবণ উচ্চরোলে হাস্য করে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রামের কর্তিত মুণ্ড সীতার সম্মুখে নিক্ষেপ করে বললেন—এই দেখ তোমার স্বামী রামের অবস্থা। ওই ধনুক দ্বারা আমি তাকে বধ করেছি। তার ছিন্নমুণ্ড তোমাকে উপহার দেব বলে বহন করে এনেছি। আর কেন প্রেয়সী, রাম গত। এক্ষণে তুমি আমার ভজনা কর। তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমাকে সর্বসুখে সুখী করব।

রামের মস্তক প্রত্যক্ষ করে ক্রমশ সীতাদেবীর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। এ কি সত্য! স্বয়ং রামের ছিন্ন মস্তক তাঁর সম্মুখে! ছিন্ন মস্তক হতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত! শ্রীরামের বিহনে জানকীর জীবনধারণ বৃথা। তিনি এই মুহূর্তেই জীবন পরিত্যাগ করবেন। জানকী নিশ্চয়ই মহাপাপ করেছেন, তা না হলে তিনি মৃতপতিকা হবেন কেন? তাঁর মৃত্যুর আগে স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে, সে পাপ তাঁর নিজের।

সীতাদেবীর চোখের সামনে থেকে আলোকজ্যোতি বিলীন হয়ে যেতে লাগল। সীতাদেবী ক্রমশ অবশ হয়ে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে লঙ্কাপুরীর দক্ষিণ প্রান্ত হতে শ্রীরামচন্দ্রের রণভেরী গর্জে উঠল। সেই রণভেরী শ্রবণ মাত্রই রাবণ চমকিত হয়ে উঠলেন এবং কালবিলম্ব না করে মায়ামুণ্ড ও ধনুক গ্রহণ করে বিদায় নিলেন।

রাবণের প্রস্থানের পর সরমা অশোকবনে প্রবেশ করলেন। সরমা সীতাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে প্রত্যহ দেখাশোনা করেন। সীতাদেবীকে সুস্থ করে সস্নেহে সরমা সংস্কৃত ভাষায় বললেন—এত সামান্য কারণে এত বিচলিত কেন হয়েছ? লঙ্কাপুরীর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শ্রীরামের রণতূর্যের শব্দ আসছে, এ সংবাদ হতে তুমি নিশ্চিন্ত থেক, শ্রীরাম আসছেন, তিনি তোমাকে উদ্ধার করতে নিশ্চিতভাবে আবির্ভূত হচ্ছেন। বিষ্ণু যেমন আর্তকে রক্ষা করার জন্য শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম

ধারণ করে রক্ষাকর্তারূপে আবির্ভূত হন, তেমনি মহামতি নবদূর্বাদল শ্যাম রাম তোমার রক্ষাকর্তারূপে লঙ্কার দক্ষিণ প্রান্তে নবোদিত সূর্যের ন্যায় বিরাজিত। তুমি নিশ্চিন্ত থাক দেবি, শ্রীরামচন্দ্র যদি জীবিত না থাকতেন, তাহলে ওই রণবাদ্য ওইভাবে গর্জিত হত না। রণবাদ্যের নিনাদ তুমিও শ্রবণ করেছ, ওই নিনাদ শব্দে মহাবীর রাবণের বক্ষহৃদয়ও সভয়ে কম্পিত। শ্রীরাম যদি প্রকৃতই হত হতেন, রাবণ শ্রীরামের কর্তিত মস্তক কদাপি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন না, কারণ তিনি জানেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তুমি পরীক্ষা করে অবশ্যই বুঝতে পারবে এই মুণ্ড কৃত্রিম। ওঠ দেবি, তুমি অশ্রুমোচন কর। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা কর। অচিরেই দেখবে, তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

সরমার সান্ত্বনা বাক্যে সীতাদেবী অনেক সুস্থ বোধ করলেন এবং ভূতলশয্যা পরিত্যাগ করে অশ্রুমোচন করে শ্রীরামের মঙ্গল প্রার্থনায় ব্রতী হলেন।

রণভেরী এবং রামসৈন্যের তুমুল শব্দে রাবণ ক্ষণকাল নীরব থেকে সভাস্থ সচিবগণকে উদ্দেশ করে বললেন—রামের সাগর উত্তরণ ও বলবিক্রমের কথা সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হয়েছ। তোমরা সকলেই মহাবীর, একথা আমি নিশ্চিতভাবে জানি। কিন্তু বর্তমানে বলদর্প প্রদর্শন না করে, সকলে নীরবে পরস্পরের প্রতি তাকাচ্ছ কেন?

রাবণের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রবীণ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান ধীরকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—রাজা, রাজকার্যে সর্বসময়ে যুদ্ধ অভিপ্রেত নয়। অবস্থা ব্যবস্থা অনুমান করে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলে সেই যুদ্ধে জয় অপরিহার্য। রাবণ, তুমি মহাপরাক্রমশালী বীর, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি নানাদেশের প্রতি এত অত্যাচার করেছ, এত নারীহরণ করেছ, এত রাজা মহারাজাকে অপমানিত করেছ যে তোমার শত্রুসংখ্যা অগণিত। শ্রীরাম-সুগ্রীবের যে সৈন্যবলের বর্ণনা শুনলাম, তাতে তাঁদের দুর্বল বলে চিন্তা করার কোন কারণ ঘটেনি। এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সমস্ত অপমানিত নৃপতির দল যোগ দেবেন, ফলে তোমার পক্ষে জয়লাভের আশা সুদূরপরাহত হবে। শক্তিমান রাজার পক্ষে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সন্ধি স্থাপন করাও মর্যাদাপূর্ণ। এখনও সময় আছে, তুমি বন্দিনী সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। এতে তোমারও মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এবং লঙ্কারও মঙ্গল হবে।

রাবণ ভ্রূকুটি করে উত্তরদান করলেন—আমার হিতকামনায় শত্রুপক্ষকে শক্তিমান কল্পনা করে আপনি যে অহিত বাক্য বললেন, সেরূপ আমি পূর্বে কখনও শুনিনি। আপনি নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন, রামকে তাঁর পিতা নির্বাসিত করেছেন। রাম সহায়সম্বলহীন দীন-হীন মানুষ। দৈবগতিকে রাম সেতুবন্ধন করে লঙ্কাপুরীতে

এসেছে। এতে ভয় বা বিস্ময়ের কী আছে? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এ যুদ্ধে রামকে আমি পরাজিত করব।

মাল্যবান আর কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না। নীরবে অধোবদনে বসে রইলেন।

রাবণ মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে আদেশ দিলেন—প্রহস্ত পূর্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বারে এবং শুক-সারণ উত্তর দ্বারে থাকবে।

পরক্ষণেই রাবণ পুনর্বার বললেন—না, আমি স্বয়ং উত্তর দ্বারে উপস্থিত থাকব। বিরূপাক্ষ বহু সৈন্য সঙ্গে লঙ্কার মধ্য ভাগ রক্ষা করবেন।

যুদ্ধ প্রস্তুতি আলোচনার পর রাবণ সভাভঙ্গ করলেন। সকলে আপন আপন সৈন্য সমাবেশের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

চব্বিশ

রাম বললেন—নীল পূর্ব দ্বারে প্রহস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব মহোদরকে আক্রমণ করবে, হনুমান পশ্চিম দ্বার আক্রমণ করুক এবং আমি উত্তর দ্বার আক্রমণ করব। আমার সঙ্গে থাকবে লক্ষ্মণ। সুগ্রীব, জাম্ববান এবং বিভীষণ মধ্য স্থান আক্রমণ করবেন।

রাম প্রাথমিক নির্দেশ দেবার পর বললেন—আমাদের মধ্যে এই নিয়ম থাকুক, যে যেরূপ রূপে আছে, সে সেরূপ পরিবর্তন করবে না। যারা বানরের রূপে আছে, তারা যেন মানুষের রূপ ধারণ না করে, তাদের বানররূপ দেখেই আমরা যেন নিজেদের লোক বলে চিনতে পারি। আমাদের মধ্যে মানুষরূপে থাকব আমি, লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ এবং তাঁর চার অমাত্য। এ বিষয়ে যদি তোমাদের কোন মত-পার্থক্য থাকে, তাহলে আমাকে জানাতে দ্বিধা কর না।

সকলে একবাক্যে রামের কথায় রাজী হলেন। তখন সাব্যস্ত হল সে রাত্রি প্রত্যেকে সুবেল পর্বতে অতিবাহিত করে পরদিন প্রত্যূষে যুদ্ধারম্ভের সূচনা করবে।

রাত্রি প্রভাতে নবোদিত সূর্য উদিত হল পূর্বাকাশে। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, হনুমান ও অঙ্গদসহ সুবেল পর্বতের শীর্ষে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণ ও নীলকে আদেশ দিলেন সৈন্যশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

সুবেল পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করে শ্রীরাম ত্রিকূট শৃঙ্গে অবস্থিত লঙ্কাপুরী পরিদর্শন করলেন। সূর্যদেবের প্রভাত কিরণে স্বর্ণলঙ্কা উদ্ভাসিত হয়ে এক

অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। ক্ষণিকের জন্য শ্রীরাম মোহিত হয়ে গেলেন। ক্ষণিকের জন্য শ্রীরামের মনে উদিত হল, এই অপরূপ নগরীকে তিনি ধ্বংস করবেন!

সেই মুহূর্তে বিভীষণ চিৎকার করে উঠলেন—ওই যে তোরণদ্বারের ওপর দুর্মতি রাবণ নগর রক্ষায় উপস্থিত। মুহূর্ত মধ্যে রামের স্বপ্নভঙ্গ হল এবং কঠিনকঠোর স্বরে অঙ্গদকে আদেশ দিলেন—রাবণের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে শেষবারের মত সীতাকে প্রত্যর্পণ করার প্রস্তাব দিয়ে এস। যদি সে প্রস্তাবে সম্মত না হয়, যুদ্ধ আরম্ভ করে দেবে। অঙ্গদ, এই যুদ্ধের সূচনা তোমা দ্বারাই হোক। তুমি জয়লাভ কর, আশীর্বাদ করি।

শ্রীরামের আজ্ঞা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নির্গত করে দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করলেন এবং অনতিবিলম্বে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এ ধরনের আক্রমণের জন্য রাবণ—বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। অমাত্যবেষ্টিত রাবণ অঙ্গদকে প্রশ্ন করলেন– তুমি কে।

—তোমার মৃত্যু। অঙ্গদ বীরদর্পে উত্তর দিলেন—আমি অযোধ্যাধিপতি রাম-দূত বালীরাজের পুত্র অঙ্গদ। আমার নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে। রাম আমাকে আদেশ দিয়েছেন, হয় তুমি সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ কর, নয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। যদি প্রণিপাত করে বৈদেহীকে সসম্মানে প্রত্যর্পণ না কর, তবে তুমি নিশ্চিত নিহত হবে, তোমার ঐশ্বর্য, রাজত্ব সব কিছুই বিভীষণ পাবেন।

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে সচিবদের আদেশ দিলেন অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। চারজন মন্ত্রী একযোগে অঙ্গদকে আক্রমণ করলেন, অঙ্গদ মুহূর্ত মধ্যে চার মন্ত্রীকে একযোগে আক্রমণ করলেন। চারজনকে বাহুবন্ধনে তোরণের শীর্ষদেশে উত্তোলিত কারে অঙ্গদ মন্ত্রিগণকে ভূমিতলে আঘাত করলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে মন্ত্রিগণের প্রাণবায়ু নির্গত হল। রাবণ পুনর্বার আদেশ দেবার পূর্বেই অঙ্গদ দীর্ঘ লম্ফে রামসমীপে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কোন কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই অঙ্গদ ঘোষণা করলেন—রাবণ যুদ্ধ চান এবং আমি যুদ্ধারম্ভ করে দিয়েছি। রাবণের সচিবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আপনার আশীর্বাদে প্রত্যাবর্তন করেছি।

শ্রীরামচন্দ্র আকাশচুম্বী গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন—লঙ্কা আক্রমণ কর।

যুদ্ধের আদেশ শ্রবণে সুগ্রীবের যোদ্ধাগণ বৃক্ষ, শিলা ও মুষ্টির আঘাতে সমবেতভাবে লঙ্কার প্রাকার-দ্বার আক্রমণ করল। রাবণের সৈন্যগণ তাদের সম্মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। যূথপতিগণ শ্রীরামের নির্দেশ অনুসারে লঙ্কার বিভিন্ন তোরণদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পরিখার জলরাশি পূর্ণ করল। কয়েক প্রহরের মধ্যে রাবণের সৈন্যগণকে পরাস্ত করে সুগ্রীবের সৈন্যগণ তোরণদ্বার অধিকার করল।

উভয়পক্ষে প্রলয়ংকরী যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে অঙ্গদ। জম্বুমালীর সঙ্গে হনুমান, নিকুম্ভের বিপরীতে নীল। প্রহস্তের সহিত সুগ্রীব, বিরূপাক্ষের সঙ্গে লক্ষ্মণ, অগ্নিকেতু এবং চার সচিবের সঙ্গে শ্রীরামের ভয়ংকর যুদ্ধ। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভূমিকায় ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। এই যুদ্ধে কে পরাজয় লাভ করবে, কে জয়ী হবে বলা অসম্ভব। মধ্যাহ্নের কিছু পরে ইন্দ্রজিৎ গদা দ্বারা অঙ্গদকে আঘাত করলেন, অঙ্গদ সেই গদা ইন্দ্রজিতের হাত হতে কেড়ে নিয়ে রথের সারথি ও অশ্বকে বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ নিরুপায় হয়ে পলায়ন করলেন। জম্বুমালী প্রস্তর হস্তে হনুমানের দিকে অগ্রসর হলেন, হনুমান তাঁর মস্তক লক্ষ্য করে এমন দৃঢ় আঘাত হানলেন যে জম্বুমালী সেস্থানেই মৃত্যুবরণ করলেন। সুগ্রীব প্রঘসকে বৃক্ষাঘাতে বধ করলেন। বিরূপাক্ষ লক্ষ্মণের শরে মৃত্যুবরণ করলেন। নীলের হস্তে নিকুম্ভের সারথি হত হলেন। সুষেন বিদ্যুৎমালীকে বধ করলেন। শ্রীরাম অনায়াসে তাঁর প্রতিপক্ষ যোদ্ধাগণকে হত্যা করলেন।

ইন্দ্রজিৎ অন্তরাল হতে শ্রীরামের রণকৌশল পরিদর্শন করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অতি আধুনিক শর অতি নিপুণভাবে নিক্ষেপ করছেন। ইন্দ্রজিৎ সিদ্ধান্তে এলেন, সাধারণ যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। রাত্রির আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রির অন্ধকারে আধুনিকতম অস্ত্র 'নাগপাশ' ক্ষেপণ করবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে। এই অস্ত্রের বিশেষত্ব হল শরের পশ্চাতে সূক্ষ্ম অথচ শক্তিমান সর্পসম রজ্জু আছে। যাকে লক্ষ্য করে এই বাণ নিক্ষেপ করা হয়, তার চতুর্দিকে শর ঘূর্ণিত হতে থাকে এবং সর্পরজ্জু বাণ হতে নির্গত হয়ে বন্ধন করতে থাকে। বন্ধন করতে করতে বন্ধন ক্রমশ এমন কঠিন হয়ে যায়, যখন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং শ্বাসরোধে শত্রুপক্ষের মৃত্যু ঘটে?

রাত্রির অন্ধকার লঙ্কাপুরীর আকাশে ঘনায়মান। এইরূপ অবস্থারই অপেক্ষায় ছিলেন ইন্দ্রজিৎ। অন্ধকার ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ 'নাগপাশ' অস্ত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে ত্যাগ করলেন। দূর হতেই শ্রীরাম লক্ষ্য করলেন নাগপাশ শর তাঁদের দিকে তীরবেগে ধাবিত হচ্ছে। শ্রীরাম সেই মুহূর্তে তূণ হতে নাগপাশ শরকে যে শর প্রতিহত করতে পারে, সেই শর নিষ্কাশিত করে নাগপাশ লক্ষ্য করে ক্ষেপণ করলেন। বহুদিনের অব্যবহারের ফলে শ্রীরামের শরগুলির তীক্ষ্ণতা বহুলাংশে লাঘব হয়েছিল। নাগপাশ প্রতিহতকারী শরের দ্বারা শ্রীরাম ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত শরে আঘাত করলেন, কিন্তু সে শর নাগপাশকে প্রতিহত করল না। ক্ষণিকের জন্য ইন্দ্রজিতের শর স্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু পুনরায় রামের প্রতি অগ্রসর হল। এখন শরের তেজ তত প্রখর নেই এবং দীপ্তিও অনেকাংশে লাঘব হয়ে গেছে।

শ্রীরামচন্দ্র স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তিনি অবগত আছেন, অস্ত্রের তীব্রতা

যখন হ্রাস পেয়েছে, তখন হয়ত মৃত্যু ঘটবে না, কিন্তু শরবন্ধনের হাত হতে তাঁদের নিস্তার নাই।

শ্রীরাম পক্ষের সমস্ত সৈন্যকুলকে বিস্মিত, বিমূঢ়, হতচকিত, আতঙ্কিত করে ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত শর রাম-লক্ষ্মণের চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হতে লাগল এবং শর-পশ্চাৎ হতে সর্পসম রজ্জু নির্গত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন করল। অত্যল্প কালের মধ্যেই রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভূতলশায়ী হলেন এবং ক্রমশ তাঁদের জ্ঞান বিলুপ্ত হল।

ইন্দ্রজিৎ অনুমান করেননি, তাঁর শরের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তাঁর নিক্ষিপ্ত অমোঘ স্বরে রাম-লক্ষ্মণ দেহত্যাগ করেছেন।

ইন্দ্রজিৎ সেই সংবাদ রাবণকে দান করার সঙ্গে সঙ্গে রাবণের শিবিরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বন্ধনাবস্থায় অচেতন হয়ে ভূমিতলে পতিত। সুগ্রীবের সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের প্রতি দৃকপাত করতে লাগল। সুগ্রীব হতাশায় ক্লান্ত. বিভীষণ এত বিচলিত যে কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। হনুমান শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাসাগ্রে আপন কর্ণ স্থাপন করে অনুভব করলেন তাঁদের প্রাণবায়ু তখনও নিঃসৃত হয়নি। হনুমান বন্ধনমুক্তির বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা। বিচিত্র ধরনের গ্রন্থি দ্বারা সর্পরজ্জু আবদ্ধ, হনুমানের ক্ষমতা হল না বন্ধন উন্মোচনের। হনুমান চেষ্টা করলেন বন্ধন ছিন্ন করার, কিন্তু রজ্জুগুলি এতই পিচ্ছিল, হনুমান ধরামাত্রই মুষ্টির দৃঢ়তা থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

হনুমান হতাশ হয়ে চতুর্দিক দেখতে লাগলেন। অকস্মাৎ দেখলেন একটি ক্ষুদ্র বিমানে করে একজন আগন্তুক রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

বিস্মিত হনুমান আগন্তুকের প্রতি অগ্রসর হলেন। বিমান রণক্ষেত্রের অদূরে অবতরণ করলে আগন্তুক হনুমানের দিকে অগ্রসর হলেন।

হনুমান করযোড়ে প্রণাম করে আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন—আপনার পরিচয়?

আগন্তুক মৃদু হাস্যে উত্তরদান করলেন—আমার নাম গরুড়। আমি শ্রীরামের বন্ধু। আকাশ পথ হতেই আমি রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন লক্ষ্য করেছি। রাবণ আমারও শত্রু। নাগপাশের বন্ধন উন্মোচনে আমি পারদর্শী। রাম-লক্ষ্মণের বন্ধন উন্মোচন করার জন্যই আমি ত্বরান্বিত করে অবতরণ করেছি।

হনুমান মহাসমাদরে গরুড়কে সঙ্গে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের নিকট নিয়ে গেলেন। গরুড় প্রথমে রামের পার্শ্বে উপবেশন করে বিচিত্র বন্ধন উন্মোচন করলেন, তারপর লক্ষ্মণের বন্ধন মুক্ত করলেন।

শ্রীরামের জ্ঞান পূর্বেই হয়েছিল, তিনি গরুড়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন—লক্ষ্মণ জীবিত আছে ?

—আছেন। হনুমান ম্লানকণ্ঠে উত্তর দিলেন—তবে অত্যন্ত দুর্বল।

—আমি বিদায় গ্রহণ করি। গরুড় করজোড়ে নিবেদন করলেন।

—আপনার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না। আবার কবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ?

—প্রয়োজনে নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমি আকাশ পথে অবস্থান করে আপনাদের যুদ্ধ লক্ষ্য করছি। আমারও একান্ত আশা, মহাপাপী রাবণের নিধন যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।

গরুড় বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে শক্তিবর্ধক পানীয় দিলেন হনুমান। সেই পানীয় গ্রহণ করে রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় সবল হয়ে উঠলেন। সমস্ত সৈন্যদল একত্রে সহর্ষে গর্জন করে উঠল।

—জয় শ্রীরামের জয়, জয় লক্ষ্মণের জয়, জয় সুগ্রীবের জয়—

সেই জয়ধ্বনি রাত্রিশেষের গহন অন্ধকারে রাবণের শিবিরমধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মুহুর্মুহু।

জয়ধ্বনি শ্রবণ করে কম্পিত হৃদয় রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রশ্ন করলেন—রাম-লক্ষ্মণ শরজালে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত, অথচ রাম-শিবির হতে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এর অর্থ কী, আমি স্থির করতে পারছি না ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ চিন্তিত সুরে উত্তরদান করলেন—আপনি স্থির হোন, আমি অবস্থা অনুধাবন করে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

ইন্দ্রজিৎ শিবির হতে নির্গত হয়ে রাম পক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ করলেন। তিনি চরমুখে অবহিত হলেন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাগপাশ হতে মুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মৃত্যু হয়নি, বরং সুস্থ দেহে পুনরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন।

ইন্দ্রজিৎ সেই সংবাদ রাবণকে পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে রাবণ মানসিক ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং ক্লান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন ধূম্রাক্ষকে সেনাপতি করে যুদ্ধযাত্রার আযোজন করতে।

শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, ভিন্দিপাল প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ধূম্রাক্ষ বহু সৈন্যসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ধূম্রাক্ষ রথোপরি আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। হনুমান দূর হতেই ধূম্রাক্ষের রথ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর রথ নিকটস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান পর্বতকন্দর হতে এক বিরাটকায় শিলা ধূম্রাক্ষের রথ লক্ষ্য করে আঘাত করলেন। আচম্বিতে সেই শিলা-প্রস্তর রথের ওপর পতিত হওয়ায় রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধূম্রাক্ষ রথ হতে অবতরণ করে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং বহু সুগ্রীব-সৈন্য বধ করলেন। হনুমান ধূম্রাক্ষের যুদ্ধের গতি অন্য-

পথে চালিত করার জন্যে সম্মুখে আক্রমণ করলেন, এবং তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে একধারে সরে দাঁড়ালেন। ধূম্রাক্ষের গদাঘাত ব্যর্থ এবং গদা ভূমিতলে প্রোথিত হল। ধূম্রাক্ষ সজোরে সেই গদা ভূমিতল হতে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন, ইত্যবসরে হনুমান এক প্রকাণ্ড শিলা ধূম্রাক্ষের মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং ধূম্রাক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। সেনাপতির যুদ্ধে পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রাবণ-সৈন্য বিশৃঙ্খলিত হয়ে নানা দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল এবং প্রাণভয়ে আপন শিবির অভিমুখে যাত্রা করল।

রাবণ ধূম্রাক্ষের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ না করে বজ্রদংষ্ট্রকে নির্দেশ দিলেন সেনাপতিত্ব করার জন্য। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রদংষ্ট্র বহু সৈন্য ও অস্ত্রসহ লঙ্কার দক্ষিণ দ্বারে যাত্রা করলেন। দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ উপস্থিত ছিলেন।

অঙ্গদের সঙ্গে বজ্রদংষ্ট্রের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এ যুদ্ধে কে জয়লাভ করবে স্থির করা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হল। সুনিপুণ যোদ্ধা অঙ্গদ এক অসতর্ক মুহূর্তে বজ্রদংষ্ট্রের স্কন্ধের ওপর খড়্গ ক্ষেপণ করলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন হয়ে গেল।

বজ্রদংষ্ট্রের পর অকম্পন। অকম্পনের পতন হবার পর রাবণ ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত ও নিকুম্ভকে আহ্বান করে আলোচনায় বসলেন। রাবণ চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন- শত্রুপক্ষকে যত হীনবল ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে ওরা অত হীনবল নয়। শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে হলে আমাদের ভিতরেই কাউকে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতে হবে।

রাবণ ক্ষণিক নীরব থেকে বললেন—প্রহস্ত, আজকের যুদ্ধে তুমি সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর, এই আমার অভিলাষ।

প্রহস্ত মৃদুকণ্ঠে উত্তরদান করলেন—মহারাজ, বিচক্ষণ ও প্রবীণ মন্ত্রিগণ সম্পর্কে বিতর্ক করেছেন এবং বারংবার সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে সন্ধি স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ সে সমস্ত আলোচনা নিরর্থক। আপনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, স্নেহ দান করেছেন। আমি সর্বদা আপনার আদেশ পালন করব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আপনার যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। যুদ্ধই যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন আমি স্ত্রী পুত্র বা ধন কামনা করি না। আপনার জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

স্থির হল, প্রহস্ত সেনাপতি হবে। বিপুল সৈন্য নিয়ে প্রহস্ত যুদ্ধযাত্রা করলেন। প্রহস্ত বিদ্যুৎগতিতে রামশিবিরের প্রতি অগ্রসর হলেন।

রাম প্রহস্তের ক্ষিপ্র গতি লক্ষ্য কবে প্রশ্ন করলেন—এই বীরের পরিচয় কি ?

বিভীষণ উত্তর দিলেন—ইনি মহাবীর অস্ত্রবিশারদ সেনাপতি প্রহস্ত। প্রহস্তের সঙ্গে লঙ্কার এক তৃতীয়াংশ সৈন্যদল আছে।

প্রহস্ত প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর বিক্রম পরিদর্শন করে, প্রহস্তের সৈন্যরাও পরম বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। রাম-শিবিরের সেদিন সেনাপতি মহাবীর নীল। নীল ও প্রহস্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয় পক্ষের সৈন্যের মারামারি কাটকাটিতে বহু সৈন্য হত হল। তাদের রক্তে রণভূমি পিচ্ছিল হয়ে গেল।

প্রহস্তের রণজালে নীল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক বৃহৎ শালবৃক্ষ উৎপাটিত করে, সেই বৃক্ষ দ্বারা শরজাল বাধা দিতে লাগলেন। শরযুদ্ধে নীল প্রহস্তের সমকক্ষ হতে পারবেন না স্থির করে, প্রহস্তকে রথ হতে অবতরণে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। প্রহস্তের বাণ নিক্ষেপের জন্য নীল পশ্চাৎ অপসারণ করতে লাগলেন। প্রহস্ত যুদ্ধ করতে করতে কখন যে রথ হতে অবতরণ করেছেন, নিজেও বুঝতে পারেন নি। নীল এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রহস্ত ভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে নীল বৃক্ষ হস্তে প্রবলভাবে প্রহস্তকে আক্রমণ করলেন এবং রথ ও অশ্বগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।

প্রহস্ত প্রমাদ গনলেন। তিনি মুষল হস্তে নীলকে আক্রমণ করলেন, নীলও বৃক্ষ হস্তে প্রতিহত করতে লাগলেন, উভয়েই উভয়কে দংশন করতে লাগলেন এবং উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লেন। প্রহস্ত নীলের ললাটে প্রচণ্ডভাবে মুষলাঘাত করলেন। নীলেন সর্বশরীর শোণিতাক্ত। অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় নীল ভূমিতলে বসে পড়লেন। প্রহস্ত অনুমান করলেন নীল পরাস্ত হয়ে ভূমিতল গ্রহণ করেছেন। প্রহস্ত মুষল হস্তে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য ক্ষান্ত হলেন আর সেই মুহূর্তে নীল এক বৃহৎ শিলাখণ্ড ঊর্ধ্বে তুলে প্রহস্তের মস্তক লক্ষ্য করে ক্ষেপণ করলেন। প্রহস্ত এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পেলেন না। নীলের প্রস্তরাঘাতে প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। প্রহস্তের প্রাণহীন দেহ রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল। সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং নিরুদ্যম ও বিহ্বলবিবশ হয়ে লঙ্কাপুরীতে পলায়ন করল।

প্রহস্তের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে রাবণ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন—আমি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। রাবণের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ লাভ করে সমস্ত সৈন্যদল পুনর্বার উৎসাহিত হয়ে মহাকাশ বিদীর্ণ করে উঠল—জয় লঙ্কাপতি রাবণের জয়।

রাবণের সঙ্গে সুগ্রীবের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। সুগ্রীব সুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটিত করে রাবণের উদ্দেশ্যে ক্ষেপণ করলেন, রাবণ অনায়াসে বৃক্ষ খণ্ডন করে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই অব্যর্থ বাণের আঘাতে সুগ্রীব অচেতন হয়ে রণস্থলে

পতিত হলেন। সুগ্রীবকে অচেতন ও ধরাশায়ী দেখে নল, গবয়, গবাক্ষ প্রভৃতি বীরগণ শিলাবৃষ্টি করতে লাগলেন, কিন্তু রাবণের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাঁরা সকলেই আহত হয়ে পলায়ন করলেন।

লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকট নিবেদন করে বললেন—মহাবীর রাবণ আধুনিক অস্ত্রক্ষেপণে অত্যন্ত পটু। এর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের বীরগণ এঁটে উঠতে পারবেন না। হয় আমাকে, নয় আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। আপনি আমাকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দান করুন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন—রাবণের পরাক্রম আশ্চর্য। অত্যন্ত সাবধানে প্রতিপক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে, চক্ষু-কর্ণ সজাগ রেখে যুদ্ধ করবে।

লক্ষ্মণ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

হনুমান অপর দিক থেকে বহু সৈন্য বিনষ্ট হচ্ছে দেখে এক লম্ফে রাবণের রথের ওপর আরোহণ করে পরুষকণ্ঠে বললেন—রাবণ, স্মরণ আছে নিশ্চয়ই, আমি তোমার পুত্র অক্ষকে বধ করেছি।

এত নিকটে শরাঘাত করা সম্ভব নয় বুঝে রাবণ সক্রোধে হনুমানের বক্ষে চপেটাঘাত করলেন। প্রাথমিক আঘাতে হনুমান অস্থির ও হতচেতন হয়ে পড়লেন কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে রাবণকে সবেগে চপেটাঘাত করলেন। ভূমিকম্পে পর্বত যেরূপ প্রকম্পিত হয়, সেইভাবে অল্পক্ষণ কম্পিত হয়ে বিচলিত রাবণ বললেন—সাধু, সাধু হনুমান, তুমি আমার সম্মানিত প্রতিদ্বন্দ্বী।

হনুমান আস্ফালন করে বললেন—আমার শক্তিকে ধিক, তুমি এখনও জীবিত আছ। তুমি পুনর্বার আমাকে আঘাত করে দেখ, আমি তোমাকে এমন প্রত্যাঘাত করব যে তুমি যমালয়ে যাত্রা করবে।

হনুমানের বাক্য শেষ হতে না হতেই রাবণ পুনরায় হনুমানের বক্ষে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলেন। অকস্মাৎ সেই চপেটাঘাতে হনুমান বিহ্বল ও অস্থির হয়ে পড়লেন। হনুমানকে হীনবল দেখে রাবণ নীলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

হনুমান অল্পক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে রাবণের সম্মুখীন হয়ে বললেন—তুমি এখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, আমি তোমাকে আক্রমণ করব না।

রাবণ হনুমানের বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করে নীলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন নীল ক্ষণে রথে ক্ষণে রথধ্বজায় উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে রাবণ বিরক্ত হয়ে এক অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। নীল সেই শরাঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে জানুতে ভর দিয়ে ভূতলে অচেতন হয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ সেই মুহূর্তে শরক্ষেপণ করলেন রাবণকে লক্ষ্য করে। রাবণ সচেতন হয়ে সেই বাণ বিনষ্ট করলেন এবং অনুভব করলেন, লক্ষ্মণের যুদ্ধপদ্ধতি অত্যধিক আধুনিক। রাবণ কোনরূপ অবকাশ না দিয়ে অত্যাধুনিক প্রলয়ংকর শর 'অনলসংকাশ' অস্ত্র লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে ক্ষেপণ

করলেন। লক্ষ্মণ মুহূর্তমধ্যে অনুভব করলেন, এই অস্ত্র প্রতিহত করতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। 'অনলসংকাশ' শর প্রতিহতকারী অস্ত্র লক্ষ্মণ ধনুকে যুক্ত করে দ্রুতগতিতে ক্ষেপণ করলেন। মধ্যপথে দুই শরে সংঘাত ঘটল, কিন্তু লক্ষ্মণের শর রাবণের শরকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিহত করতে পারল না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে লক্ষ্মণের শর ভূমিতে পতিত হল, রাবণের শর শ্লথগতিতে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হল। রাবণ নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্মণের বক্ষে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভূতলে পতিত হল। লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। রাবণ অচেতন লক্ষ্মণকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে দুই হস্তে তাঁকে তুলে নিলেন। সেই মুহূর্তে হনুমান দ্রুতবেগে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাবণের বক্ষে বজ্রের ন্যায় মুষ্টি প্রহার করলেন।

রাবণ ঘূর্ণিত দেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর হস্তবন্ধনী হতে লক্ষ্মণ ভূমিতলে পতিত হলেন। রাবণের মুখ, চক্ষু, কর্ণ হতে রক্তস্রাব শুরু হল। হনুমান লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলে রামের নিকটে গেলেন, এবং লক্ষ্মণকে রামসমীপে সমর্পণ করে পুনরায় হনুমান রাবণ-সকাশে গেলেন যুদ্ধ করতে।

রাবণ ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে অসংখ্য শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। রাম সেই সৈন্য-ধ্বংস লক্ষ্য করে বললেন—আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হব।

হনুমান বললেন—রাবণ রথারোহণে যুদ্ধ করছেন। উচ্চস্থান ব্যতিরেকে শরযুদ্ধ আয়াসসাপেক্ষ। শ্রীরামচন্দ্র, আমার একটি সবিনয় নিবেদন আছে।

—বল।

রাবণ যেরূপ রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করছেন, আপনি সেরূপ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করুন। আমি আপনাকে পৃষ্ঠে করে রাবণ অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে বহন করে নিয়ে যাব, যে স্থান হতে অনায়াসে আপনি রাবণের প্রতি শরক্ষেপণ করতে পারবেন।

মৃদুহাস্যে শ্রীরাম উত্তর দিলেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

হনুমান শ্রীরামকে পৃষ্ঠে বহন করে আকাশমার্গে উড্ডীন হলেন। শ্রীরাম হনুমান-পৃষ্ঠ হতে দৈববাণীর মত রাবণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—দুর্মতি রাবণ, তুমি লক্ষ্মণকে শক্তির আঘাতে পীড়িত করেছ, এইবার আমার শরের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কর।

রাবণ হনুমানকে লক্ষ্য করে তাঁর মুষ্ট্যাঘাতের কথা স্মরণ করে, তাঁর প্রতি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। শ্রীরাম সে বাণ খণ্ডন করলেন, তারপর শরাঘাতে রাবণের রথ, অশ্ব, সারথি, শূল ও খড়্গ ছেদন করলেন। রাবণ ধনুতে শরসংযোগের পূর্বেই শ্রীরাম শরক্ষেপণ করলেন এবং সেই শর রাবণের বক্ষে আঘাত করল।

রাবণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর স্নায়ুসমষ্টি ক্রমশ শিথিল হয়ে গেল। হাত

হতে ধনুর্বাণ ভূমিতে পতিত হল। শ্রীরাম পুনরায় মৃদুহাস্যে অর্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণের আঘাতে রাবণের উজ্জ্বল মুকুট ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

রাবণ নিরুপায় দৃষ্টিতে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শ্রীরাম ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন—রাবণ, তুমি আজ ভীষণ যুদ্ধ করেছ, আমার বহু সৈন্য তোমার হস্তে নিহত হয়েছে। তুমিও সমস্ত দিন যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি তোমাকে শরাঘাতে বধ করলাম না। তুমি আজ রণক্লান্ত। অদ্য লঙ্কায় বিশ্রাম কর। বিশ্রামের পর সুস্থ হয়ে ধনুর্ধরদের সঙ্গে রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমার শক্তি পরীক্ষা কর। আজ বিদায়।

যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করে রাম এবং রাবণ আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পঁচিশ

লঙ্কাপুরীর রাজসভায় রাবণ জীবিত সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ কর।

সভাসদগণ পরস্পরের মুখপানে তাকালেন। রাবণ ইচ্ছাকৃতভাবে কুম্ভকর্ণকে অতিরিক্ত মদ-মাংস এবং নিদ্রাজনিত ঔষধ সেবনে দীর্ঘদিন সুপ্ত রাখতেন। কুম্ভকর্ণ অসাধারণ ক্ষমতাশালী। রাবণের ভীতি ছিল কুম্ভকর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনধারণ করলে যে কোনদিন রাবণকে পরাস্ত করে রাজ্যচ্যুত করতে পারেন. সেইজন্য অতি সুচতুরভাবে কুম্ভকর্ণকে অতিরিক্ত রকমের ভোজ্য ও পানীয় বিতরণ করে এক নির্জীব জীবনের কার্যক্রম রাবণ তৈরি করে দিয়েছিলেন। বৎসরের অধিকাংশ সময়, এমন কি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ছয় মাস কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকতেন। কোন একদিন নিদ্রাভঙ্গ হলে রাবণ সেদিন এত আহার এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন যে কুম্ভকর্ণ রাজ্য বিষয়ে কোন আলোচনারই সুযোগ পেতেন না। সমস্ত আহার এবং পানীয় গলাধঃকরণ করে কুম্ভকর্ণ পুনরায় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তেন। রাজকার্য বিচারের সময় পান না।

নিরুপায় রাবণ রাম বধার্থে কুম্ভকর্ণের শরণাপন্ন হলেন। রাজপ্রাসাদ হতে যোজন খানেক দূরে নিভৃতে কুম্ভকর্ণের প্রাসাদ। নিদ্রাকালে কুম্ভকর্ণের অতিরিক্ত রকমের নাসিকা-গর্জন হয়, সেই জন্যে তাঁর প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত নির্জন এবং নিভৃত স্থানে।

রাবণের নির্দেশে সৈন্যসামন্তগণ বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র ও খাদ্যবস্তু নিয়ে ম্ভকর্ণের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন।

কুম্ভকর্ণ তখন নাসিকা গর্জন সহকারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অমাত্যবর্গ বং সৈন্যদল উচ্চরোলে চিৎকার ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দনিনাদ করতে লাগলেন। নেকক্ষণ পরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল। প্রথমে তিনি অনুভব করতে পারলেন ।. তিনি কোথায় এবং কী অবস্থায় অবস্থান করছেন?

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্করগণ খাদ্যসামগ্রী সম্মুখে আনয়ন রলেন। কুম্ভকর্ণ নীরবে ভোজনপর্ব সমাধা করে নিদ্রিত ভাব দূর করলেন. রপর জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে?

অমাত্যবর্গ করজোড়ে নিবেদন করলেন—মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।

—আমাকে! অসময়ে! কী কারণে?

অমাত্যবর্গ কোন উত্তর দিলেন না। রাবণ অমাত্যবর্গকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন ম্ভকর্ণকে কোন সংবাদ বিতরণের। অমাত্যবর্গ বিনীতভাবে নিবেদন করলেন— মরা সে বিষয়ে অজ্ঞ। মহারাজ কেবল আপনাকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

—আমি প্রস্তুত হয়েই উপস্থিত হচ্ছি। তোমরা পূর্বে গমন কর।

অমাত্যবর্গ অভিবাদন করে বিদায় নিলেন। কুম্ভকর্ণ হাতমুখ প্রক্ষালন করে, াত্রপূর্ণ মদ্য পান করে রাবণ-নিবাসের পথে যাত্রা করলেন।

রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কুম্ভকর্ণ লক্ষ্য করলেন, সকলে ম্লানমুখে উপবিষ্ট। াজসিংহাসনে রাবণ উপবিষ্ট, কিন্তু রাবণের সেই দীপ্তি যেন ম্লান। অনেক অমাত্যর সংহাসন শূন্য।

কুম্ভকর্ণ তাঁর নির্ধারিত সিংহাসনে উপবেশন করে প্রশ্ন করলেন—কী সংবাদ তামরা কেন আমাকে জাগিয়েছ? তোমাদের সব কুশল তো?

রাবণ ম্লান কণ্ঠে লঙ্কার বিপদের কথা ব্যক্ত করলেন। কুম্ভকর্ণ মৃদু হাস্যে ালস্যজড়িত কণ্ঠে উত্তরদান করলেন—মন্ত্রণাকালেই আমরা এই বিপদের আশঙ্কা রেছিলাম, কিন্তু তুমি হিতবাক্য গ্রাহ্য কর নি, বলগর্বে পরিণাম না ভেবে পাপকর্ম রেছ। প্রত্যেক ধার্মিক রাজার উচিত, অর্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী সচিবদের পরামর্শ নয়ে এমন কার্যের অনুষ্ঠান করা যার পরিণাম হিতকর। যে রাজা শত্রুকে অবজ্ঞা রে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন না, তাঁরই অনর্থ ঘটে। রাণী মন্দোদরী, ভ্রাতা বভীষণ এবং আমার উপদেশ গ্রহণ করলে তোমার মঙ্গল হত।

রাবণ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করলেন, তারপর ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন— ম্ভকর্ণ, একটি প্রশ্ন করব?

—নিশ্চয়ই।

আমি জ্যেষ্ঠ; না তুমি জ্যেষ্ঠ?

কুম্ভকর্ণ লজ্জিত হয় উত্তর দিলেন—আমায় ক্ষমা কর।

রাবণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন—মোহই বল আর বলগর্বই বল যে কারণেই হোক, অতীতে যে কার্য করেছি, তার পুনরাবৃত্তি এখন বৃথা। বর্তমানে লঙ্কা আক্রান্ত, তাকে উদ্ধার করাই আমাদের কর্তব্য।

—তোমার এ যুক্তি স্বীকার করি। লঙ্কার বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, রাজকোষ ক্ষীণ হয়েছে, তোমার অধিকাংশ মিত্রই চাটুবাক্যে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, অহেতুক লোকক্ষয় করিয়েছে। আমি সাধ্যমত যুদ্ধ করব, তবে নিদ্রাজড়িত অবসাদ পরিপূর্ণভাবে আমার শরীর থেকে বিলুপ্ত হয়নি, সেজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করতে পারব কি না কথা দিতে পারব না।

রাবণ ভরসা দিয়ে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই কুম্ভকর্ণ। তোমাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা ইহজগতে কারও আছে কি না সন্দেহ।

কাঞ্চনভূষিত তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কুম্ভকর্ণ রণক্ষেত্রে যাত্রা করলেন এবং অমিতবীর্যে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। রাম কুম্ভকর্ণের বিচিত্র এবং অপূর্ব যুদ্ধরীতি লক্ষ্য করে বিভীষণকে প্রশ্ন করলেন—ইনি কে?

—ইনিই কুম্ভকর্ণ।

কুম্ভকর্ণের পরাক্রমে সুগ্রীবের সৈন্যদল ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলেছে এবং কোন বানরসেনাই কুম্ভকর্ণের সম্মুখে সমরে স্থিত হতে পারছে না।

বিভীষণ বললেন—শ্রীরাম, তোমার পরাক্রমে রাবণ ভীত হয়ে কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করেছে। কুম্ভকর্ণের পরাক্রমে সুগ্রীব সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করে দিন কুম্ভকর্ণ রাবণনির্মিত এক যন্ত্রবিশেষ। তাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। এই প্রচারে সৈন্যগণ পুনর্বার সাহস ফিরে পাবে, ইত্যবসরে আপনি অথবা লক্ষ্মণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন। আপনাদের দুজন ব্যতিরেকে অন্য কেউ সম্মুখসমরে কুম্ভকর্ণকে পরাস্ত করতে পারবে না।

শ্রীরাম বিভীষণের বাক্যানুসারে রটনা করে দিলেন কুম্ভকর্ণ যন্ত্রমাত্র। তাকে ভয় করার কোন কারণ নাই। সুগ্রীবের সৈন্যদল শ্রীরামের বাক্য বিশ্বাস করে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করল। সুগ্রীবও প্রবল পরাক্রমে কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই পরাস্ত হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে, শ্রীরামের নিকটে পলায়ন করে নিজের জীবনরক্ষা করলেন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করার। লক্ষ্মণ আদেশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। গদা হস্তে কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বললেন—বালক লক্ষ্মণ! তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ, এতেই আমি প্রীত এবং তোমার বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তুমি পথ ছাড়, আমি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

লক্ষ্মণকে সরিয়ে দিয়ে কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের নিকটে অগ্রসর হলেন। রামকে সম্মুখে দেখে কুম্ভকর্ণ বললেন—আমি বিরাধ নই, মারীচ খর কবন্ধ বা বালীও নই, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ। আমি রক্তাক্ত। আমার নাসিকা কর্ণযুগল কর্তিত ; তথাপি আমি অবজ্ঞেয় নই, আমার বিক্রম দেখ।

রাম ও কুম্ভকর্ণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হল। রাম যে শরে বালীবধ করেছিলেন, সেই শর নিক্ষেপ করলেন। রাম বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন কুম্ভকর্ণ অবিচল এবং গদা হস্তে রামকে আক্রমণ করতে আসছেন। শ্রীরাম তখন 'বায়ব্য' অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। মুহূর্তমধ্যে কুম্ভকর্ণের গদাসমেত দক্ষিণ হস্ত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণ বাম হস্তে তালবৃক্ষ উৎপাটন করে ধাবমান হলেন। শ্রীরাম 'ঐন্দ্রাস্ত্র' শর ক্ষেপণ করলেন। ঐন্দ্রাস্ত্রের আঘাতে কুম্ভকর্ণের বাম হস্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শ্রীরাম পুনরায় ধনুকে 'অর্ধচন্দ্র' বাণ নিয়োগ করে কুম্ভকর্ণকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণ করলেন। তীক্ষ্ন শরাঘাতে কুম্ভকর্ণের পদদ্বয় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হস্ত-পদহীন অবস্থায় কুম্ভকর্ণ ভূমিতলে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। সেই অশক্ত শরীরের ওপর উঠে সৈন্যদল নৃত্য করতে লাগল। অসহায় কুম্ভকর্ণ ভূতলে শায়িত হয়ে সেই কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন।

শ্রীরাম কুম্ভকর্ণের যন্ত্রণায় কষ্টবোধ করলেন এবং মৃত্যুচিহ্নস্বরূপ 'ঐন্দ্র' শর সংযোজন করে কুম্ভকর্ণকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। সেই শরে বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের বৃহৎ দশন ও চঞ্চল কুন্তলরাশি সমন্বিত মস্তক ছেদন হয়ে, দেহসমেত সমুদ্রে পতিত হল। জলচরপ্রাণী সভয়ে পলায়ন করল, সুগ্রীব সৈন্যদল আনন্দে জয়ধ্বনি দিল—জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদ রাবণের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র রাবণ অচেতন হয়ে পড়লেন। সচিবগণ এবং পুরনারিগণ হায় হায় করতে আরম্ভ করলেন। সকলে স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি বারি রাবণের মুখমন্ডলে সিঞ্চন করতে লাগলেন। অনেকে বাতাস করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে রাবণের জ্ঞান পুনরায় ধীরে ধীরে জাগ্রত হল। ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। চতুর্দিকে নবান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব ও ইন্দ্রজিৎকে অবলোকন করে রাবণের মনে কিঞ্চিৎ সাহস উদ্রেক হল। যে সব বীরগণ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে রণস্থলে নিপতিত, হলেন, তাঁদের তুলনায় এইসব বীর তৃণাদপি তুচ্ছ। ইন্দ্রজিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন রাবণ। হৃদপিন্ডসদৃশ প্রিয় ইন্দ্রজিৎ পিতার পার্শ্বে দন্ডায়মান। তাঁর হস্তে সুগন্ধি বারি।

রাবণ উপবিষ্ট হয়ে বললেন—বৎস ইন্দ্রজিৎ। আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করব। যদি আমার নিধন হয়, তুমি আর যুদ্ধ কর না। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে রাজত্ব করো।

ইন্দ্রজিৎ কোন উত্তরদান করার পূর্বেই উপস্থিত বীরগণ বললেন—আমরা জীবিত থাকতে আপনি বা ইন্দ্রজিৎ কেন যুদ্ধযাত্রা করবেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করছি।

—তোমরা যুদ্ধ করবে? মৃদুহাস্যে প্রশ্ন করলেন রাবণ, কতক্ষণ সংগ্রাম করবে?

—যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে।

আমি ক্লান্ত, তোমরা যা শ্রেয়ঃ মনে কর, তাই কর। রাবণের আদেশলাভ মাত্র ইন্দ্রজিৎ সহ সমস্ত বীরগণ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

যুদ্ধারম্ভের অনতিবিলম্বে নবান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব এবং অতিকায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

একক ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অশনির ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—পিতা, আপনি কাতর হবেন না। ইন্দ্রজিৎ অদ্যাপি জীবিত। সে কৃতান্তসম যুদ্ধ করে রাম-লক্ষ্মণকে নিধন করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রজিৎ কৃতান্তসম যুদ্ধ করে চলেছে সুগ্রীব সৈন্যগণের সঙ্গে। অদৃশ্য শরে ইন্দ্রজিৎ শত্রুবধ করছেন, তার ত্রিসীমানায় কেউ অগ্রসর হতে সমর্থ নয়।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বললেন—লক্ষ্মণ, আমাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। ইন্দ্রজিৎ আধুনিকতম যুদ্ধে পারদর্শী। এমন অনেক অস্ত্রের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ পরিচিত যে সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ আমারও অজ্ঞাত। আমরা যখন বনবাস জীবনযাপন করছিলাম, ইন্দ্রজিৎ তখন সেই সব অস্ত্রশিক্ষা করেছে, অতএব ইন্দ্রজিতের সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

রাম-লক্ষ্মণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রজিতের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা তূণ হতে শর পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। রামের ধনুক রামের করে আবদ্ধ হয়ে রইল। রাম অনুভব করলেন, ইন্দ্রজিতের এই নূতনতম শরচ্ছেদন করার বিদ্যা তাঁর আয়ত্তে নেই। প্রবল পরাক্রমে ইন্দ্রজিৎ শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাম-লক্ষ্মণ শরাঘাতে জর্জরিত এবং ক্রমশ লুপ্তচেতন হয়ে পড়লেন। সুগ্রীব-সৈন্য বিষাদে নিমগ্ন। ইন্দ্রজিৎ সগর্বে পিতার নিকটে গমন করে সহর্ষে বিজয়বার্তা বিবৃত করলেন। সুগ্রীব-সৈন্য বিহ্বল, শোকাগ্রস্ত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। মশাল হস্তে হনুমান ও বিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলেন। চতুর্দিকে অচেতন রক্তাক্ত সুগ্রীবসেনা। রাবণ-সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় রাবণের আদেশে। কারণ, লঙ্কার মানুষ সহজে অনুধাবন করতে পারবে না কত সৈন্যক্ষয় হয়েছে।

মৃত ও অর্ধমৃত সৈন্যদের মধ্যে অন্বেষণ করতে তাঁরা জাম্ববানের দর্শন পেলেন। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় জাম্ববান যুদ্ধভূমিতে পতিত। হনুমান ও বিভীষণ জাম্ববানের পার্শ্বে উপবেশন করে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে লাগলেন। জাম্ববান ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন—আমাকে শিবিরে নিয়ে চল। শ্রীরাম লক্ষ্মণের সংবাদ কী?

—তাঁরা মৃতকল্প। বিভীষণ ম্লানকণ্ঠে বললেন।

জাম্ববানকে উভয়ে বহন করে শিবিরে উপস্থিত হলেন। জাম্ববান সামান্য সুস্থ হয়ে বললেন—হনুমান, তুমি শীঘ্র একটি কাজ কর।

—আজ্ঞা করুন।

—সমুদ্রের পরপারে কৈলাস পর্বতশিখরে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী সাবর্ণ্যকরণী ও সন্ধানী নামক ওষধি বৃক্ষ আছে। সেই ওষধি বৃক্ষের ঘ্রাণ গ্রহণ করলেই হতচেতন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হবেন। অন্যান্য অচেতন সৈন্যগণও চেতনালাভ করবে।

সঠিক পথনির্দেশ গ্রহণ করে হনুমান সেই রাত্রেই সমুদ্র লঙ্ঘন করে ওষধিবৃক্ষ পর্বতের শীর্ষদেশ হতে আনয়ন করলেন। সেই ওষধিবৃক্ষের ঘ্রাণ গ্রহণে সকলে পুনরায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হলেন এবং সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পরদিন পুনরায় বিপুল যুদ্ধারম্ভ হল। কম্পন, প্রজঙ্ঘ, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ ও মকরাক্ষ নিহত হলেন পরবর্তী কয়েকদিনের যুদ্ধে। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এক বুদ্ধি করলেন। তিনি অবিকল সীতার মত এক রমণীকে একবেণী সীতা সাজিয়ে রথে তুললেন এবং যুদ্ধযাত্রা করলেন। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করতে গিয়ে দেখলেন রথোপরি সীতাদেবী। তিনি দুঃখে আর্ত, উপবাসে কৃশা। হনুমান ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হলেন। ইন্দ্রজিৎ সীতার কেশাকর্ষণ করে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। হনুমান অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। সীতামূর্তি হা রাম, হা রাম বলে আর্ত ক্রন্দন করতে লাগলেন। হনুমান অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন—ইন্দ্রজিৎ, তুমি যদি বীর হও, নারী নিপীড়ন ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

উচ্চ হাস্যে ইন্দ্রজিৎ উত্তর দিলেন—যে নারীর জন্য এই ভয়ংকর যুদ্ধ, সেই নারীকে আজ আমি সর্বসমক্ষে বধ করব।

ইন্দ্রজিৎ গর্বিত বাক্য সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মায়া সীতাকে দ্বিখণ্ডিত করে লংকার দিকে যাত্রা করলেন। হনুমান বিহ্বল হয়ে সক্রন্দনে সৈন্যসহ রামশিবিরে উপস্থিত হয়ে সীতাবধের সংবাদ দান করলেন।

সীতাবধের সংবাদে রাম-লক্ষ্মণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অঝোর ধারায় রাম ক্রন্দন করতে করতে বললেন—সীতার যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন এ যুদ্ধের প্রয়োজন কী? অদ্যই আমরা অযোধ্যায় ফিরে যাব।

রাম-লক্ষ্মণের বিলাপ-মধ্যে বিভীষণ উপস্থিত হলেন। বিষণ্ণ কণ্ঠে বিভীষণ প্রশ্ন করলেন—কি কারণে শ্রীরাম বিলাপ করছেন ?

হনুমান সংক্ষেপে সীতাবধের উল্লেখ করলেন। বিভীষণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদুহাস্যে মন্তব্য করলেন—আপনি ইন্দ্রজিতের মায়াজালে বিমোহিত হয়ে শোক করছেন, মায়াজাল সৃষ্টিতে অত্যন্ত পারদর্শী ইন্দ্রজিৎ কোন রমণীকে সীতারূপে সজ্জিত করে বধ করেছে। মহামতি শ্রীরাম, একটি বাক্য স্মরণ রাখবেন, রাবণ কোনদিন প্রাণ ধরে সীতাকে অন্যের হাতে তুলে দেবেন না। আপনারা মিথ্যা শোক পরিত্যাগ করুন এবং রাবণবধে সক্রিয় হোন।

বিভীষণের বাক্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অনেক স্বস্তি পেলেন। লক্ষ্মণ অশ্রুমোচন করে তীব্র কণ্ঠে বললেন—আমি অদ্যই ইন্দ্রজিৎকে বধ করব।

—তবে শীঘ্র আমার সঙ্গে চল। বিভীষণ ত্বরান্বিত করলেন।

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ ইন্দ্রজিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিভীষণ-নির্দেশে লক্ষ্মণ ও হনুমান নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হলেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞক্ষেত্র এক মহাবন। নীলমেঘতুল্য এক বটবৃক্ষকে লক্ষ্য করে বিভীষণ বললেন—এই বৃক্ষতলে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে। এ স্থানে যজ্ঞ সমাপ্তির পর ইন্দ্রজিৎ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুকেও পরাস্ত করে দেয়। ইন্দ্রজিৎ এখনো যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়নি, এস্থানে প্রবেশের পূর্বেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থানের প্রবেশ দ্বারে বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও হনুমানকে দেখতে পেলেন। মুহূর্তমধ্যে ইন্দ্রজিৎ বিলক্ষণভাবে বুঝতে পারলেন, বিভীষণ শত্রুপক্ষকে তার গোপন তত্ত্ব ব্যক্ত করে দিয়েছেন।

ইন্দ্রজিৎ নিকটে এসে বিভীষণকে উদ্দেশ করে কঠোর কণ্ঠে বললেন—তুমি আমার পিতার ভ্রাতা। পিতৃব্য। এই লঙ্কাভূমিতে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, প্রবীণ হয়েছ। তোমার দুর্বুদ্ধি হয়েছে, তাই তুমি স্বজন পরিত্যাগ করে রাজ্যলোভে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছ। যে স্বপক্ষ ত্যাগ করে অপরপক্ষে যায়, জয়লাভের পর অপর পক্ষ সেই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষীণবল করে দাসরূপে ব্যবহার করে। তারাই বিশ্বাসঘাতককে বিনষ্ট করে।

বিভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—রাজনীতির সমস্ত উদ্দেশ্য তোমাকে ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখি না। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীধর্ষক ব্যক্তি প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাজ্য। তোমার পিতার দোষের তালিকা বৃদ্ধি করে অনর্থক সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক নই। তুমি অতি গর্বিত, অল্পবয়স্ক এবং দুর্বিনীত। তোমার যা ইচ্ছা তুমি উচ্চারণ করতে পার। বর্তমানে তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রজিৎ রথে এবং লক্ষ্মণ হনুমান-পৃষ্ঠে আরোহণ করে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ইন্দ্রজিৎ এক সময়ে বিভীষণের আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ায় বিভীষণ উচ্চ

কণ্ঠে সজলনয়নে বললেন—ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য। আমি তার পিতৃতুল্য। আমি তাকে বধ করতে পারব না। আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল। আমি ইন্দ্রজিৎকে কখনই আঘাত করতে পারব না। তোমরা ক্ষমতাশালী, তোমাদের যা ন্যায্য মনে হয় তাই কর।

লক্ষ্মণ চতুঃশরে ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ চার অশ্ব বিদ্ধ করে ভল্ল দ্বারা সারথিকে হত্যা করলেন। সৈন্যগণ ইন্দ্রজিতের অশ্বগুলি বধ করল। ইন্দ্রজিৎ পুনরায় লঙ্কায় পৌঁছে নূতন অশ্ব ও সারথি নিয়ে প্রলয়ংকর যুদ্ধ করতে লাগলেন।

বিভীষণের প্রচণ্ড গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি নিহত হল। ইন্দ্রজিৎ রথ হতে অবতরণ করে বিভীষণের প্রতি শরাঘাত করলেন, লক্ষ্মণ মুহূর্তমধ্যে সে শর খণ্ডন করলেন।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে শরত্যাগ করলেন, লক্ষ্মণ সে শরও খণ্ডন করলেন, তারপর লক্ষ্মণ ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ করে ঐন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করলেন।

লক্ষ্মণের অব্যর্থ বাণে ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত মস্তক দেহচ্যুত হয়ে ভূতলে পতিত হল। ইন্দ্রজিতের পতনে লঙ্কাসেনা উদভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করল। কেউ সমুদ্রে পতিত হল, কেউ পর্বতে আশ্রয় নিল। ভগ্নহৃদয় কিছু সৈন্য রাবণকে এই নিদারুণ সংবাদ দানের জন্য লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করল।

ছাব্বিশ

ইন্দ্রজিতের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হবার পর রাবণ তার সিংহাসনের ওপরেই চেতনাহীন হয়ে পড়লেন। পাত্রমিত্রদের অধিকাংশই অনুপস্থিত। কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন? কে তাঁকে সাহস দেবেন? পৃথিবীর বক্ষে এক যুগান্তকারী অন্ধকার প্লাবিত হয়েছে। যে ইন্দ্রজিৎ পৃথিবীর কোন শক্তির নিকট পরাভূত ছিলেন না, সেই ইন্দ্রজিৎ আজ নিহত। রাবণের মন বিশ্বাস করতে চায় না, আবার অবিশ্বাস করতেও সাহস হয় না।

বহুক্ষণ পরে রাবণ চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে রাজমুকুট পরিধান করে অবশিষ্ট সভাসদ-গণকে বললেন—তোমরা যে যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাও, তারা প্রস্তুত হও। ইন্দ্রজিৎ বিহনে আমার জীবিত থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। আমি মরণপণ করে যুদ্ধ করব, তার পূর্বে আমি সীতাকে হত্যা করে যাব।

সুবিশাল সুতীক্ষ্ন খড়্গ হাতে রাবণ অশোকবনে যাত্রা করলেন। রাবণের

ভয়ঙ্কর চিৎকারে সীতাদেবী ভয়ে সন্ত্রস্তা। তিনি চিন্তা করলেন, হয় ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করে তাঁকে লুণ্ঠিত করার উদ্দেশে আগমন করছে, অথবা ইন্দ্রজিৎ হত, এই আক্রোশে রাবণ তাঁকে বধ করতে আসছে। সীতা ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলেন, হনুমানের পৃষ্ঠে চড়ে যদি তিনি লংকা হতে বিদায় নিতেন, তবে আজ এই অবস্থার উদ্ভব হত না।

রাবণ তাঁর নীলাভ খড়্গ উদ্যত করে পার্শ্বচরসহ অশোকবনে প্রবেশ করে সীতাকে বধ করার উদ্যোগ করলেন।

সুপার্শ্বনামক সৎ স্বভাবের বীর অমাত্য রাবণকে সম্বোধন করে ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মহারাজ, আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ সহোদর, জ্ঞানী মহাতপস্বী বীর, রাবণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আপনি নারীহত্যা করবেন? আপনি বা রাম দুজনেই জীবিত। এই অপরূপা লাবণ্যবতী নারীকে হত্যা না করে আপনি রামকে হত্যা করুন। রামের নিধন ঘটলেই আপনি মৈথিলীকে লাভ করতে পারবেন। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

রাবণ সুপার্শ্বের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত চিন্তা করে সপারিষদ অশোকবন পরিত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাবণ আপন প্রাসাদে প্রবেশ করে নিজ সভাকক্ষে সিংহাসনের ওপর ক্লান্ত অবসন্নভাবে নিজেকে সমর্পিত করলেন।

সুপার্শ্ব প্রশ্ন করলেন—মহারাজ, আপনি কী ক্লান্ত, অবসন্ন।

—না। আমি চিন্তা করছি এর পর কে সেনাপতিত্ব করবে?

—আমার মনে একজনের নাম উদয় হচ্ছে। যদি অনুমতি এবং সাহস দেন প্রকাশ করতে পারি।

জিজ্ঞাসু নেত্রে রাবণ সুপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

সুপার্শ্ব মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বিভীষণ-পুত্র তরণীসেন।

রাবণ ক্ষণিক চিন্তা করলেন, তারপর প্রতিহারীকে নির্দেশ দিলেন—তরণীসেনকে সংবাদ দাও।

যৌবনপ্রতীক সুপুরুষ তরণীসেন অল্পক্ষণ পরেই রাবণের কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর হতে এক সৌম্য জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি ধীর নম্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—মহারাজ, আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন?

—হ্যাঁ বৎস। রাবণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উত্তরদান করলেন—তোমার পিতা, আমার ভ্রাতা বিভীষণ বহু উপদেশ দান করেছিল। রামের সঙ্গে সন্ধির পরামর্শও দিয়েছিল, কিন্তু দম্ভবশত অথবা ভ্রমবশত আমি তার কথায় কর্ণপাত করিনি, তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে দূর করে দিয়েছি। সে অভিমানভরে শত্রুপক্ষে যোগদান করেছে।

রাবণ অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—আজ যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য। তুমি কি এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতে চাও? তোমাকে অবশ্য আমি অধিক অনুরোধ করব না। তুমি যদি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাত্রা কর, আমি আশীর্বাদ করব। তুমি যুদ্ধযাত্রায় অস্বীকার করলেও আমি তোমাকে স্নেহ করব।

তরণীসেন মৃদুহাস্যে শান্তসৌম্য কণ্ঠে বললেন—মহারাজ, বিভীষণ আমার জন্মদাতা পিতা। তিনি ধার্মিক অথবা অধার্মিক, বীর অথবা কাপুরুষ, সে বিষয় নিয়ে আমি তর্ক করব না। পিতা সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁর চরিত্রের সমালোচনা করবে ইতিহাস। সমালোচনা করবে মহাকাল। আমার কর্তব্য রাজাদেশ পালন করা। আমি রাজঅন্নে প্রতিপালিত। তাঁর বিপদের দিনে তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর না হলে আমার জীবনে ধিক। মহারাজ, আপনি ঘোষণা করুন, অদ্যকার যুদ্ধে আমি সেনাপতি। সৈনিকগণ প্রস্তুত হোক, আমি তৎক্ষণে জননীকে প্রণাম করে আসি।

তরণীসেন রাবণকে প্রণাম করে কক্ষ হতে বিদায় নিল। রাবণ বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টি তরণীসেনের গমন পথের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

আপন আবাসে প্রবেশ করে তরণীসেন সরমাকে প্রণাম করে বললেন, মা, আজ এক আশ্চর্য সুসংবাদ দেব!

সরমা পুত্রকে আশীর্বাদ করে প্রশ্ন করলেন—কি সংবাদ?

—অদ্যকার যুদ্ধে আমি সেনাপতি।

—তুমি সেনাপতি! তুমি যাবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ন্যায় অসাধারণ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে? না-না—

আতঙ্কিতা মাতাকে পুত্র আশ্বাসবাণী দান করলেন—মা! তুমি না বীরের জননী, ধর্মাত্মার গৃহিণী।

সরমা পুত্রকে বক্ষের পিঞ্জরে আবদ্ধ করে আকুল ক্রন্দনে বললেন—আমি রাজনীতি বুঝি না, আমি জননী। আমি রাজ্য চাই না, সিংহাসন চাই না, স্বর্ণলঙ্কা চাই না। তোকে নিয়ে পালিয়ে যাই। কোন এক গুপ্ত স্থানে আমরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় দিন যাপন করব।

তরণীসেন মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মা, ও কথা উচ্চারণ করতে নেই। আমরা রাজঅন্নে প্রতিপালিত। আমাদের শরীরে রাজরক্ত প্রবাহিত। রাজার পরম বিপদের দিনে তাঁকে পরিত্যাগ করে যাওয়া মহাপাপ। পিতা যেদিন লঙ্কা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন যদি আমরা পিতার সঙ্গে দেশত্যাগ করতাম, তাহলে কোন পাপ আমাদের স্পর্শ করত না, আজ পরিত্যাগ করলে পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের পরিচয় কলঙ্কিত হয়ে থাকবে।

সরমা কোন উত্তরদান করতে পারলেন না। অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তরণীসেন মৃদু সৌম্যশান্ত কণ্ঠে বললেন—আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করব, এই প্রত্যাশা নিয়ে যাচ্ছি না। তুমি বলেছ রাম স্বয়ং ভগবান, সীতাদেবী লক্ষ্মী-স্বরূপা। আমি লক্ষ্মী দর্শন করেছি, এইবার নারায়ণ দর্শন করব। এই যুদ্ধে আমাকে আর কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। হয় পিতা আমাকে হত্যা করবেন, অথবা পিতার আশ্রয়দাতা শ্রীরাম আমাকে হত্যা করবেন। পুত্রের মরণ এর থেকে আর বেশি মঙ্গলময় হতে পারে কি?

সরমার ক্রন্দনের বিরাম নাই। তরণীসেন শান্ত কণ্ঠে বললেন—আমার যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে দাও।

তরণীসেন ধীর কণ্ঠে বললেন—আমার সর্বাঙ্গে তুমি রামনাম লিখে দাও।

শ্বেতচন্দনে সরমা তরণীসেনের সর্বাঙ্গে রাম-নাম অংকন করে দিলেন। তরণীসেন বিদায় কালে জননীকে প্রণাম করতে তিনি শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

রাবণ শিবিরে জয়ধ্বনি। জয় তরণীসেনের জয়, জয় তরণীসেনের জয়।

সেই জয়ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র বিভীষণের হৃদপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ইন্দ্রিয়গুলি অবশ থেকে অবশতর, নির্জীব থেকে নির্জীবতর হয়ে পড়তে লাগল।

দূর হতে শ্রীরাম লক্ষ্য করলেন তরণীসেনকে। তিনি অন্যান্য যে বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তার তুলনায় এই যুবকের গতিবিধি পৃথক। শান্ত সৌম্য চেহারা, সর্বাঙ্গে রাম-নাম অংকিত। মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত।

বিভীষণের স্নায়ুতন্ত্রে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের আঘাত। একদিকে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা অন্যদিকে তাঁরই আত্মজের পরিচয়। আপন আবেগকে করায়ত্ত করে ম্লান কণ্ঠে বিভীষণ উত্তরদান করলেন—বালক সম্পর্কে রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র। অত্যন্ত রূপবান, ধার্মিক এবং রামভক্ত। বীরত্ব ও সাহসে অসাধারণ।

লংকার সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে সুগ্রীবের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। তরণীসেন বহুদূর হতে পিতা, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে লক্ষ্য করেছিলেন। রথ সেইদিকে চালিত করলেন। এমন সময় নীল পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তরণীসেন করজোড়ে মিনতি করে বললেন—আমাকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পদতলে অগ্রসর হতে অনুমতি করুন।

নীল ব্যঙ্গের হাসি হেসে উত্তর দিলেন—সর্বাঙ্গে রাম নাম লিখে ভণ্ডামি করে শ্রীরামসকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বধ করতে চাস? তাঁর পূর্বে আমি তোকে বধ করব।

'নীল' প্রস্তর এবং বৃক্ষ প্রহারে উদ্যত হলেন। তরণীসেন মুহূর্তের মধ্যে

শরনিক্ষেপ করে নীলের আঘাত ব্যর্থ করে নীলের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন। নীলের দেহ অচেতন হয়ে পড়ল এবং মুখ হতে রক্ত নির্গত হতে লাগল।

নীল পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান রথোপরি আরোহণ করে তরণীসেনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। তরণীসেন আধুনিক বিদ্যায় হনুমানকে আঘাত করলেন। হনুমান রথ হতে পতিত হয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলে তরণীসেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রতি অগ্রসর হলেন।

অংগদ পর্বতপ্রমাণ এক প্রস্তর তরণীসেনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তরণীসেন সনিপুণভাবে বাণ প্রয়োগে সেই সুবৃহৎ প্রস্তরকে খন্ড খন্ড করে পথ পরিষ্কার করে ঈপ্সিত পথের দিকে রথাশ্বের গতি বৃদ্ধি করলেন। অঙ্গদ এক উচ্চ লম্ফে তরণী-সেনের রথের ওপর আরোহণ করলেন, সেই মুহূর্তে তরণীসেন লৌহমুদ্গরে অঙ্গদকে আঘাত করলেন। অংগদ সে আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। ভূমিতলে বাহ্যজ্ঞানহীনভাবে লুটিয়ে পড়লেন।

তরণীসেনের রথ যতই শ্রীরামের রথের নিকটস্থ হয়, লংকাসেনারা ততই প্রবল বিক্রমে সুগ্রীব-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। তরণীসেন একক যেন মৃত্যুর রূপ নিয়ে সুগ্রীব-সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত। সুষেণ, সুগ্রীব শিশুর ন্যায় সামান্য আঘাতে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলেন।

তরণীসেনের রথ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের নিকটে উপস্থিত। তরণীসেন একটি শর নিক্ষেপ করলেন, শরটি বিভীষণের পদতলে ভূমিতে বিদ্ধ হল। বিভীষণ অনুভব করলেন, তরণীসেন ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম জানালেন।

তরণীসেন রথ হতে অবতরণ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে প্রণাম করলেন। শ্রীরাম আশীর্বাদ করে বললেন—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। আমি বিভীষণের নিকট জ্ঞাত হয়েছি তুমি আমার একজন অকৃত্রিম ভক্ত।

লক্ষ্মণ বললেন—এ আপনি কি আশীর্বাদ করলেন? লংকার সেনাপতির ইচ্ছা শ্রীরামের পরাজয়।

যদি তাও হয়, তবু আমি আশীর্বাদ করব। শ্রীরাম নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

তরণীসেন ধনুকে টংকার দিয়ে বললেন—আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করুন।

লক্ষ্মণ মুহূর্তমধ্যে শরক্ষেপণ করলেন, তরণীসেন চক্ষের নিমেষে সে বাণ খন্ড খন্ড করে দিলেন। লক্ষ্মণ 'পাশুপাত' বাণ ক্ষেপণ করলেন। তরণীসেন 'বৈষ্ণব' বাণে সে বাণ খন্ডন করলেন। লক্ষ্মণের বাণে তরণীর সমস্ত সৈন্য যখন মৃত্যুমুখে পতিত হল, তরণীসেন এক জাঠার প্রচন্ড আঘাত করলেন লক্ষ্মণের মস্তকে। লক্ষ্মণ অকস্মাৎ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। সেই স্থানেই অচেতন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন। লক্ষ্মণের জ্ঞানহীন দেহ হনুমান উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করলেন।

তরণীসেন শ্রীরামের পদতলে প্রণাম করে বললেন—আমার জননী বলেছেন আপনি স্বয়ং নারায়ণ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

শ্রীরাম বিভীষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—এ আমার পরম ভক্ত। এর অঙ্গে কী করে অস্ত্রপ্রয়োগ করি?

তরণীসেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি আপনাকে প্রণাম করে আমার আত্মার কর্তব্য পালন করেছি, কিন্তু রাজকর্তব্য এখনও সমাপ্ত হয়নি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার কর্তব্য সমাপ্ত করব।

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তরণীসেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করতে করতে চিন্তা করতে লাগলেন এই অল্প বয়সে এই বীর এ রকম অসাধারণ যোদ্ধা হয়ে উঠল কী করে! এই প্রকার শান্ত সৌম্য নম্র বীর যদি তাঁর পক্ষে থাকতেন, তাহলে ভারত ভূখণ্ডের সামরিক ক্ষমতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেত।

শ্রীরামচন্দ্র যে শরই যোজনা করেন, তরণীসেন 'জয় রাম' উচ্চারণে সেই শরই ব্যর্থ করে দেন। দু'জনের অসাধারণ শরযুদ্ধে সকলেই ভীত হয়ে উঠল। লঙ্কার সৈন্য এবং সুগ্রীব সৈন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ভুলে গিয়ে সেই স্বর্গীয় যুদ্ধ অবলোকন করতে লাগল।

—ও অসাধারণ যোদ্ধা। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতিরেকে ওকে নিধন করা অসম্ভব। বিভীষণ অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। বিভীষণের দুই চক্ষু সজল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। ধীরস্থির ভাবে বিভীষণ বাক্যগুলি উচ্চারণ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর তূণ হতে ব্রহ্মাস্ত্র বার করে ধনুকে যোজনা করলেন, তারপর আকর্ণ জ্যা কর্ষণ করে ব্রহ্মাস্ত্র শর নিক্ষেপ করলেন।

বিদ্যুৎগতিতে শ্রীরামচন্দ্রের শর চালিত হয়ে তরণীসেনের স্কন্ধে বিদ্ধ হয়ে দেহ হতে শির বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। তরণীসেন এত দ্রুতলয়ে রাম-নাম জপ করছিলেন যে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড থেকেও কয়েকবার রাম-নাম উচ্চারিত হল।

তরণীসেন ভূমিতলে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ উচ্চ কণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন। বিস্মিত রাম প্রশ্ন করলেন—শত্রুপক্ষের পরাজয়ে তোমার এত শোক কেন বিভীষণ?

—তরণীসেন—যাঁকে আপনি এই মুহূর্তে বধ করলেন, সে আমার আত্মজ, আমার সন্তান।

শ্রীরাম স্তব্ধ, বিহ্বল, বিস্মিত।

বিভীষণের ক্রন্দনরত মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—তুমি তোমার সন্তানকে বধ করলে! তুমিই তো আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। এ তুমি কি করলে বিভীষণ! তুমি পূর্বে পুত্র পরিচয় দিলে না কেন?

আমি যুদ্ধ বর্জন করতাম, সন্ধি করতাম। সীতা অশোকবনেই থাকত, আমরা প্রত্যাবর্তন করতাম।

বিভীষণ ক্রন্দনমুখর কণ্ঠে বললেন—আমি কর্তব্য সম্পাদন করেছি। যে পক্ষে ধর্ম আছেন আমি সেই পক্ষ অবলম্বন করেছি। আমি কল্পনাও করিনি তরণীসেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

শ্রীরাম করুণ কণ্ঠে বললেন—বিভীষণ, যুদ্ধ, রাজনীতিতে ব্যক্তিগত শোকের অবকাশ নেই। তুমি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় কর্তব্য করেছ, এখন শোক পরিত্যাগ কর। ওঠ, এখনও রাবণ সংহার সমাধা হয়নি। যে দুরাত্মার অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতি হয়েছে, সে পাপাত্মাকে যতক্ষণ নিধন না করি, ততক্ষণ কোন শোকই শোক বলে পরিগণিত হবে না, কোনও ক্ষতিই ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে না, ওঠ—

শ্রীরামের বাক্যে বিভীষণ উঠলেন। সেদিন একমাত্র দিন, যেদিন রাবণের সেনাপতি পতনের সংবাদে একই সঙ্গে রাবণ এবং রামের শিবিরে শোকের হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

অত্যল্প কালের মধ্যে বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্ব নিহত হবার পর রাবণ সারথিকে আদেশ দিলেন—আমার যুদ্ধরথ রণক্ষেত্র অভিমুখে নিয়ে চল। রাম আজ আমার বলবীর্য পরীক্ষা করুক।

রাবণ সম্মুখে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম প্রচণ্ড জ্যা নির্ঘোষ করলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রাবণের প্রত্যেকটি শর লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে রামের প্রতি ধাবিত হল। রামও ক্ষিপ্রগতিতে সেই বাণগুলি প্রতিহত করতে লাগলেন। রাবণ 'মহাদ্যুতিময়' অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই দ্যুতিময় রৌদ্রাস্ত্র হতে শূল গদা মুদ্গর নির্গত হয়ে সৈন্যদলকে ধ্বংস করতে লাগল। রাম 'গন্ধর্বাস্ত্রে' এই সকল অস্ত্র নিবারণ করলেন। রাবণ পুনরায় 'সৌরাস্ত্র' প্রয়োগ করলেন, তার ভিতর হতে বহু চক্র সৃষ্টি হয়ে রামের প্রতি ধাবিত হল। রাম বিপরীত অস্ত্রে সমস্ত চক্রগুলিকে খন্ডন করলেন।

লক্ষ্মণ শরাঘাতে রাবণের রথধ্বজা ধ্বংস করলেন, সারথির মস্তক ছেদন করলেন। বিভীষণ গদাঘাতে রাবণের রথাশ্ব বধ করলেন। রাবণ ভ্রাতার উদ্দেশে অশনিতুল্য শরক্ষেপণ করলেন, সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ রাবণ-শর প্রতিহত আঘাতে নিবীর্য করে বিভীষণকে রক্ষা করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে 'শক্তিশেল' বাণ ধনুকে যুক্ত করে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি বিভীষণকে রক্ষা করেছ, তোমাকে কে রক্ষা করে প্রত্যক্ষ করি।

রাবণ শক্তিশেল শর ক্ষেপণ করলেন। রাম মুহূর্তমধ্যে অনুভব করলেন, রাবণের শক্তিশেল শর অব্যর্থ। এই মৃত্যুবাণ এই মুহূর্তে খন্ডন করতে না পারলে লক্ষ্মণের

মৃত্যু অবধারিত। নাগরাজের জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমান অষ্ট ঘন্টাযুক্ত শক্তিশেল লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হল বিদ্যুৎবেগে। শ্রীরাম প্রতিখন্ডন শর নিক্ষেপ করে অসহায়ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন। রামের শর রাবণের শরকে প্রতিহত করল, কিন্তু স্থগিত করতে পারল না। স্তিমিত বেগে শক্তিশেল শর লক্ষ্মণের বক্ষে বিদ্ধ হল। লক্ষ্মণ অচেতন অবস্থায় সেই স্থানেই ভূলুণ্ঠিত হলেন। রামের স্বস্তি, লক্ষ্মণের প্রাণবায়ু নির্গত হয়নি, শক্তিশেলের প্রবল প্রকোপ লাঘব হয়েছে, কিন্তু আঘাত-জনিত ক্ষমতা নিঃশেষিত হয় নি।

শ্রীরাম লক্ষ্মণের নিকট দ্রুত গমন করলেন। রাবণ শরে শরে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে দিলেন, রাম কোনমতেই লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হতে পারলেন না। শ্রীরাম বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় রাবণের শর প্রতিহত করে কোনক্রমে লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণ চেতনাহীন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত, বক্ষে শক্তিশেল বিদ্ধ! রাম দুই হস্তে সবলে লক্ষ্মণের বক্ষ হতে শর বহিষ্কার করে বিভীষণ ও সুগ্রীবকে আদেশ দিলেন—তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে এস্থানেই থাক। আমি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করছি। তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে অতি সত্বর এই পৃথিবী অ-রাম বা অ-রাবণ হবে।

সুষেণ আশ্বাস দিয়ে বললেন—আপনি যুদ্ধ করুন আমি লক্ষ্মণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীরাম যুদ্ধে যাত্রা করলেন। সুষেণ হনুমানকে নির্দেশ দিলেন—জাম্ববান পূর্বে যে ওষধি পর্বতের কথা বলেছিলেন, তার দক্ষিণ শিখর থেকে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী ও সন্ধানী মহৌষধি শীঘ্র নিয়ে এস।

হনুমান সেই মুহূর্তে ওষধি পর্বতে গেলেন, কিন্তু নির্ধারিত ওষধি চয়ন করতে অপরাগ হতে পর্বতশৃঙ্গের শীর্ষদেশ উৎপাটিত করে প্রত্যাবর্তন করলেন। সুষেণ ওষধি পেষণ করে লক্ষ্মণের নাসিকাগ্রে ধারণ করলেন। ওষধির ঘ্রাণ গ্রহণ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মণ পুনরায় জ্ঞানলাভ করে সুস্থ হলেন।

শ্রীরাম নীরোগ লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে, আবেগময় কণ্ঠে বললেন—ভাই লক্ষ্মণ, ভাগ্যক্রমে তোমাকে পুনর্জীবিত দেখছি। তুমি মৃত হলে সীতা উদ্ধার বা আমার জীবনলাভে কি প্রয়োজন হত?

শ্রীরামের বাক্যে লজ্জিত লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন—এ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি শত্রু সংহারের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আপনি দুরাত্মা রাবণকে বধ করুন।

শ্রীরাম রণস্থলে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলেন রাবণ অন্য এক রথে আরোহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র একের পর এক তীক্ষ্ন শর রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাবণ ধনুকে শরযোজনা করার সময় পর্যন্ত পেলেন না।

রাবণ শ্রীরামের অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত, ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত। রাবণ কোন অবস্থাতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না দেখে সারথি রথ নিয়ে দ্রুত পলায়ন করলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাবণ সুস্থ হয়ে সারথিকে পারিতোষিক দান করে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। রাম-রাবণের লোমহর্ষক যুদ্ধে মেদিনী কম্পিত, বায়ু ঝটিকাবেগে প্রবাহিত, সমুদ্রের তরঙ্গরাশি উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত।

অকস্মাৎ রামের তীক্ষ্ন শরাঘাতে রাবণের কুণ্ডলভূষিত মস্তক ঘূর্ণায়মান হয়ে গেল, কিন্তু মস্তক ছিন্ন হল না। খর-দূষণ-বালী প্রভৃতি বীরগণ যে সমস্ত অস্ত্রে নিহত হয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটি শরই রাবণকে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করে তুলতে সক্ষম হলেন না। রাম একাগ্রমনে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সময় অকস্মাৎ মনে হল, 'ব্রহ্মাস্ত্র' ক্ষেপণে হয়ত রাবণকে পরাস্ত করা যাবে।

শ্রীরাম তূণ হতে 'ব্রহ্মাস্ত্র' গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খে পবন, ফলকে অগ্নি ও ভাস্কর, শরীরে আকাশ এবং ভারে মেরুমন্দর অধিষ্ঠান করেন। ব্রহ্মাস্ত্র অবলোকন করে, রাম-সৈন্য আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন এবং রাবণ-সৈন্য বিবশ বিবর্ণ হয়ে পড়ল।

বেদোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে রাম তাঁর কার্মুকে ব্রহ্মবাণ সন্ধান করলেন। সর্বভূতসহ বসুন্ধরা সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হলেন। রামের ধনুক হতে মুক্ত হয়ে সেই কৃতান্ত সদৃশ অনিবার্য বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ করে, প্রাণ হরণ করে, পুনরায় তূণে প্রত্যাবর্তন করল।

রাবণের প্রাণহীন দেহ রথের ওপর হতে ভূমিতলে পতিত হল।

সমস্ত লঙ্কাব্যাপী ক্রন্দন আর হাহাকার। রাজঅন্তপুর হতে নারিগণ, দাসিগণ, রানিগণ নির্গত হয়ে উচ্চরোলে ক্রন্দনমুখর হয়ে, রক্তাক্ত রণক্ষেত্র অভিমুখে শোকগ্রস্তভাবে উন্মাদিনীর ন্যায় গমন করলেন। কেউ বা আলুথালু, কারও পদদ্বয় কণ্টকে, অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। অনেকে পিচ্ছিল রক্তভূমিতে বারংবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন।

রাবণের সন্নিকটে গমন করে, আর্তনারীসমষ্টি শোকে বিহ্বল হয়ে রাবণকে উদ্দেশ করে বারংবার আহ্বান করতে লাগলেন। কেউ বা চরণযুগল আপন ক্রোড়ে স্থাপন করে শোকসাগরে নিমগ্না হলেন।

রাবণ-প্রিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী মহারাণী মন্দোদরী অগ্নিসমা হুতাশনে আপন মর্মকে দহন করে, করুণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—মহারাজ, তুমি ক্রুদ্ধ হলে পৃথিবীর কারও সাধ্য ছিল না তোমার সম্মুখে তিষ্ঠতে পারে। মনুষ্য তো তৃণাদপি তুচ্ছ। তুমি একদিন ইন্দ্রিয় জয় করে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়েছিলে, এখন তোমার ইন্দ্রিয়গুলিই সর্পের লেলিহান শিখার মত তোমার সত্তাকে গ্রাস করল। অকস্মাৎ এক অশুভ মুহূর্তে

তুমি সীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাকে হরণ করলে। পাপ সেই মুহূর্তে তোমার অন্তরে প্রবেশ করল। সতীসাধ্বী পতিব্রতা সীতার অভিশাপেই তোমার পতন ঘটল। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, আমার পিতা ময়দানব, মারীচ এবং আমার বাক্যে তুমি কর্ণপাত কর নি, তাই তোমার এই দীন দশা। তখন তোমার মনে হয়েছিল আমি নারীজনিত ঈর্ষাবশে তোমাকে সীতা-পীড়নে নিরস্ত করছি। কিন্তু হায়, তোমার ন্যায় জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বীর জীবিত থাকলে লংকার কত উপকার হত, লঙ্কাবাসী তোমার অবর্তমানে তা উপলব্ধি করবে।

মন্দোদরী ক্ষণিক নীরব হয়ে পুনরায় বললেন—ধিক আমার জীবনকে। তুমি যখন নারীচৌর্যে প্রবৃত্ত হলে, তখন আমি তোমাকে বাধা দিলাম না কেন? তুমি তো কোনদিন আমাকে অস্বীকার করে কোন কার্য করনি। তুমি আমাকে আলিঙ্গন না করে অন্য কাউকে স্পর্শ করনি, আজ কেন অপ্রিয়ার ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করে রণভূমিকে আলিঙ্গন করে শায়িত আছ। আমার জীবনকে ধিক! তোমার বিরহে এখনও কেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না?

মন্দোদরী সীমাহীন শোকে, উচ্চরোল ক্রন্দনে সেই রক্তাক্ত রণভূমির মধ্যে স্বামীর মৃতদেহের উপর আলুথালুভাবে লুটিয়ে পড়লেন।

ভ্রাতাকে নিহত দেখে বিভীষণ আকাশস্পর্শী বিলাপ করে বললেন—হে প্রবলপ্রতাপান্বিত খ্যাতনামা নীতিজ্ঞ মহাবীর, মহার্ঘ শয্যা পরিত্যাগ করে ভূমিতে শয়ন গ্রহণ করেছ কেন? আমার হিতবাক্য তুমি গ্রাহ্য কর নি। আমি যা আশংকা করেছিলাম, বাস্তবে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। তুমি ভূপাতিত, চন্দ্র তমসাবৃত অগ্নি নির্বাপিত, লঙ্কার সমস্ত মানবকুল কর্মহীন, শৃঙ্খলাহীন, অভিভাবকহীন। তোমার মৃত্যুতে লঙ্কা আজ বীরশূন্য হল।

বিভীষণকে প্রবোধ দান করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—বিভীষণ, মহাবীর রাবণ কোন নিকৃষ্ট কর্ম করে মৃত্যুবরণ করেন নি। ইনি বীরশ্রেষ্ঠ মহোৎসাহী যোদ্ধা। ক্ষাত্রধর্ম পালনের নিমিত্ত যুদ্ধ করবার কালেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মৃত্যু মর্যাদাপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাযুক্ত। এর জন্য সাধারণ মানুষের ন্যায় শোক না করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

বিভীষণ সরোদনে উত্তর দিলেন—রাবণের সঙ্গে আমার চির বৈরীভাব। তিনি গুরুজন হলেও আমার পূজনীয় ছিলেন না। আমি এঁর সৎকার করতে পারি না।

শ্রীরাম সান্ত্বনা বাক্যে বিভীষণকে উত্তর দিলেন—রাবণ অধর্মচারী, কিন্তু মহাতেজস্বী বীরশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁর মরণে আমাদের বৈরতার অবসান ঘটেছে। মৃত্যুর পর সকল শত্রুতার অবসান হয়। রাজনৈতিক এবং নৈতিক কারণে যেটা প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের সিদ্ধ হয়েছে। তুমি স্বচ্ছন্দে এর সৎকার

কর। ইনি যেমন তোমার স্বজন, আমারও সেইরূপ স্বজন। তুমি লঙ্কার রাজত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাবণের শেষকৃত্য সম্পন্ন কর।

বিভীষণ রামের যুক্তিতে সম্মত হয়ে শকট, অগ্নি, যাজক, কাষ্ঠ, অগুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য ও বিভিন্ন মহার্ঘ রত্নরাজি শ্মশানে প্রেরণ করে মাল্যবানের সাহায্যে কার্যারম্ভ করলেন। রাবণের রক্তাক্ত দেহ ধৌত করে, ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়ে স্বর্ণময় শিবিকায় স্থাপন করে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। মরদেহের পশ্চাতে বিভীষণ ও পুরুষগণ, তার পশ্চাতে নারিগণ রোরুদ্যমান অবস্থায় শ্মাশানযাত্রা করলেন। দাহস্থানে উপস্থিত হয়ে বিভীষণ প্রথমে পিতৃমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার পর রাবণের মুখাগ্নি সম্পন্ন করে শ্মশানে কার্য সমাধা করলেন।

সাতাশ

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ স্বর্ণঘটে সমুদ্রজল আনয়ন করে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক উৎসব সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্‌যাপিত করলেন। পৌরজন বিভীষণকে নানারূপ উপঢৌকন উপহার দিলেন, বিভীষণ সমস্তই শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিবেদন করে বললেন—তোমার কল্যাণে আমি রাজসিংহাসন পেয়েছি। এ সমস্ত উপহারই তোমাদের।

শ্রীরাম উপহার গ্রহণ করে হনুমানকে বললেন—সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ করে অশোকবনে যাও এবং সীতাকে সর্বসংবাদ দান করে তাঁর প্রত্যুত্তর নিয়ে এস।

বিভীষণ সেই মুহূর্তে অনুমতি দান করলেন। হনুমান অশোকবনে উপস্থিত হয়ে রামের বার্তা দান করলেন এবং বললেন রাবণ নিহত।

আনন্দ বিস্ময়ে সীতাদেবীর বাক্য স্ফুরিত হল না। দুই চক্ষে কেবল আনন্দাশ্রু। হনুমান বিমূঢ় চিত্তে প্রশ্ন করলেন—দেবি! আপনাকে এত চিন্তিত দেখছি কেন?

—না, না, চিন্তা নয়। মহাবীর, তুমি যে সুসংবাদ এনেছ, তার বিনিময়ে আমি এমন কোন মহার্ঘ পুরস্কারের কথা চিন্তা করতে পারছি না, যা তোমাকে উপহারস্বরূপ দান করব।

হনুমান বিগলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—এমন সুললিত বাক্য আপনার পক্ষেই সম্ভব। দেবি, আপনি আজ্ঞা করুন, এইসব প্রতিহারিণীদের আমি হত্যা করি।

—না। মধুর বাক্যে সীতাদেবী বললেন—এরা রাজার আশ্রিত এবং বশীভূত দাসীমাত্র। এদের কোন দোষ নেই। রাবণের আদেশে ওরা যা করেছে, রাবণের মৃত্যুর পর আর সে আদেশ পালন করবে না। আমি ওদের ক্ষমা করছি।

হনুমান করজোড়ে নিবেদন করলেন—দেবি, আপনি সত্যই রামের উপযুক্ত গুণান্বিত ধর্মপত্নী। এখন অনুমতি দান করুন, আমি প্রত্যাবর্তন করি।

সীতার অনুমতি গ্রহণ করে হনুমান পুনরায় শ্রীরাম-সমীপে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হনুমান শ্রীরাম-সমীপে প্রত্যাগমন করে সীতার কুশল বার্তা দান করে বললেন—মহাদেবী সীতা আপনাকে দর্শন করতে চেয়েছেন।

শ্রীরাম ক্ষণিক চিন্তা করলেন, চক্ষুদ্বয় সদয় সজল। পরক্ষণেই আপন দুর্বলতা গোপন করে বিভীষণের দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর অথচ বীরভাবে বললেন—বিভীষণ, তুমি, তুমি সীতাকে স্নান করিয়ে অঙ্গরাগে সজ্জিত করে দিব্য আভরণে ভূষিত করে আমার নিকট উপস্থিত কর।

বিভীষণ সেই মুহূর্তে সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে রামের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করলেন।

সীতা উত্তর দিলেন—রাজাধিরাজ, আমি স্নান না করেই স্বামী দর্শনে যাত্রা করতে চাই।

বিভীষণ সবিনয়ে নিবেদন করলেন—শ্রীরাম যেরূপ ইচ্ছা করেছেন, সেইরূপ সজ্জিত হয়েই তোমার যাওয়া উচিত।

অতঃপর সীতা স্নান সমাপনান্তে মহার্ঘ বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিবিকায় আরোহণ করে রাম সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। বিভীষণ শিবিকার পশ্চাতে পদব্রজে অনুসরণ করলেন।

সীতা উপস্থিত শুনে সাধারণ মানুষ, সৈন্যসামন্ত সকলে ভিড় করে সীতা দর্শনের জন্য ছুটে এল। বিভীষণের আদেশে রক্ষিগণ সকলকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কাউকে বেত্রাঘাত করছে, কাউকে ধমক দিচ্ছে, কাউকে সজোরে আকর্ষণ করে দূরে সরিয়ে পথ করে দিচ্ছে। শ্রীরাম বিভীষণকে নির্দেশ দিলেন—এ কি করছ! গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা লোকাপসারণ, এ সকল রাজকীয় আড়ম্বর নারীদের আবরণ নয়, চরিত্রই নারীর একমাত্র আবরণ। বিপদ, পীড়া, স্বয়ংবর, যজ্ঞ এবং বিবাহকালে নারীদর্শন দূষণীয় নয়। সীতা বিপদগ্রস্তা এবং কষ্টে পতিতা। তাঁকে দর্শন করা দূষণীয় হবে না, বিশেষ করে আমার নিকটে। ওঁকে

শিবিকা পরিত্যাগ করে পদব্রজে আমার নিকট আসতে বল। সাধারণ মানুষ তাঁকে দর্শন করুন।

চিন্তান্বিত বিভীষণ সীতাকে সবিনয়ে শ্রীরামের নির্দেশ জ্ঞাত করলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীব রামের বাক্যে ব্যথিত হলেন, কিন্তু কোন বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। সীতা ধীর পদক্ষেপে শিবিকা হতে অবতরণ করে সলাজ পায়ে শ্রীরামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

শ্রীরাম গম্ভীর কণ্ঠে সীতাকে অভ্যর্থনা করে বললেন—আমি যুদ্ধে, জয় করে তোমাকে উদ্ধার করেছি। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান এবং অন্যান্য বীরেরাও তাঁদের স্বধর্ম পালন করে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

শ্রীরাম ক্ষণিক নীরব থেকে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমরা যে কাজ করেছি, তা তোমার জন্য করি নি, আমাদের মান-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য করেছি, কিন্তু তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। তোমার ন্যায় অপরূপা লাবণ্যময়ী রমণী দর্শনে রাবণ অধিককাল স্থির থাকতে পারে নি। তোমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছে, এই অবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করি কি উপায়ে?

সর্বসমক্ষে সীতাদেবী শ্রীরামের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করে যুগপৎ লজ্জায় ও ঘৃণায় প্রস্তরবৎ হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই সেই ভাব বিতাড়িত করে অশ্রুজল মোচন করে, লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—নীচ ব্যক্তি যেরূপে নীচ স্ত্রীলোককে অকথা কুকথা বলে, সেইরূপ বাক্য তুমি উচ্চারণ করছ কেন? এই যদি তোমার মনের ইচ্ছা ছিল, তাহলে হনুমানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে কেন? হনুমানের নিকট আমাকে বর্জন করার কথা কেন জানাও নি? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতে পারতাম, তোমাকে অযথা কষ্ট করতে হত না। রাবণ যখন আমাকে অপহরণ করেছিল, তখন আমি অসহায়া ছিলাম। অসহায়া অবস্থায় রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছিল। হনুমান আমাকে পৃষ্ঠে করে উদ্ধার করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরপুরুষ স্পর্শদোষে দুষ্ট হতে হবে বলে আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।

সীতা ক্ষণিক নীরব থেকে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—আমার জন্মকথা, পিতৃপরিচয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিলে। সংসার জীবনে আমাকে প্রতিদিন লক্ষ্য করেছ। কোনদিন কি আমার কোন ত্রুটি পেয়েছ? তুমি রাজনীতিজ্ঞ, চরিতজ্ঞ, কিন্তু আমায় সম্মান করলে না। অল্প বয়সে তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে, আমার স্বামী ভক্তি সংসার-বিশ্বাস সমস্তই বিসর্জন দিয়ে তুমি আজ আমাকে ত্যাগ করছ!

সীতা শ্রীরামের দিক হতে দৃষ্টি অপসারিত করে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—বেশ। সর্বসমক্ষে স্বামী যখন আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তখন

এ জীবনধারণ করতে ইচ্ছুক নই। লক্ষ্মণ, তুমি চিতা প্রস্তুত কর। আমি অগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিয়ে আমার চরিত্রের নির্মলতা প্রমাণ করব।

লক্ষ্মণ সরোষে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শ্রীরাম অধোবদনে দণ্ডায়মান। তাঁর হৃদয়ে 'দুটি সত্তা' একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সমস্ত ভারতে এক অখণ্ড রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার এক অসহায়া নারীর স্বামী রামচন্দ্র। স্বামীত্ব বড় না রাজনীতি বড়? রাজনীতির সঙ্গে সংসার জীবনের সমন্বয় ঘটলে রাজার জীবনে শান্তি আসে, না ঝড় আসে? সীতার দৃপ্ত বাক্যে প্রতীয়মান হয় সে সরলা, সচ্চরিত্রা। রাজার জীবনে তো কেবল পত্নীর অধিষ্ঠান নয়, তার সঙ্গে আছে শত শত সাধারণ মানুষ। তাদের সুখদুঃখ, তাদের মনোরঞ্জনও রাজার একান্ত কর্তব্য।

চিতা প্রস্তুত।

চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল।

সীতা এক দৃষ্টিতে লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। প্রজ্বলিত শিখার প্রতি সীতা অবিচল ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। স্বামী রামের হৃদয়ে উদ্বেলিত হাহাকার। যে নারী এত অবিচলভাবে, অকম্পিত পদক্ষেপে অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সে কখনই কলঙ্কিত হতে পারে না।

—স্তব্ধ হও। শ্রীরামের আদেশ।

সীতা স্তব্ধ। সীতার আননমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত। চিতার অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়ে সীতার মুখমণ্ডলে এক অপরূপ শোভা নির্গত হচ্ছে।

শ্রীরাম ধীর পায়ে সীতার পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ন্যায় সতীসাধ্বী নারী ভূতলে বিরল। তোমাকে কোনদিন কোন পাপ স্পর্শ করতে সাহস পাবে না। তুমি এস।

শ্রীরাম সীতাকে গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল।

সীতাসহ শ্রীরাম বিভীষণের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন—বন্ধুবর, তুমি নির্বিঘ্নে লঙ্কায় রাজত্ব কর। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় আমাকে সংবাদ দিতে দ্বিধা করু না। এখন আমরা অযোধ্যায় যাত্রা করব।

বিভীষণ বললেন—ব্যস্ত কেন? আপনার সন্ন্যাসবেশ পরিবর্তন করে রাজবেশ ধারণ করুন।

আপনাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি, তারপর শুভদিন দেখে যাত্রা করবেন।

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিলেন—না বিভীষণ, আমি সন্ন্যাসবেশ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমার কনিষ্ঠ ভরত সন্ন্যাসবেশে রাজকার্য পরিচালনা করছে। পূর্বে তাকে রাজবেশ পরাব, তারপর আমি পরিধান করব। আমাদের অযোধ্যা যাত্রার

আয়োজন কর। সে পথ অতি দুর্গম ও সুদীর্ঘ। আমাদের অযোধ্যা পেঁছিতে বিলক্ষণ বিলম্ব হবে।

বিভীষণ সহাস্যে বললেন—আপনি একদিনেই অযোধ্যা পেঁছে যাবেন। কুবেরের পুষ্পকরথ অপেক্ষমান। আপনি সেই পুষ্পকরথ নিয়ে নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় পেঁছে যাবেন। আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা, আমরা আপনার সঙ্গে অযোধ্যায় গিয়ে মাতা কৌশল্যাকে প্রণাম করে আসি।

শ্রীরাম সহাস্যে অনুমতি দান করলেন। বিভীষণের আদেশে পুষ্পকরথের সারথি সূর্যকিরণের দাহিকা শক্তি আহরণ করে রথের গতিশক্তি সৃষ্টি করলেন।

পুষ্পকরথে গতিবেগ সৃষ্টি হতে সকলে রথে আরোহণ করলেন। সারথি শ্রীরামের নির্দেশানুসারে পুষ্পকরথ চালিত করে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন।

সাগর অতিক্রম করে পুষ্পকরথ যখন কিষ্কিন্ধ্যার আকাশে উড্ডীন তখন শ্রীরাম বললেন—সীতা, ওই কিষ্কিন্ধ্যা। সুগ্রীবের সহায়তা লাভ না করলে তোমাকে উদ্ধার করা সম্ভব হত না।

সীতার একান্ত ইচ্ছায় পুষ্পকরথ কিষ্কিন্ধ্যায় নামান হল। সীতা তারার সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন করলেন, তারপর বললেন—সুগ্রীব জায়াগণ আমার সঙ্গে অযোধ্যায় যাবেন। তার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীরামের নির্দেশে সুগ্রীব, তারা রুমা এবং অন্যান্য পত্নীগণকে প্রস্তুত হতে বললেন। সকলে সানন্দে সজ্জিত হলেন, তারপর তাঁরা পুনরায় অযোধ্যার আকাশে উড্ডীন হলেন।

শ্রীরাম-নির্দেশে পুষ্পকরথ ভরদ্বাজ আশ্রমের সম্মুখে অবতরণ করল। শ্রীরাম রথ হতে অবতরণ করে ঋষি ভরদ্বাজের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলেন।

ভরদ্বাজ আশীর্বাদ করে শ্রীরামকে বললেন—তুমি যখন বনে গমন করেছিলে, আমার তখন মনে ভীষণ দুঃখ হয়েছিল, আজ তুমি ভারতে অখণ্ড রামরাজ্য স্থাপনা করেছ, এবার তুমি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করে সুখে রাজত্ব কর।

শ্রীরাম প্রশ্ন করলেন—চতুদশবর্ষ কাল সমাপ্ত হয়েছে?

ভরদ্বাজ ঋষি গণনা করে বললেন—চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়ে আজ পঞ্চমী তিথি। এখন তুমি অনায়াসে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে পার। তোমরা অযোধ্যার পথে যাত্রা কর।

রাম সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করলেন। সকলে আশ্রমকাননে বিশ্রাম করতে লাগল। রাম হনুমানকে নির্দেশ দিলেন—তুমি অযোধ্যায় গমন করে ভরতকে

আমাদের আগমন বার্তা জানাও। তার মনের অভিপ্রায় কী তাও জেনে এস। সে যদি আমাদের আগমনে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করব না। যদি সে আমাদের আগমনে প্রীত হয়, তাহলে আমরা অযোধ্যা যাত্রা করব। অযোধ্যা যাবার পথে নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার আগমন বার্তা জানাবে।

হনুমান সেই মুহূর্তে বানরাকৃতি পরিত্যাগ করে মনুষ্যরূপে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের সন্নিকটে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হয়ে হনুমান গুহককে রামের শুভাগমন বার্তা জ্ঞাত করলেন, তারপর অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হয়ে ভরতের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারলেন, ভরত নন্দিগ্রামে বাস করেন। হনুমান নন্দীগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। অযোধ্যা হতে নন্দিগ্রামের দূরত্ব মাত্র এক ক্রোশ।

নন্দিগ্রামে উপস্থিত হয়ে হনুমান বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন। রাজসিংহাসনে পাদুকা সজ্জিত। পদতলে সন্ন্যাস-বেশধারী ভরত, সভাসদগণ কাষায় বস্ত্র পরিহিত।

হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনি পরিচয় দান করলেন। সংক্ষেপে রামের বনবাস যাত্রা হতে শুরু করে রাবণ বধ পর্যন্ত বর্ণনা করে বললেন—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতাদেবী এবং অন্যান্য সহচরসহ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করছেন।

ভরত আনন্দে বিহ্বল হয়ে হনুমানকে আলিঙ্গন করে বললেন—আগন্তুক, তুমি দেবতা না মানব জানি না। তুমি যে সংবাদ পরিবেশন করেছ, তাতে আমি আনন্দিত, এতই আনন্দিত যে সসাগরা পৃথিবী দান করেও আমার মনে শান্তি হবে না। তুমি যে প্রিয় সংবাদ বহন করে এনেছ, তার জন্য আমি তোমাকে এক লক্ষ গোদান, এক শত গ্রামদান এবং ষোলটি সৎকুলজাতা চন্দ্রাননা সালংকারা কন্যা দান করছি।

হনুমান বললেন—ঋষি ভরদ্বাজের নির্দেশে শ্রীরাম সদলে আজ তাঁর আশ্রমে বাস করবেন। আগামীকাল শুভ পুষ্যা নক্ষত্রযোগে তিনি অযোধ্যায় পদার্পণ করবেন। আজ আমি বিদায় গ্রহণ করছি।

ভরত, কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—এতদিন পরে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

হনুমান বিদায় নেবার পর ভরত আদেশ দিলেন—অযোধ্যা নগরীকে সুসজ্জিত করতে এবং সকলকে সংবাদ পরিবেশন করতে শ্রীরামের শুভাগমন সম্পর্কে।

পরদিন প্রভাতে ভরত অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য সজ্জিত করে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে সম্মুখ রথে নিয়ে, অমাত্যবর্গসহ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমাভিমুখে

যাত্রা করলেন। সমস্ত অযোধ্যা নগর নানা বর্ণে সুসজ্জিত। পথের দুপাশে শংখ ও ভেরী নিনাদিত হল, সমগ্র নন্দিগ্রাম রামের সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হল।

শ্রীরামের সঙ্গে ভরতের পুনর্মিলন ঘটল চতুর্দশ বর্ষ পরে। ভরত শ্রীরামের পদধূলি গ্রহণ করে প্রণাম করলেন। শ্রীরাম ভরতকে আলিঙ্গন করে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। ভরত বিনীত কণ্ঠে বললেন—আপনার প্রতিনিধি-স্বরূপ আমি রাজ্য পালন করেছি। আপনার পাদুকা আপনি গ্রহণ করুন। আপনার অবর্তমানে আমি রাজ্যের সম্পদ দশগুণ বৃদ্ধি করেছি। সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে আছে। চতুর্দশ বর্ষের মধ্যে আপনার রাজ্যে কোনদিন দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী হয় নি। এখন আপনি আপনার রাজত্ব গ্রহণ করে আমাকে মুক্তিদান করুন।

সকলে অযোধ্যায় শুভাগমন করলেন। রাজ্যের জনগণ সহর্ষে জয়ধ্বনি দিলেন—জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়। জয় অযোধ্যাপতির জয়।

সুসমাচারে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। শ্রীরাম ভরতকে যৌবরাজে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু ভরত সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করলেন না। শ্রীরাম অনন্তর লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করলেন।

আটাশ

শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অখন্ড ভারতে শান্তি, শৃংখল ও সমৃদ্ধি অপরিমিত। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

পরিণত রাজনীতিজ্ঞ, প্রজাপালক শ্রীরামচন্দ্র স্বামীরূপে সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রমোদকাননে বিশ্রামের জন্য, কিছুদিন অবসর বিনোদনের জন্য এলেন।

পক্ষখানেক আনন্দের স্রোতে অবগাহন করে, একদিন রাত্রে শয়নকালে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে সোহাগপূর্ণ স্বরে বললেন—প্রিয়া, তোমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তুমি জননীরূপে রূপান্তরিত হবে। তোমার গর্ভে আমার বংশধর জন্মগ্রহণ করবে।

আনন্দাপ্লুতা সীতাদেবী কোন উত্তর দিতে পারলেন না। শ্রীরাম সীতাদেবীকে বক্ষে ধারণ করে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন, পরদিন প্রভাতে সীতাকে প্রশ্ন করলেন

—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নারীর মনে যে সাধ জাগে, তা পূর্ণ করা একান্ত কর্তব্য। তোমার মনে কী সাধ আছে, আমাকে অকপটে বল।

লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে সীতাদেবী বললেন—আমি এক পবিত্র ঋষির আশ্রম পরিদর্শন করে সেস্থানে কিছুদিন বাস করতে ইচ্ছুক।

শ্রীরামচন্দ্র সাদরে সীতাকে আলিঙ্গন করে উত্তর দিলেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

সীতাদেবী সলাজ আনন্দে অধোবদনে দণ্ডায়মানা রইলেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতার কপোলচন্দ্রে কলঙ্কের চিহ্ন অঙ্কিত করে বহির্প্রাসাদে গমন করলেন রাজকার্য সাধনের জন্য।

প্রমোদকাননের বহির্প্রাসাদে রাজসভার আয়োজন। রাজসভার মধ্য কক্ষে রাম উপবিষ্ট হলে বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সভাকক্ষ আলোকিত করে উপবেশন করলেন।

নানারকম বাক্যালাপের মধ্যে অকস্মাৎ এক সময়ে শ্রীরাম প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, সাধারণ মানুষ আমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে?

—অনেক কিছুই মন্তব্য করে—ভদ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে নিবেদন করলেন।

—অনেক কিছু! যথা—শ্রীরামের ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত।

—যা দেব-দানবের অসাধ্য, তাই আপনি পূরণ করেছেন। সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। বালী ও রাবণের ন্যায় দুর্ধর্ষ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। সেতুবন্ধন করেছেন। সীতা উদ্ধার করে সর্ববিষয়ে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পুনরায় সুখে সংসার করছেন।

—তার অর্থ? শ্রীরাম রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

ভদ্র ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—সীতার সম্ভোগ জনিত সুখ রামের হৃদয়ে প্রবলতম। একদিন রাবণ যাঁকে সবলে ক্রোড়ে করে অশোকবনে রেখেছিল, যে সীতা রাবণের বশে ছিলেন, সেই সীতাকে শ্রীরাম ঘৃণা না করে পরম সোহাগে আদর করেন। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আমাদের পত্নীকেও যদি কোন দুরাত্মা হরণ করে নিয়ে যায়, তাহলে তাকে ঘৃণা না করে, পুনরায় সম্ভোগক্রিয়ায় সংসারধর্ম প্রতিপালন করতে হবে। রাজা যে কাজ করেন, প্রজারা তারই অনুকরণ করে থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্রের মুখমণ্ডল মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায়। তাঁর মধ্যে স্বামীত্বের সত্তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, নৃপতির সত্তা জাগ্রত হয়ে উঠল। প্রজারঞ্জনই নৃপতির সর্বাপেক্ষা আবশ্যক, প্রাধনতম কর্তব্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে আপন পত্নীর স্থান অন্য এক সাধারণ নাগরিকের পত্নীর সমান।

শ্রীরাম অন্যান্য পারিষদদের প্রশ্ন করলেন—ভদ্র যেসব কথা বললেন, তা সত্য?

—সত্য, মহারাজ। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন।

শ্রীরাম অল্পক্ষণ নীরব থেকে আদেশ দিলেন—আপনারা আমাকে কিছুক্ষণ একাকী থাকার সুযোগ দিন।

সকলে বিনাবাক্যে কক্ষ পরিত্যাগ করে বিদায় নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র একাকী পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কক্ষমধ্যে পদচারণ করতে লাগলেন। একবার চিন্তা করলেন সমস্ত সংসার ধ্বংস করবেন, পুনরায় চিন্তা করলেন, নৃপতির লোকবলই শ্রেষ্ঠ বল। লোকরঞ্জনই নৃপতির সর্বাগ্রে সাধন করা উচিত। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান করতে আদেশ দিলেন। দ্বারী সেই মুহূর্তে যাত্রা করে অত্যল্প কালের মধ্যে তিন ভ্রাতাকে সেই কক্ষে উপস্থিত করল।

তিন ভ্রাতা উপস্থিত হয়ে চিন্তা করলেন—মহারাজ কি এমন সাংঘাতিক কথা বলবেন! তিনজনেই বিনাবাক্যে জ্যেষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের দুই চক্ষে অশ্রুর ধারা। তিনি সরোদনে বললেন—আমি সর্বতোভাবে জ্ঞাত আছি, সীতা সতীসাধ্বী। কিন্তু রাজ্যমধ্যে গুঞ্জন উঠেছে, অসতী সীতাকে আমি গ্রহণ করেছি তার রূপলাবণ্যের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে। এ অবস্থায় লোকমনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করা আমার রাজকর্তব্য। আমার অন্তরাত্মাও জানে সীতা চরিত্র অতি বিশুদ্ধ চরিত্র, তবু এই ঘোর অপবাদ শুনে শোকাভিভূত হয়েছি। এই অপবাদ শ্রবণ করার পর কোন বিহিত না করে রাজকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তোমরা আমার কথার প্রতিবাদ কর না। আমি যা নির্দেশ দিই, তাই প্রতিপালন কর।

শ্রীরাম অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—লক্ষ্মণ! সীতা নিজেই বলেছে, সে কোন পুণ্যবান ঋষির আশ্রম দর্শন করতে চায়। তুমি আগামীকাল প্রভাতে গঙ্গাতীরে কোন এক পবিত্র ঋষির আশ্রমে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে এস।

রজনী প্রভাত হলে শুষ্ক মুখে বিষণ্ণ মনে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন রথ প্রস্তুতের জন্য। রথ প্রস্তুত হতে লক্ষ্মণ সীতাকে সেই রথে আরোহণ করার প্রার্থনা জানালেন। সীতা বিনাবাক্যে সেই রথে আরোহণ করলেন।

লক্ষ্মণের আদেশে সুমন্ত্র রথ পরিচালনা করে গঙ্গার পরপারে ঋষি বাল্মীকির তপোবনের সন্নিকটে এলেন। লক্ষ্মণ রথের গতি স্তব্ধ করতে আদেশ দিলেন। রথ স্তব্ধ হতে লক্ষ্মণ রথ হতে অবতরণ করে সীতাদেবীকে অবতরণ করতে বললেন। বিমূঢ় সীতা বিনাবাক্যে লক্ষ্মণের আদেশ পালন করলেন।

লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল কণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে সীতাকে বললেন—আর্য রাম আমাকে যে গর্হিত কর্মে নিযুক্ত করেছেন, তার জন্য আমি চিরকাল লোকনিন্দার কারণ হব। এই কর্তব্য সমাপন করার চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়া অনেক শ্রেয়ঃ। দেবি! আপনি প্রসন্ন হোন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

লক্ষ্মণ সীতার পাদস্পর্শ করে আকুল ক্রন্দনে উদ্বেলিত হলেন। সীতাদেবী কোন কিছুই উপলব্ধি করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—কি হয়েছে লক্ষ্মণ? তুমি এত বিহ্বল কেন?

লক্ষ্মণ সংক্ষেপে সমস্ত অপবাদের কথা বর্ণনা করে বললেন—লোক অপবাদের ভয়ে শ্রীরাম আপনাকে নিরাপরাধিনী জেনেও পরিত্যাগ করেছেন। আপনি আমাদের সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন লঙ্কায়, তথাপি পৌরজনের অপবাদ ভয়ে রাজা আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, অন্য কারণে নয়।

লক্ষ্মণ অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—আমি আশ্রমের প্রান্তদেশে আপনাকে রেখে যাব। মহাযশা বাল্মীকি ঋষি পিতা দশরথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আপনি বাল্মীকির স্নেহচ্ছায়ায় দিনাতিপাত করবেন।

সীতা প্রস্তরবৎ নিথর। অনেকক্ষণ পরে বললেন—আমার গর্ভে যদি রাজসন্তান না থাকত, তাহলে আজ আমি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতাম। তুমি অনায়াসে বিদায় নাও। আমার ন্যায় এক সাধারণ নারীর জন্য তোমার অমূল্য সময় অপচয় করা বিধেয় হবে না। যাত্রার পূর্বে তুমি কেবল দেখে যাও আমি গর্ভবতী।

করজোড়ে লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন—দেবি! আপনি আমার জননীর ন্যায়। একমাত্র আপনার পদযুগল ব্যতিরেকে শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলোকন করি নাই। আপনি ওই প্রকার আদেশ দিয়ে আমার পাপ বৃদ্ধি করবেন না। আমি বিদায় নিলাম। প্রণাম।

লক্ষ্মণ বিদায় নেবার পরও সীতাদেবী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুনিকুমারগণ সীতাকে লক্ষ্য করে বাল্মীকির নিকট গিয়ে বললেন—ভগবান। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এক অপরূপা রমণী কাতর হয়ে রোদন করছেন। আমাদের মনে হয় তিনি কোন মহাত্মার ভার্যা। আপনি একবার তাঁর নিকট চলুন।

বাল্মীকি সীতার নিকটে উপস্থিত হয়ে মধুর বাক্যে বললেন—আমি তোমাকে জানি। তোমার সমস্ত আখ্যানভাগও আমার শ্রুতিতে ধৃত আছে। আমার আশ্রমের অদূরে তাপসীরা বাস করেন। তুমি তাদের সঙ্গে বাস করবে। এস।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

দেশ-বিদেশের নৃপতিগণ নিমন্ত্রিত। সুগ্রীব ও বিভীষণের নিকট আমন্ত্রণ

দূত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। নৈমিষক্ষেত্র আপণিক, নট, নর্তক, পাচক ও যৌবনবতী নারীর সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৈন্যদলও সেস্থানে উপস্থিত। বিভিন্ন আশ্রম হতে মুনি-ঋষিগণও উপস্থিত। তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ঋষি বাল্মীকি এবং তাঁর শিষ্যদ্বয় লবকুশ।

বাল্মীকির নির্দেশে এবং পরিচালনায় লবকুশ সুমধুর কণ্ঠে রামের ইতিবৃত্ত অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠে সংগীতরূপে পরিবেশন করছে। ভ্রাতৃদ্বয়ের সুললিত কণ্ঠে শ্রীরামের হৃদয় উদ্বেলিত। বারংবার তিনি লবকুশকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বারংবার লবকুশ উত্তর দিল, তারা বাল্মীকির শিষ্য। অধীর হৃদয়ে শ্রীরাম বাল্মীকিকে প্রশ্ন করলেন —ওদের পরিচয় কি ?

—বিশ্বাস হবে ? বাল্মীকি ধীর কণ্ঠে বিপরীত প্রশ্ন রামকে করলেন।

—আমার আত্মা বলছে, ওরা আমার আত্মজ। আপনি আমার সেই ধারণাকে বিশ্বাসে পরিণত করুন।

তুমি যা ভেবেছ, তাই সত্য। এদের নাম লবকুশ। এরা তোমার পত্নী সতীসাধ্বী সীতার যমজ সন্তান। আমার আশ্রমে এবং আশ্রয়ে লালিতপালিত।

সেই মুহূর্তে শ্রীরাম বিস্মৃত হলেন তিনি পরম পরাক্রমশালী, বীর নৃপতি, অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বারবার চিন্তা করলেন, তিনি স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী।

—এই মুহূর্তে সীতাকে এস্থানে আনা হোক। সর্বসমক্ষে আমি তাঁকে প্রিয়তমা পত্নীরূপে গ্রহণ করব।

রামের আদেশে দ্রুত রথ প্রেরণ করে সেই সভাস্থলে সীতাকে আনয়ন করা হল। সীতাদেবী নির্বিকার। পার্থিব শোক-দুঃখ আনন্দ-সুখের ঊর্ধ্বে তিনি বিচরণ করছেন।

সীতা সভার মধ্যস্থলে প্রস্তরবৎ নিথর।

শ্রীরাম করুণ কণ্ঠে বললেন—সীতা, তুমি আমায় সর্বসমক্ষে ক্ষমা কর। আমি হয়ত সার্থক রাজনীতিজ্ঞ, সার্থক নৃপতি, কিন্তু অপদার্থ স্বামী এবং পিতা। আমি সর্বলোকভয় বিসর্জন করে তোমাকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছি, তুমি আমাকে ধন্য কর, সার্থক কর।

সীতাদেবী ধীরস্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি সতীসাধ্বী কি না, সে পরীক্ষা দেবার জন্যে আজ আর আমি উদগ্রীব নই। আমি শুধু প্রার্থনা করব, আমি যদি সার্থক সতী হই, পতিব্রতা রমণী হই, তাহলে মা বসুন্ধরা যেন আমাকে অঙ্কে স্থান দেন।

অকস্মাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূমিকম্পের কম্পনে যজ্ঞশালা কম্পমান। কড়কড় শব্দে কক্ষের ভূমিতল বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং কেউ কোনরূপ সাহায্যার্থে

এগিয়ে আসার পূর্বেই সীতাদেবী সেই গহ্বরের মধ্যে পতিত হলেন। সকলে সেস্থানে ছুটে গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই পৃথিবীর অতল গহ্বরে সীতাদেবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

শ্রীরাম অচেতন হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন।

শ্রীরাম সংবাদ পেলেন লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছেন।

শ্রীরাম নিঃসঙ্গভাবে চিন্তা করলেন—স্বামীত্ব বড়, পিতৃত্ব বড়, না রাজত্ব বড়? তিনি সারা জীবনব্যাপী লোকরঞ্জনের জন্য ব্যক্তিগত সবকিছু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে? তিনি কি পত্নীর প্রতি, পুত্রদের প্রতি প্রকৃত কর্তব্য সাধন করেছেন?

সরযূ তীরে রথ হতে অবতরণ করে শ্রীরাম সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন রথ নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে। সুমন্ত্র বিদায়ের পর শ্রীরাম ধীর পায়ে সরযূ নদীর দিকে যাত্রা করলেন। অঞ্জলি ভরে সরযূর জল মাথায় গ্রহণ করলেন শ্রীরাম, তারপর ধীরে ধীরে সরযূর গভীর জলের মধ্যে তলিয়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন, সরযূর অতল জলে বিলীন হয়ে গেলেন প্রথম অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের স্রষ্টা প্রথম সূর্য শ্রীরামচন্দ্র।

শেষ

প্রথম সূর্য

সমালোচনা

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

বয়স ঃ

জাতি ঃ

এক হাজার শব্দের মধ্যে সমালোচনা শেষ করবেন। ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে পরিস্কার করে লিখবেন। নাম, বয়স এবং পুরো ঠিকানা এমনভাবে লিখবেন যাতে পড়তে একটুও অসুবিধা না হয়। আপনার সমালোচনার সঙ্গে এই কুপনটি অতি অবশ্য থাকা চাই।

আপনার স্বাক্ষর—